শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীবিধুভূষণ সরকার বি, এ, কর্ত্তৃক
গ্রথিত।

৪৪০ গৌরাব্দ
১৩৩৩ সন।

দেড় টাকা।

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত,
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

ঢাকা,
আশুতোষ প্রেসে
শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর দ্বারা মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
শ্রীগৌরাঙ্গ সভা, বাসণ্ডা, বরিশাল।
মহিম[illegible] লাইব্রেরী,
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

ভূমিকা

শারদ-শশীর শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরেখা যখন ফুলে ফুলে প্রতিফলিত হইয়া প্রকৃতকে এক গভীর-স্নিগ্ধ রসাবেশে দীপ্ত করিয়া তুলে, তখন চিনাইয়া দিতে হয় না ইহার উৎস কোথায়? ততোধিক বিমল চিত্র—অনাবিল অপ্রাকৃত তত্ত্ব যখন মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হয়, তখন মুগ্ধ মন সে অপার্থিব রূপমাধুর্য্যের মোহে জ্ঞানহারা হইয়া অবিরত ঐ চিত্রই নেহারিতে রহে এই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থের ভূমিকা লেখকের অবস্থা কতকটা তদ্বৎই বটে।

"জয় জয় গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"

ঠাকুর বৃন্দাবন দুর্গত কলিহত জীবের প্রতি করুণার্দ্র হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথের জয় দিতেছেন। সত্রাজিত-সুতার স্বরূপভূতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ ভূরূপিণী, কি না পৃথিবীস্থ জীব-জগতের প্রতিনিধিরূপা; তাই পৃথিবীর জীবের কল্যাণ কামনায় বিষ্ণুপ্রিয়ানাথেরই শরণ লইতে হয়। সেই মহিমান্বিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরিত্র গ্রন্থের মহিমা এ অকৃতী-কৃত ভূমিকায় প্রস্ফুট হইতে পারে না।

শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের উপাসনা ক্ষেত্র। এইস্থানে শ্রীমহাপ্রভু আগমন করিয়া নিজ পিতামহীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ও তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে ও গৌরনাগর বেশে দর্শন দিয়াছিলেন। এই দুই রূপের শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি ঢাকা দক্ষিণে অর্চ্চিত হইতেছেন। হিন্দুর বিগ্রহার্চ্চন অর্থশূন্য ছেলেখেলা নহে; কোন বৈষ্ণবই

খেয়ালবশে উপাস্যতত্ত্ব নিয়া রহস্য করিতে পারেন না। শ্রীমহাপ্রভু পার্শ্বে অন্য অন্য মূর্ত্তি অন্যত্র থাকিলেও কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নাই ঢাকা দক্ষিণের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দুই শ্রীবিগ্রহ নীরবে নিজেদের প্রাকট্যে কথা কহিতেছেন। এই দুই বিগ্রহ কিন্তু উপেন্দ্র মিশ্রের আলয়ে নহেন— পূর্ব্বাবধি সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন। কয়েক বৎসর হইল, ঢাকা দক্ষিণে উপেন্দ্র মিশ্রের আলয় আবিষ্কৃত হইলে, তথায় কি করা হইবে, আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কেননা শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে সন্ন্যাসীরূপেই ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় তথায় অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহই প্রতিষ্ঠিত হন।

হঠাৎ নূতন কিছু দেখিলেই লোকে চমকিত হয়। দক্ষিণ দেশের অনেকত্র প্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তির অর্চ্চনা থাকিলেও, বঙ্গদেশে তাঁহার সন্ন্যাস বিগ্রহ নাই। ঢাকা দক্ষিণে সন্ন্যাস-বিগ্রহ স্থাপিত হইলে, কাজেই ভজনতত্ত্বের নানাকথা উঠিবে বিচিত্র নহে। যাঁহারা ভাবের ভাবুক, নিজ ভাববিরুদ্ধ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; এবং তদুপলক্ষে এই নববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কিরূপে অনুমোদিত হইতে পারে, জিজ্ঞাসিত হইবে, বিচিত্র নহে।

শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা কাল্পনিক-কথা নহে, তাহা মিথ্যা বলা যায় না। দুর্গত জীবের তরে তিনি সন্ন্যাস করিয়াছিলেন। এখনও যদি দুর্গত জীব কেহ কেহ থাকে, তবে সন্ন্যাসলীলা ও সেই শ্রীবিগ্রহ তাহাদের উপযোগী না হইবে কেন? যদি তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য হয় কঠিন জীবের হৃদয় দ্রব করা, তবে তাঁহার সন্ন্যাসমূর্ত্তির তৎপক্ষে এখনও আবশ্যকতা আছে বলিতে হয়।

যদি শ্রীমহাপ্রভু সত্যস্বরূপ হন, তাঁহার প্রতি লীলাই সত্য, প্রতি লীলাই নিত্য। তাঁহার সন্ন্যাস লীলাটিই অনিত্য, ইহা বলা যাইবে না।

স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের এক একটি পদক্ষেপ শত বিশ্বের উদয় বিলয় হইতেও বড়। তাঁহার স্বতন্ত্রতা সর্ব্বশাস্ত্রের উপরে, সর্ব্ব বিধি নিষেধের শীর্ষে। শাস্ত্র চিরদিন অনুসন্ধান করিয়া করিয়া ইহার তত্ত্বনির্দ্ধারণে ব্যস্ত রহিবেন। এ অযোগ্যের ছিল তখন এই সামান্য উত্তর।

কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-লীলা-কথা স্মরণ হইলেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দীনা মলিনা মূর্ত্তি মন দর্পণে ভাসিয়া উঠেন; মনের সমস্ত মলা ধৌত করিয়া লইয়া যায় তখন নয়ন জল। মনে হয় তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেই ধূলি-ধূসরিতা মূর্ত্তি; ম্লানিমা-মণ্ডিত বিষাদিতার এই মূর্ত্তি দেখাইয়া কত দিন বলিয়াছি—ভাই! দেখ দেখ, ঐ না সে সোণার প্রতিমা! আমাদেরই তরে তাঁর আজ এই বেশ!! এস্থলে এই আলেখ্যের আবরণ উন্মোচন করাই ভাল। ঐ দেখ সেই—

বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—গৌর-গৌরবিনী সখীপরিবৃতা বিষ্ণুপ্রিয়া আজ আর আগেকার বিষ্ণুপ্রিয়া নহেন; সে রাজরাজেশ্বরী নহেন; সে কুসুমাবৃতা মোহিনী বেশ আর নাই। আজ দেবী ধূলি-ধূসরিতা কাঙ্গালিনী। আহার নাই, নিদ্রা নাই; বেশভূষা নাই; দীর্ঘ সুচিক্কণ কেশদাম আলুলায়িত—রুক্ষ। নয়ন-জলে আর্দ্র পঙ্কমণ্ডিত কেশে বদন, বাহু, ও পৃষ্ঠ আচ্ছাদিত, পরিধেয় বসনও ধূলিলিপ্ত। বস্তুতঃ—

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবানিশি পিয়ে গোরা-নাম-সুধা খানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি॥

বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী ॥

পদকল্পতরু—৬১১।৪ শাখা।

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ পতিচিন্তাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সারা হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে। আগ্নেয়গিরির গৈরিক-নিস্রাববৎ কচিৎ কখন তাহার স্ফূরণ হয়, কচিৎ কখন পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীকে কিছু বলিয়া থাকেন। একদিন সখীকে বলিতেছেন,—

সখি! প্রভু ত চিরদিন আমার এমনটি ছিলেন না! কতদিন তিনি এ অধীনা দীনাকে মান দিয়াছেন কখনও তো তাঁহাকে এমনতর হেরি নাই, এখন এমন হইল কেন, সই? যথা—

গৌর গৌরবে হাম জনম গোঁয়ায়নু
অব কাহে নিরদয় ভেল?
পরিজন বচনহিঁ গরলে গরাসল
দেহ দহন সম ভেল।
সোঙরিতে সো মুখ হৃদয় বিদারত,
পাঁজরে বজরক শেল ॥
উঠি বসি করি কত, ক্ষিতি মাহা লুঠত,
পবন আনল সম অঙ্গ !!

তার পরে সখীর কাছে পরামর্শ চাহিতেছেন, (ঐ পদেই)

সখি! কি করব? কা দেই সম্বাদ পাঠাওব
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ?

পদকল্পতরু—৬১৩।৪ শাখা।

কি বলিব তাঁর কথা, মনে হইলেই প্রাণ আনচান করে ; প্রাণেশ্বর যাঁকে বক্ষের উপর সদা রাখিত, শয্যা যে সোণার অঙ্গের পরশ পাইত না, নবনীত-কোমল সে অঙ্গ আজ ভূশয্যায় !! আহা, বিরহ-তাপিতা বালার নয়নে শ্রাবণের অবিরল ধারার মত অশ্রু বহিতে লাগিল—তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এস্থানে গৌরাঙ্গ-পার্ষদ মাধব ঘোষের সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

জনমহি গৌর গরবে গোয়ায়লুঁ,
সো কিয়ে এত দুঃখ সহই ?
উর বিনু শেজ পরশ নাহি জানত,
সো তনু অব মহী লুঠই !!
বদন মণ্ডল চাঁদ ঝলমল
সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ল খসি,
ঐছন উপজল মোহে।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লেখই,
যৈছন বাউরি পারা॥
ঘন ঘন নয়নে নিঝরে বারি চারু
যৈছন শাওন ধারা॥
থেনে মুখ গোই পাণি অবলম্বই,
ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সেই গৌরহরি পুনহি মিলায়ব
নিয়ড়হি মাধব দাস॥

পঃ কঃ তঃ—৬১৪।৪ শাখা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই দশা দেখিয়া একজন সখীর সহ্য হইল না, তিনি তখন উঠিলেন; উঠিয়া উন্মাদিনীর মত গৃহের বাহিরে গেলেন, গিয়া সুরধুনী অভিমুখে ছুটিলেন।

ঐখানে,—যেখানে প্রতিদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভক্তগণ সনে নিমাইচাঁদ উপবেশন করিতেন, তথায় গেলেন। আঁখি তাঁহার ঝরিতে লাগিল, কথা তাঁহার জড়িত হইয়া গেল। বাক্ তাঁহার রহিত হইল না—শুধু অস্পষ্ট গরগর ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল! তখন সে ভাবাবিষ্টা সখী দেখেন কি, দেখেন যেন গৌর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া; যেন গৌর অপরাধীর মত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!! তিনি তখন তাঁহাকে বলিতেছেন, যথা মাধব ঘোষের বর্ণনা -

"তছু দুখে দুখী এক প্রিয় সখী
গোর বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলল ধাইয়া
যেমত বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী তীরে
যেথানে বসিতা পহুঁ।
তাহাই যাইয়া গদ গদ হৈয়া,
কি কহয়ে লহু লহু॥
সে সব প্রলাপ- বচন শুনিতে,
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে যৈছন গোঁড়ে
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কান্দিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বেয়াকুল
শুনিতে মরম ব্যাথা॥

পদকল্পতরু—৬১৫।৪ শাখা।

তখন গৌর-সম্বোধনে সখী বলিতেছেন—

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ হেরি করে রোদন
তুলা ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়া-নিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত,
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী, বৃদ্ধা আধমরা দেহে প্রাণ নাহি সাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গীগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া?
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস রহে দরশন আশে।
হেদে রে রসিক বর চলহ নদীয়াপুর
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥

পঃ কঃ তঃ—৮১৬।৪ শাখা।

কথা মিথ্যা নহে; বাস্তবিকই বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার অবস্থা এমনি ছিল। দেহে প্রাণ আছে কি না, সখী নাসাগ্রে তুলা ধরিয়া দেখিতেছেন। তুলা যদি না নড়িল, রোদন করিয়া অমনি উঠিলেন তাঁহারা। বৃদ্ধা শোকাতুরা শচীম দৌড়িয়া আসিলেন, কোলে তুলিয়া লইলেন বধূকে। আর সকলে মিলিয়া কাণে গৌর নাম শুনাইতে লাগিলেন, এমন প্রায়ই হয়, গৌর নাম শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসে।

সখীর বচনে গৌর তখন বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া; মুখে বাক্যটি নাই। সখীর আর দেরী সহিতেছে না, বলিতেছেন—

গৌরাঙ্গ ঝাট্ করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার চরিত যত পূরব পিরীত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত॥
সে হেন নদীয়া পুরে সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া॥

সখীর ভাবে কবি বলিতেছেন—

কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥

* * * *

অসাধ্য সাধিত হইল। গৌর স্বয়ং যাঁদের কঠিন প্রাণ দ্রব করিতে পারেন নাই, যাঁহাদের তরে তাঁহার গৃহত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তপ্তশ্বাসে তাহা করিল; বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুজলে সে পাষাণ দ্রব হইল! এজন্যই বুঝি এই লীলা!

গৌরহরি! তোমার এ কেমনতর লীলা? এ তোমার কাদৃশ রীতি? তুমি চিরদিন এমনি করে নিজ জনেরে কাঁদাও! ত্রেতায় সীতা, দ্বাপরে রাধা; কাঁদাইতে কম কর নাই কাঁহাকেও। কিন্তু এবারে বুঝি এই ক্ষুদ্র বালিকার ভার বেশী হইয়া পড়িয়াছে! জনম দুঃখিনী জানকীরও সান্ত্বনার একটা স্থান ছিল,—তাঁহার পুত্র ছিল। সন্তান-পালন ও বাৎসল্য-প্রাবল্যে, তাঁহাদের মুখ চাহিয়া একটু হয়ত ভরসা পাইতেন। শ্রীমতা রাধিকারও একটু সান্ত্বনার স্থান ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় বৈ কি? সখীদের মুখে তিনি সততই মথুরার সংবাদ

পাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজা—ভিখারী নহেন। আর শ্রীকৃষ্ণবাক্যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে আসিবেন, এ আশা তাঁহার ছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালিকাটির কি ছিল সান্ত্বনা পাইবার? কিছু না, কিছু না। তাঁহার কাঁদিবারও অবসর ছিল না। কাঁদিয়া যে হৃদয়-বেদনা একটু পাতলা করিবেন, তা-ও পারিতেন না। তাঁহার চক্ষে জল দেখিলে বৃদ্ধা শচী আরো আকুলিতা হইতেন, এজন্য কত ব্যথা—জ্বলন্ত আগুণ—হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতেন। হৃদয় ফাটিয়া যাইত, কিন্তু মুখটি ফুটিত না!! এত কষ্ট! হায়! বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার কি যাতনা!!

এই বিষাদ-মূর্ত্তির কথা ভাবিয়া নদীয়া হায় হায় করিতে লাগিল। এই ভাবটি তরঙ্গের মত ছুটিয়া ছুটিয়া চৌদিকে চলিল, সমবেদনায় সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল; সকলে দারুণ ব্যথায় ব্যথিত হইল; আর তাহাতেই—কেবল তাহাতেই মাত্র, নিন্দুক পাষণ্ডী, পণ্ডিত গর্ব্বিত, সকলের মস্তক নত হইয়া পড়িল। যথা - বৃন্দাবন দাসের পদে —

"কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
একবার নদীয়া আইলে ধরিব তাঁর পায়॥ ইত্যাদি
পঃ কঃ তঃ ৬২০।৪ শাখা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই যে প্রবল গৌরবিরহানল স্রোত, তার গভীরতর তলদেশে তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল; তাহাতে তিনি সতত বাহ্য বিরহিত রহিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণরক্ষার উপায়; অন্যথায় শতভুজঙ্গ-বিষ-সিক্ত সে দারুণ বিরহে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারে? ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ইহাতেই বলিয়াছেন—

"অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিরহে প্রাণ রহে?"
(চৈতন্য ভাগবত)

গৌর-বিরহ-জনিত এই যে সন্তাপ, এই যে আশ্রয়হীন অবস্থা এই যে দৈন্য দশা, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই যে বিহ্বলতা, এই যে বিমূঢ় ভাব, এই যে ক্ষণে ক্ষণে ভূপতন, এই যে গভীর মূর্চ্ছা, ইহাতে যে ভাবের স্রোত বহিয়াছিল, নদীয়ার নরনারীর নয়ন সমক্ষে ভাবের যে জীবন্ত আলেখ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহাতে অলক্ষ্যে কি এক মহা শক্তি কি প্রখররূপে কাজ করিতেছিল, যাহাতে নাগরিকের কঠোর হৃদয় নিমেষে দ্রব করিয়া দিয়াছিল; তাঁহারা তখন সম্মোহিতের মত ইহাঁদের ভাবে অভিভূত হইয়া, ইহাঁদেরই অবস্থা লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা অত্যধিক অনুশোচনায় আরো ব্যথিত হইয়াছিল। ইহাঁদের ভাব লইয়া এই পদটি লিখিত—

*　　*　　*　　*　　*

গৌরাঙ্গ সুন্দর　　না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ?
কেবা হেন জন　　আনিবে এখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর　　রোদন শুনিতে
কেশী গড়াগড়ি যায়॥

(পঃ কঃ তঃ)

জগদানন্দের নদীয়ায় অবস্থিতি ঘটিল না; সতত গৌর-প্রেম-পয়োধি-সলিলে সন্তরণকারী কেমন করিয়া দুঃখার্ণবে নিমজ্জিত থাকিতে পারিবেন? জগদানন্দ নদীয়া হইতে ঝটিতি নীলাচলে আসিলেন। গৌরদর্শনে তাঁহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। 'কি সুখের তরে তুমি নদীয়ায় পাঠাইয়াছিল আমায়?' এই তাঁহার মনের ভাব। তদ্দর্শনে

গৌর উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও নদীয়ার সমাচার সুধাইলেন, জগদানন্দ বলিতেছেন ঃ—

বিষ্ণু প্রিয়া মাতার কথা কি কহিমু আর ?
তান ভক্তি নিষ্ঠা দেখি হৈনু চমৎকার।
শচী মাতার সেবা করেন বিবিধ প্রকার ;
সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবার॥
প্রত্যহ প্রত্যুষে গিয়া শচীমাতা সহ।
গঙ্গা স্নান করি আইসেন নিজগৃহ॥
দিনান্তেহ আর কভু না যান বাহিরে।
চন্দ্র সূর্য্য তান মুখ দেখিতে না পারে॥
প্রসাদ লাগিয়া যত ভক্তবৃন্দ যায়।
শ্রীচরণ বিনা মুখ দেখিতে না পায়॥
তান কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিতে না পারে।
মুখপদ্ম ম্লান সদা চক্ষে জল ঝরে॥
শচী মাতার পাত্রশেষ মাত্র সে ভুঞ্জিয়া।
দেহ রক্ষা ঐছে সেবার লাগিয়া॥
শচীসেবা কার্য্য সারি পাইলে অবসর।
বিরলে বসিয়া নাম করে নিরন্তর॥
হরিনামামৃতে তান মহারুচি হয়।
সাধ্বী শিরোমণি শুদ্ধপ্রেম পূর্ণ কায়॥
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়।
তাহান কৃপাতে পাইনু তাঁর পরিচয়॥

তব রূপ সাম্য চিত্রপট নির্ম্মাইলা।
প্রেম ভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদ পদ্মে করি আত্মনিবেদন॥

অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ।

প্রভু অসীম শক্তিধর পুরুষ বলিয়া নীরবে জগদানন্দের কথা শুনিলেন। যখন সাগরে তরঙ্গ উঠে, ধীরে তখন সলিলরাশি আন্দোলিত হয়; তারপর সে কম্পন ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, পরে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হয়। শুনিতে শুনিতে গৌরাঙ্গের নয়ন জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, তখন তাড়াতাড়ি জগদানন্দকে নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, 'জগদানন্দ! আর ওসব কথায় কাজ নাই, অন্য কথা বল।' যথা অদ্বৈত প্রকাশে—

"মহাপ্রভু কহে আর না কহ ঐ বাত।
শান্তিপুরে আচার্য্যের কহ সুসংবাদ॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ত গৌরবক্ষোবিলাসিনী। জগতের দৈন্যদশা দূর করিতে সেই নিজ প্রিয়াকে দীনা অনাথিনী করিয়াছেন ও নিজেও দীনবেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এ সব কথা শুনিয়া কি মনে করিবেন তিনি, সে কথা না বলিলেও চলে। এইরূপ কঠোর করিয়া—এইরূপ রাজরাণী অনাথিনী হইয়া জগজ্জীবের ত্রাণোপায় করিয়া গিয়াছেন—চিরতরে তাহাদের চিত্তশোধন করিয়া গিয়াছেন।

ভাই পাঠক! প্রভুর সন্ন্যাসের পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনিতে হইলে ধৈরয্ ধরিয়া এই সব কথা শুনিতে হইবে। এই সব কথাই এই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গ্রন্থের রচয়িতার সুনিপুণ লেখনীতে সুন্দররূপ চিত্রিত হইয়াছে।

বহু বহু ভাগ্যবান ভক্ত আছেন—যাঁহারা মাথুর শুনিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা নব-ব্রজ-যুবদ্বন্দ্বের অপূর্ব্ব মিলনসুখার্ণবের নবনবায়মান ঊর্ম্মিরাজির চিত্ত চমৎকারী চাকচিক্য বিলোকনে সদা বিমুগ্ধ। তাঁহাদের আরধ্যতত্ত্ব নিত্য কিশোর, তিনি এক তিলও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন না। এস্থানে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর একটী মনোহর বাক্য মনে পড়িতেছে, তিনি বলিতেছেন—

"সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুলখেলাস্থলযুজং
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্‌যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি ॥
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ।"

স্বনিয়ম দশকং—৩

ভাবার্থ—আমি স্বয়ং কৃষ্ণবিরহী ও কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কৃষ্ণের অনুমতি পাইলেও, শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাস্থলশোভিত ব্রজ ভূমি ছাড়িয়া প্রৌঢ় কৃষ্ণ দর্শনের জন্য বাক্যেও দ্বারকায় যাইতে পারি না।

শ্রীমতী বলিতেছেন—সখি! আমি আর কৃষ্ণরূপ হেরিব না; কি বিপদ্, যেমন বলা, অমনি কৃষ্ণরূপ চতুর্দ্দিক হইতে স্বীয় অচিন্ত্য প্রভাব বিস্তার করিয়া মানিনীকে বিব্রত করিয়া তুলিল!

প্রেমিক রসিক ভক্ত যেমন শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর মাধুরী ব্যতীত দেখিতে চাহিবেন না, অমান সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার "প্রৌঢ়বিভব" আসিয়া সম্মুখে উপনীত!! আলোর অনুষঙ্গে অন্ধকারের স্বরূপ, দিবার সহিত রাত্রির ভাব আপনি চিত্তে ভাসিয়া উঠে, কি বিপদ!

শ্রীভগবানের তাবৎ বৈভব নিত্য, অব্যয় অচিন্ত্য! এবং নিত্য বলিয়াই প্রত্যেকটীই মাহাত্ম্যযুক্ত। এই মাহাত্ম্যের প্রভাব ভক্তচিত্তে প্রতিফলিত না হইলে কোথায় হইবে? ইহার একটি সুন্দর উপস্থিত

উদাহরণ দিব। এই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গ্রন্থের লেখক পরম ভক্ত শ্রীমৎ বিধুভূষণ সরকার বি, এ, আগে ভাবেন নাই যে তিনি কখনও বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সকলের সম্মুখে বাহির করিবেন। যে চিত্র নেহারিতে নিজের নয়নে নীরধারা ঝরে, সে বিষাদচিত্র কেমনে অন্যকে দেখাইয়া ব্যথিত করিবেন? কিন্তু তারও আবশ্যকতা আছে। তাই তাঁহারা নিজে ভক্তের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন; এবং দিয়াছেন বলেই আজি আমরা এই অপূর্ব্ব লীলা ও সিদ্ধান্ত পূর্ণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থের ২য় খণ্ড পাইতেছি। তিনি গ্রন্থের সূচনাস্বরূপ যে সুন্দর লিপি আমার কাছে পাঠাইয়া ছিলেন, এ মলিন হস্তে তাহা স্পর্শ না করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার স্বরূপ এস্থানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, এই সেই সুন্দর—

সূচনা।

"শ্রীশচীর দুলাল শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ এ অযোগ্যের নিকট কেন আসিলেন, জানি না। অযাচিত ভাবে তাঁহারা আসিলেন। আমি তাঁদের একটু প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিলাম না। তাহা ত দূরের কথা, তাঁহারা যে আমাকে সতত ভালবাসিতেছেন, তাহাও সব সময় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের নিকট বলিলাম, 'প্রভু, আমি ত তোমায় একটুও ভালবাসিতে পারিলাম না।' তিনি উত্তর করিলেন, 'তা তুমি আমায় ভালবাস না বাস, আমি তোমায় নিত্যই ভালবাসিব। আমার ধর্ম্মই ভালবাসা। তুমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষ কর আর না কর, আমি আমার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।' আর একদিন শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকরুণ, আমি করিব কি?' তিনি উত্তর

করিলেন, 'তুমি যা' খুষী কর, আমি সব বিষয়েই শৃঙ্খলা রাখিব।' সত্যই তিনি সতত আমার সুখের বিধান করিতেছেন। কিন্তু, আমি যে তাঁহাদিগকে একটু ভালবাসিতে পারিলাম না। বহু প্রেমিক লোক আছেন, তাঁহারা যদি এই ভজনটী পাইতেন, তবে তাঁহাদের বড় সুখ হইত, আমারও আনন্দের অবধি থাকিত না।

"একদিন স্বপ্নে আমি বলিতেছি, 'শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ—শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ,' 'শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ—শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ,' 'শ্রীগদাধরচন্দ্রায় নমঃ—শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ,' 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ—শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ,' তখন শ্রীমতী দর্শন দিয়া বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ বলিলে না কেন?' আমি বলিলাম, আর, ঠাকরুণ, সন্ন্যাস লীলার কথা ভাল লাগে না; ও' ব'লে আর আজ নাই!' তিনি বলিলেন, 'আরে ঐ সন্ন্যাসলীলাই চৌদ্দ আনি—উহার উপরই নদীয়া-যুগলকিশোর-ভজন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।' শ্রীদাদার নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলাম। তিনি কহিলেন, 'প্রভুর এই পাষাণ গলান সন্ন্যাসলীলায় যে যত আর্দ্র হইবে, সে তত নদীয়াযুগল ভজনে আকৃষ্ট হইবে।' তিনি আরো কহিলেন, 'শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট দিয়া দিলেন, ইহাই প্রভুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান।' এই ঘটনা হইল প্রায় ৮।১০ বছর পূর্ব্বে। ইহার পর হইতেই আমি কঠিন বলিয়া. শ্রীমতী আমাকে তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শী বিরহ-লীলা দেখাইতে লাগিলেন। উহা লিখিয়া রাখা হইল। শ্রীশ্রীদাদা প্রকট থাকা কালেই তাঁহারা অনেকটা শুনিয়া অত্যন্ত অধীর হন।

"তার পর গত বৎসর পূজার ছুটীতে যখন প্রভু আমায় প্রায় একমাস কাল শ্রীনীলাচলধামে রাখেন, তখন বহু লোকাতীত ঘটনা দর্শন হয়। প্রথমতঃই স্থানটী যেন কত পরিচিত বলিয়াই মনে হইল, এমন কি, শ্রীজগন্নাথের মন্দির খানিতে যাইয়া মনে হইল যে, ওখানি যেন আমারই

অতি নিজজনের বাড়ীঘর। গদাধরের গোপীনাথের বাড়ী, সিদ্ধ বকুল প্রভৃতি সবই যেন আমার অতি আপনার জনের জায়গা বোধ হইল। কেন হইল জানি না। তবে আমার যে অপার সুখ অনুভব হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। সর্ব্বত্রই বড় সুখ হইয়াছে—কোথাও বিরহজনিত দুঃখ জাগ্রত হয় নাই। গম্ভীরা কুঠরীর নিকটে যাইতে বড় একটা সাহস হয় নাই, কিয়দ্দূরে থাকিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গুণ্ডিচা মন্দিরে যাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না,—সব শূন্য দেখিতে লাগিলাম, শ্রীমতীর বিরহস্মৃতি মূর্ত্তিমান্ হইয়া জাগিয়া উঠিল*; আমি বিকল হইয়া পড়িলাম। যাঁহারা সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। গুণ্ডিচা বাড়ীতে যে এইরূপ হইল, ইহার পূর্ব্বেই কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাসায় থাকিয়া জাগ্রত অবস্থায় কোন দিন দ্বিপ্রহরের সময়, কোন দিন বিকালবেলা শূন্যে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌর' নাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। ওখানে এই কীর্ত্তন কখন হয় না, তথাপি শুনিলাম। মনে হইল অশরীরী নদীয়া নাগরীগণ এখানে আসিয়া এই কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং ভাবিলাম, পাছে বা নীলাচলবাসিগণ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে চিরসন্ন্যাস-বেশেই রাখিয়া দেন, এই ভয়ে নাগরীগণ সেখানে যাইয়া এই কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং তিনি যে নদীয়া নাগর, বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ, তাহা জীবকে জানাইতেছেন। আর একদিন শেষ রাত্রে আমি ও আর একটী যুবক বারেন্দায় বসিয়া আছি, উভয়ে শুনিলাম, শূন্যে মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন হইতেছে, কীর্ত্তনের পদ বুঝিলাম না। তখনো নিয়মসেবা আরম্ভ হয় নাই, এবং, যেদিকে ঐ মঙ্গল আরতির শব্দ শুনিলাম, সে দিকে কোন মন্দির নাই। তারপর স্থূলভাবেই একদিন বাসায় ঐ 'বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর' নাম অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইল এবং নগর সংকীর্ত্তনও হইল।

"একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনবদ্বীপে বসিয়া হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-সংবাদ পাইয়া অতি করুণকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার ক্রন্দনের হেতু এই, প্রভু তাঁহার নীলাচলের একটী প্রধান সঙ্গী হারা হইয়াছেন। জাগ্রত হইয়া ভাবিলাম, নীলাচলে ও নবদ্বীপে একটী অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে; শ্রীগৌরাঙ্গের এ ত্যাগ ত্যাগ নহে, মিলনের—শুধু শ্রীগৌরাঙ্গে ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় নহে, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত জীবের মিলনের, সহজ কথায়, জীবে ভগবানে মিলনের একমাত্র অতি প্রকৃষ্ট কৌশল।

"আর একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, শ্রীজগন্নাথ আসিয়া আমার পার্শ্বে শয্যার উপর বসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একটী রমণী; তাঁহাকে চিনিলাম না। জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কে?' শ্রীজগন্নাথ বলিলেন, 'ইনি আমার পত্নী, ইহাকে নূতন বিবাহ করিয়া আনিয়াছি। দেখ দেখি ইনি কেমন হবেন!' জাগ্রত হইয়া ভাবিলাম, 'ইহার অর্থ কি?' কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মনে করিলাম, জগন্নাথসুন্দর ত রসিক শেখর। তিনি আমার সহিত বোধ হয় রসিকতা করিলেন। পরদিন ভোরে প্রায় নয়টার সময় আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল। দেখি সেই রমণীটী বাসায় আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে তাঁহার ঐহিক স্বামী। ঐ স্বামীটী এক মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। তিনি ঐ রমণীটার কথা কহিলেন যে, উনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াতে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং নদীয়া-যুগল-ভজন গ্রহণ করিবেন। জগন্নাথের রঙ্গ দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম, জগন্নাথ ত ইঁহাকে পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কহিলাম, 'প্রভু ত তোমায় আগেই গ্রহণ করিয়াছেন! তবে লৌকিকভাবে প্রভুতে আত্মসমর্পণ করিতে হয় কর।' তিনি প্রভুতে আত্মসমর্পণ করিলেন, অর্থাৎ, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে স্বামিত্বে বরণ করিলেন এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার দাসী হইয়া যুগলভজন লইলেন।

ঘটনাটী লইয়া মনে একটু বিচার হইল। ভাবিলাম, আমাকে দর্শন দিলেন জগন্নাথ, এবং এই রমণীটী তাঁহারই পত্নী বলিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, কিন্তু, এখন প্রত্যক্ষ দেখিলাম, ইনি গৌরাঙ্গ সুন্দরের পত্নী হইলেন। মনে করিলাম, জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গচন্দ্র ত একই বস্তু কারণ, প্রভু যখন নীলাচলে সন্ন্যাসিরূপে বিহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকেই ত সকলে সচল জগন্নাথ কহিত ও শ্রীনীলাচলচন্দ্রকে অচল জগন্নাথ কহিত. প্রভু যখন অপ্রকট হন, তখন ত তিনি জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সঙ্গেই মিশিয়া যান। মীমাংসা অনেক পরিমাণে হইল বটে, কিন্তু, আবার মনে হইল, নীলাচলে যিনি বিহার করিলেন, তিনি সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তিনি, স্ত্রীলোকের সঙ্গ করা দূরের কথা, স্ত্রী নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও জগন্নাথ একই বস্তু; আবার এখন দেখিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও জগন্নাথও ত একই বস্তু, কারণ, ঐ রমণীটী, যিনি জগন্নাথের পত্নী বলিয়া জগন্নাথ আমার নিকট বলিলেন, তিনি যাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন অর্থাৎ যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন, তিনি সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নহেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন, বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ, নাগরীবল্লভ, নদীয়াবিনোদ। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম এবং ইহাই দৃঢ়প্রত্যয় হইল যে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে বাহিরে সন্ন্যাসী সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে লীলা করিলেন, ইহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভজনীয় নহেন, এবং, তিনি বাহিরে সন্ন্যাসলীলা করিলেও তিনি যে নদীয়ানাগর বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, তাহাই তিনি নিত্য রহিলেন এবং তাহাই জীবের ভজনীয়।”

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

Opinion

Amrita Bazar Patrika, Wednesday,
January 12, 1927

Sree Sree Vishnupriya, Part II.

It is a very invaluable book. It describes in a very simple and elegant language the sweet, blissful life and Leela of Sree Bishnupriya, the Divine Consort of Sree Gauranga. The Mahagambhira Leela of Sree Vishnupriya is so beautifully, vividly and feelingly depicted, that whoever goes through it cannot but be drenched in sacred tears and attracted to the lotus feet of The Lord Sree Gauranga. The book is written on a historical basis and very rightly and most reasonably does the author show in his inimitable language, that Vishnupriya is the main figure and the principal personage in Gaur Leela and that she is the perfect embodiment of womanhood and the highest Ideal of all womanly attributes and devotional feeling. We are charmed to see how the author shows that Sree Vishnupriya, the representative of all the beings, went through most unbearable but self-imposed suffering and pangs of separation from Her Lord only for the salvation of human kind. It thrills every heart, purifies every soul, ennobles every spirit and translates the man to the Supreme region of love which is the "Summum Bonum" of human life From a literary point of view the book is unrivalled. We invite all to read this precious book It can be had of Sree Gauranga Sabha, Basanda, Barisal.

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ করুণানিধি, শুধু করুণানিধি নহেন, তিনি প্রেমের নিধি। করুণানিধি বলিলে তাঁহাকে দূরে রাখা হয়, আর, প্রেমময় বলিলে তাঁহাকে অতি নিজজন বলিয়া মনে হয়। করুণা হয় অপরের প্রতি, আর প্রেম হয় নিজজনের প্রতি। আমরা তাঁহার অতি নিজজন। তিনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন। তাই তিনি মানব সমাজে মানবরূপে আসিয়া উদিত হন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতরূপে জীবের নিকট প্রকাশিত হন। প্রাকৃত সংসারকে অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে পরিণত করার জন্য মায়ার আবরণ লইয়া মায়ামানুষরূপে জীবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন ও জীবের সহিত লীলা করেন। ইহা আমাদের ধ্যান ও আস্বাদনের বিষয়। এই ধ্যান ও আস্বাদনে মন পবিত্র হয়, শুধু পবিত্র নহে, পরমানন্দ যে আমাদের চরম লক্ষ্য, আমরা তাহা প্রাপ্ত হই।

যাঁহারা অবতারবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য এইরূপ লীলা ধ্যান করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা ইহা লৌকিক করিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কৃপা করিয়া তাঁহারা ইহা বিনীতচিত্তে বিচার করিবেন। ইহা যদি আপনাদের প্রাণে

লাগে, তাহা হইলে আর তর্ক না করিয়া কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অবতার অর্থ কি? যে শক্তি, গুণ, কিম্বা ভাব সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অথবা, যাহা আমাদের ধারণার অতীত, অথচ যে শক্তি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তাহা যদি কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তবে সেইখানে স্বভাবতঃই আমাদের মস্তক অবনত হয়, এবং তাঁহাকেই অবতার বা মহাপুরুষ বলা হয়। অবতার ও মহাপুরুষে আবার পার্থক্য আছে। যাঁহার মধ্যে সেই লোকাতীত শক্তি সাময়িক প্রকাশ পায়, তিনি মহাপুরুষ; আর, যাঁহার মধ্যে সেই শক্তি সর্ব্বদাই প্রকাশমান, যিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তিনি অবতার। আমরা বহুবিধ শক্তির খেলা দেখিতে পাই, কিন্তু সব শক্তি আমাদের চিত্তাকর্ষক নহে। বীরত্ব একটী শক্তি, ইহার নিকট আমরা মস্তক অবনত করি বটে, কিন্তু তাহা ভয়ে, শ্রদ্ধা বা ভক্তিতে নহে। জ্ঞান গরিমা একটী শক্তি, ইহার ক্রিয়া দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। এইরূপ বহুশক্তিরই আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, কোন শক্তিই আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র প্রেম শক্তিই হৃদয়ের উপরে সর্ব্বতোভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। প্রেম সকলের হৃদয় অধিকার করে। প্রেম বিশ্ববিজয়ী।

মানবের ধর্ম্ম কি? প্রেমই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম। বড় হইয়া অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মানুষের ধর্ম্ম নহে। ইহা হিংসাবিদ্বেষ-মূলক। ইহা পশু বা অসুরের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়— দেহের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম। দেহের ধর্ম্ম—দৈহিক সুখ বৃদ্ধি করা; ইহা জড়তার কার্য্য। ইহা অতিশয় নিম্ন স্তরের ধর্ম্ম। দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ এই ধর্ম্মের যাজন করা হয়। ইহা পশুভাব। মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া, অপর অপেক্ষা বড় হইতে চেষ্টা করা,

জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করা মনের ধর্ম্ম। ইহা দেহের ধর্ম্ম অপেক্ষা একটু উচ্চস্তরে বটে। কিন্তু ইহাতেও জড়তা আছে। এই জন্য ঋষিগণ মনকেও জড় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইহা পশুভাবের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বটে, কিন্তু ইহা মানব ধর্ম্মের নিম্নে। আর, প্রাণের ধর্ম্ম প্রেম—সকলকে ভালবাসা। অমুকে ছোট, আমি বড়, এই ভেদ বুদ্ধি বিদ্বেষ মূলক। মানুষে ইহা শোভা পায় না। ইহাতে একে অন্যের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া যায়—দূরে সরিয়া পড়ে। আর প্রেমে সকল আপন হইয়া যায়, সকলের মধ্যে মধুর মিলন হয়। ইহাতে প্রাণ শীতল হয়, জীবের চরম লক্ষ্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্য সকল ধর্ম্মেই জ্বালা ভোগ করিতে হয়। এই প্রেমই মানবধর্ম্ম। ইহা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। ইহাতে জড়তার লেশমাত্র নাই, ইহা বিশুদ্ধ চিদানন্দময়। এই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকাশ আমরা যাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই, তাঁহাকেই আমরা অবতার বলি। এই প্রেমময় বস্তুটীকেই আমাদের হৃদয়ের রাজা করিতে সাধ হয়।

অবতারের প্রয়োজন কি? প্রেম মানবের ধর্ম্ম, কিন্তু কালবশতঃ মায়ার প্রভাবে যখন দেহ-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম প্রবল হইয়া পড়ে, ও প্রাণের ধর্ম্ম নিস্তেজ হয়, অর্থাৎ, পশুভাবের প্রভাব বিস্তার লাভ করে, তখন মানব-সমাজ হইতে সুখ শান্তি, নিরাবিল আনন্দ অন্তর্হিত হয়, তখন সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির পরিবর্ত্তে জ্বালা, এবং আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদ আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া ফেলে। যে জগত আমাদের সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, যে জগত অপ্রাকৃত চিদানন্দময় জগতেরই ছায়া মাত্র, এবং অনন্ত অফুরন্ত আনন্দময় নিকেতনে আরোহণ করার জন্য যে জগত খানি প্রাথমিক সোপান স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই জগত প্রেমের অভাবে ও পশুভাবের প্রাবল্যে জ্বালাময় মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। কোথায় জগত

খানিকে আশ্রয় করিয়া মানুষ হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া গাহিয়া আনন্দময় ধামে চলিয়া যাইবে, আর কোথায় সেই জগতখানিই তাহার নিকট কারাগার বলিয়া মনে হয়, এবং সে যেন বড় বন্ধনদশায় পড়িয়াছে বলিয়া সর্ব্বদা জ্বালায় ছট্ ফট্ করে! কেবল হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, জিগীষাবৃত্তি প্রভৃতি জ্বালাময় ভাব প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপে যখন মানবের ধর্ম্ম মানবসমাজ হইতে তিরোহিত বা লুক্কায়িত হয়, ও মানুষ দুঃখ দৈন্যে পড়িয়া অশেষ জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করে, তখন প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, মানুষকে মানুষের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত আদর্শ মানব আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া, তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহার কার্য্যাবলী বা লীলা স্মরণ ও মনন করিয়া মানুষ পশুভাব ছাড়িয়া আবার মানুষ হয়। আবার মানুষে মানুষে মিলন হয়, আবার জগতখানি আনন্দময় নিকেতন বলিয়া অনুভূত হয়। এই প্রেমের গুরু, প্রেমের পথ প্রদর্শক আদর্শ মানবকেই অবতার বলা হয়।

ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি কোন বিধি নিয়মের অধীন নহেন। তিনি বিধিরও বিধি। যখন যেরূপ বিধি করা প্রয়োজন, তখন তিনি সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। তাঁহার উপরে কেহ কর্ত্তা নাই। তিনি যখন যেরূপ বিধি করেন, তখন সেইরূপ আচরণ করা ও তাহার অনুসরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য এবং ইহাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কখন মহাপুরুষ পাঠান প্রয়োজন হয়, কখন অবতারের প্রয়োজন হয়। কখন শ্রীরামচন্দ্র আসিলেন, কখন শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, কখন যীশুখ্রীষ্টকে প্রেরণ করিলেন, কখন হজরত মহম্মদকে প্রেরণ করিলেন, আবার সকলের শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন। এই শ্রীগৌরাঙ্গই সকলের শেষ অবতার ; সকলের শেষে যে ব্যবস্থা হয়, তাহাই মানিয়া চলা মানুষ মাত্রের কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি প্রেমঘন মূর্ত্তি, অর্থাৎ, প্রেম দিয়া তাঁহার তনু গড়া ; যেহেতু, তাঁহার দর্শনে, তাঁহার নাম স্মরণে, তাঁহার লীলাকাহিনী আলোচনায় স্বভাবতঃই মানুষের প্রেমের উদয় হইয়াছে, অদ্যাপি তাঁহার লীলাস্মরণে প্রেমের উদ্রেক হয়। প্রেম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু ইহা মায়ার আবরণে আবৃত, তাই, লৌকিক জগতে ইহার ক্রিয়া বড় একটা দেখা যায় না ; কিন্তু যেখানে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ, সেই বস্তুর সঙ্গ করিলে সকলেরই স্বীয় স্বাভাবিক প্রেমের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। নাম গ্রহণ বা লীলা স্মরণ দ্বারা সঙ্গ করা হয়। এই যে আমরা বলিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমঘন মূর্ত্তি, ইহাতে, যাঁহারা মূর্ত্তিবাদের বিরোধী, তাঁহারা আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,যে,প্রেম একটী ভাব, ইহার আবার মূর্ত্তি কি? তাঁহারা একটু কৃপা করিয়া আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন। বাহিরে আমরা যত মূর্ত্তি দেখিতে পাই, সকলই এক একটী ভাবের বিকাশ। যেমন, কলাগাছ একটী ভাব। ভাবে ইহার সত্ত্বা। কলাগাছ এই মূর্ত্তিটী সেই ভাবের বহির্বিকাশ। যাবতীয় মূর্ত্তিই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবঘনমূর্ত্তি। প্রেমঘন মুর্ত্তি বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুগ্ধের সর্ব্বত্রই—প্রত্যেক বিন্দুতেই ঘি আছে, কিন্তু তাই বলিয়া দুগ্ধকে কেহ ঘি বলে না, কিম্বা ঘি কে দুগ্ধ বলে না। দুগ্ধের সর্ব্বত্র যে ঘি ছড়ান রহিয়াছে, তাহা ঘনীভূত হইলেই দুগ্ধ ঘি-এর মূর্ত্তি—ঘিয়ের আকার ধারণ করে। এই দুগ্ধ আবার গাভীর রক্ত হইতে উৎপন্ন, সুতরাং গাভীর প্রতি রক্ত বিন্দুতেও ঘি রহিয়াছে। আবার ঘাস হইতে রক্ত হয়, সুতরাং ঘাসের মধ্যেও ঘি রহিয়াছে। এই যে ঘি-এর সর্ব্বত্র বর্ত্তমানতা, ইহার প্রকার বিশেষে ঘনীভূত মূর্ত্তিতেই ঘি-এর বিকাশ। এই রূপ প্রেম জগতের সর্ব্বত্র, সকল জীবের মধ্যে, সকল বস্তুর মধ্যে, সকল ব্যাপারে ছড়ান রহিয়াছে। অণুতে অণুতে যে আকর্ষণ, জীবে জীবে

যে আকর্ষণ, ইহা প্রেমেরই ক্রিয়া। অচেতন পদার্থে এই প্রেমের ক্রিয়া অস্ফুট, সুতরাং আমরা ইহা বড় একটা অনুভব করিতে পারি না। স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ জীবের মধ্যে ক্রমান্বয় এই প্রেমের বিকাশ বেশী দেখা যায়, এবং, মানুষের মধ্যে ইহা আমাদের বেশী উপলব্ধির বিষয় হয়। এই যে জগন্ময় ব্যষ্টিভাবে প্রেম রহিয়াছে, তাহার সমষ্টিই শ্রীভগবান্। এই প্রেমঘন মূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গ। শুধু সমষ্টি বলিলেও কথাটা ঠিক হয় না। ভগবান্ অনন্ত প্রেমের অফুরন্ত উৎস। কোন কিছু দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, তবে আমরা সীমাবদ্ধ জীব বলিয়া সীমাবদ্ধ ভাষাদ্বারা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি, বা, আত্মকৃতার্থতা বোধ করি। আমরা মানুষ, লোকাতীত বস্তুর সহিত সঙ্গ করিতে আমরা সমর্থ নহি। তাই, প্রেমময় মূর্ত্তি পরিপূর্ণ মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আসিলেন। অন্যান্য জীব অপেক্ষা মানুষের মধ্যে প্রেমের বিকাশ, প্রেমের ক্রিয়া অত্যন্ত অধিক। কিন্তু, ইহার অপকর্ষে মানুষকে পশুর সমান্ বা পশু অপেক্ষাও হেয় করিয়া ফেলে। মানবসমাজে যখন এই অবস্থা হইয়াছিল, তখন প্রেমের মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন, আসিয়া মানুষকে তাঁহার সঙ্গ করিতে ও প্রেমলাভ করিতে অবসর দিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমঘন মূর্ত্তি, ইহার যথার্থতা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। তিনি যখন মায়ের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখন যিনিই তাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহারই বাৎসল্য প্রেম উথলিয়া উঠিত। সকলেই নিমাই-চাঁদকে স্নেহ করিতেন। সকলেরই বাৎসল্য প্রেমের বিষয় এই একটী মাত্র বস্তু হওয়ায় সকলের মধ্যে প্রীতি হইল। নিমাইচাঁদ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করায়, সকলেরই হৃদয় একমাত্র নিমাইচাঁদে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, সকলেই পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে লাগিল। আমি আমার পুত্রকে ভালবাসি, আপনি আপনার পুত্র কন্যা ভালবাসিতেছেন, এইরূপ

প্রত্যেকেই স্ব স্ব সন্তানকে ভালবাসেন। প্রত্যেকের মধ্যেই অপত্যস্নেহ বা বৎসল্য প্রেম রহিয়াছে। অথচ, এই বাৎসল্য প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া আমি আপনার সহিত ঝগড়া করিতেছি, আপনার পুত্র অপেক্ষা আমার পুত্রকে অধিক সুখে রাখিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছি। আপনিও এই একই কারণে আমার সহিত বিরোধ করিতেছেন। এইরূপ প্রায় প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ বিবাদ করিয়া অশান্তির সৃজন করিতেছেন। এমন কি, স্বীয় পুত্রকে অধিকতর সম্পত্তিশালী করার জন্য অপরের পুত্রের সম্পত্তি ছলে বলে লুণ্ঠন করিয়া লইতে বা তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন না। অপরের সন্তানকে তাহারই জনক জননীর সম্মুখে বধ করিয়া তাহার মাংসে স্বীয় সন্তানের রসনার তৃপ্তিসাধন ও দেহের অযথা পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিতেছি ও তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। বাঘ ভল্লুক যেরূপ স্বীয়শাবকের তৃপ্তি সাধনের জন্য, অন্য জন্তু শিকার করিয়া আনে, আমরাও প্রায় তদ্রূপ করি। মোট কথা, একই বাৎসল্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা হিংস্রজন্তুর ন্যায় আচরণ করি। এই ক্ষুদ্র ভালবাসায় প্রণোদিত হইয়াই আমরা এতদূর অজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়ি, যে, উভয়ে বিরোধ করিয়া ভগবানের পর্য্যন্ত স্তব স্তুতি করিতে থাকি, যেন, তিনি আমার তোষামুদিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমার উন্নতি ও অপরের বিনাশ সাধন করেন। প্রত্যক্ষভাবে অপরের বিনাশ প্রার্থনা না করিলেও, আমি যে আমার জয়ের প্রার্থনা করি, তাহাতেই অপরের পরাজয়ের প্রার্থনা করা হয়। ভগবান্, যিনি সকলের পিতা বা প্রভু, যিনি সমদর্শী, তাঁহার সম্বন্ধে পর্য্যন্ত আমাদের স্ব স্ব ভাবানুরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বসি। পশু পক্ষী মৎস্যাদি শিকার করিতেও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। কি বিষম ভ্রান্তি! কোথায় ভালবাসায় হৃদয় সরস হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত

হইবে, আর, কোথায় এই সংকীর্ণ ভালবাসায় মানুষকে এক একটী হিংস্র জন্তুতে পরিণত করে! বাস্তবিক পক্ষে ইহা ভালবাসা নহে, ইহা কাম বা আত্মসুখ-বাঞ্ছা, ইহারই এই বিষম পরিণতি। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিবার পূর্ব্বে নদীয়া নগরে খুব বিদ্যা-চর্চ্চা হইত। পণ্ডিতেরা খুব সম্মান পাইতেন। বিদ্যা লইয়া জয় পরাজয় হইত। জিগীষাবৃত্তি লইয়া সকলে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। পিতা ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার পুত্রটী অপরের পুত্র অপেক্ষা বেশী বিদ্বান্ হউক। ইহার অর্থ এই, অপরের পুত্রটী মূর্খ ও অনাদৃত থাকুক, তাঁহার পুত্রটী অধিকতর গুণশালী ও সম্মানিত হউক। এই রূপে সকলের মধ্যে একটী অশান্তিজনক বিরোধের সৃজন হইল। যে বিদ্যায় হৃদয় প্রশস্ত হয়, তাহাতেই তাহাদের মধ্যে কলহের সৃজন করিল। শুধু বিদ্যা নহে, জাতিভেদ লইয়া, ধনগৌরব লইয়া সকলের মধ্যে এক বিষম বিরোধ ও অপ্রীতি হইয়াছিল। কিন্তু, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করায় সকলের ভেদবুদ্ধি নদীয়া হইতে তিরোহিত হইল। ইহার কারণ কি? দেহাভিমান হইতেই ছোট বড় এই ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে প্রেম, তাহা পর্য্যন্ত এই দেহাভিমানে ভুলাইয়া দেয়। যখন পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সকলে দর্শন পাইল, তখন স্ব স্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রেম উদ্বুদ্ধ হইল এবং সকলের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইল। এখন দেখুন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী কি! আমার পুত্র এবং আপনার পুত্রও বাৎসল্যপ্রেমের বস্তু বটে, কিন্তু এই সংকীর্ণ বাৎসল্যে কি এক জ্বালা, ঘোর অশান্তি, আর শ্রীনিমাইচাঁদ যে বাৎসল্যপ্রেমের বস্তু, তাহাতে পূর্ণ শান্তি, পরম তৃপ্তি। নিমাইচাঁদকে পাইয়া কি নদীয়াবাসিগণ স্বীয় পুত্র-কন্যাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? না, তাহা নহে। নিমাইএর সঙ্গপ্রভাবে তাহাদের কলুষহৃদয় পবিত্র হইল, কঠিন নীরস হৃদয় সরস হইল। সেই সরস হৃদয় লইয়া

তাঁহারা সকলকেই ভালবাসিতে লাগিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেমের প্রভাব দেখুন!

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলাকাহিনী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার অবসর আমাদের নাই। পাঠকগণ কৃপা করিয়া তাহা শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মূল্যবান্ গ্রন্থনিচয় পাঠ করিয়া অবগত হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমঘন মূর্ত্তি, তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া বালক নিমাইচাঁদের প্রতি যে সকলের স্বাভাবিক প্রীতির আকর্ষণ হইয়াছে ও তাহাতে তাহাদের হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গের পৌগণ্ড ও কিশোর বয়সের লীলা আলোচনা করিলেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই এবং তিনি যে প্রেমের মূর্ত্তি,সেই কথার যথার্থতা বুঝিতে পারি। চঞ্চলতার মধ্যে একটা মাধুর্য্য আছে, বিশেষতঃ বালকের চঞ্চলতা চিত্তাকর্ষক, ইহা বালকের পিতা বা আত্মীয়ের নিকটই বিশেষ প্রীতিকর। কিন্তু, নিমাইয়ের চঞ্চলতা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং এমন কি, অদ্যাপি উহা পাঠ করিলে হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কেন না, মাধুর্য্যময় চঞ্চলতা যে একটী ভাব, ইহার ঘনীভূত মূর্ত্তি নিমাই। সকল ভাবেরই ঘনীভূত পরিপূর্ণ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ, অর্থাৎ, জগতে যত ভাব আছে বা সম্ভবপর হইতে পারে, এবং, যে সকল ভাবের কার্য্য বাহিরে খণ্ড খণ্ড রূপে মানুষের মধ্যে দেখা যায়, সেই সকল ভাবেরই পরিপূর্ণ ঘনীভূত বিকাশ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ। কোন কোন ভাব আমরা হেয় বলিয়া মনে করি, যথা, ক্রোধ, গর্ব্ব, অভিমান প্রভৃতি। কিন্তু, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় দেখা যায় যে, তিনি যখন ক্রোধ করিয়াছেন, কিম্বা, গর্ব্ব বা অভিমান করিয়াছেন, তখন তাহা লোকের চিত্তাকর্ষকই হইয়াছিল, বিরক্তিজনক হয় নাই। ইহার কারণ কি? প্রেম যে একটি ভাব, ইহা সকল ভাবের

উপরই প্রভাব বিস্তার করে—সকল ভাবই প্রেমের অন্তবর্ত্তী। ক্রোধ বা অভিমান যখন প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন ইহা চিত্তাকর্ষক না হইয়া পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের তাহাই হইয়াছিল। তিনি ক্রোধ করিয়া ভাণ্ড বাসন ভাঙ্গিতেন, শচী মা তাহাতে সুখ পাইতেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে তিনি পরাজয় করিলেন, তাহাতে তিনি সুখ পাইলেন। মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতির সহিত ন্যায়ের ফাঁকি করিতেন, ও তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে চাহিতেন, ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বড় আনন্দ পাইতেন। তাঁহা অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ-বয়স্ক প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে তদীয় পত্নীর সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রহার করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, শুধু সন্তুষ্ট হওয়া নয়, বড় আনন্দ পাইলেন। এইরূপ বহু বহু দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমস্বরূপ—তাঁহার সকল কার্য্যই প্রেমের পরিচায়ক ও প্রেম-উদ্দীপক।

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া বা তাঁহার সঙ্গ পাইয়া সকলের স্বাভাবিক প্রেম যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ দেখাইয়াছি। এখন, শ্রীগৌরাঙ্গ যে সকলকে নির্বিচারে ভাল বাসিয়াছেন, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব; যিনি প্রেমিক, তিনি অদোষদর্শী। পরের দোষ দর্শন করা তাঁহার প্রকৃতি নহে, কারণ প্রেম করাই তাঁহার ধর্ম্ম। কেহ অন্যায় করুক, তথাপি তাহাকে তিনি ভালবাসিতেন, এবং, এই বিশুদ্ধ ভালাবাসা দ্বারা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে শোধন কবিতেন। কোন কোন মানুষে বা মহাপুরুষে এইরূপ প্রেম কথঞ্চিৎ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক ও তাহার প্রভাব ক্ষীণ। শ্রীগৌরাঙ্গে ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণরূপে দেখা যায়। এইজন্য তাঁহাকে পরিপূর্ণ প্রেমের মানুষ বলা হয়। জগাই মাধাই কত পাপ করিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া গো-হত্যা ব্রাহ্মণ-

হত্যা, সুরাপান প্রভৃতি নিষিদ্ধ কদর্য্য কর্ম্ম করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার প্রাণের ভাই নিত্যানন্দের কপালে কলসীর কাঁধা ছুড়িয়া ফেলিয়া রক্তপাত করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ কি করিলেন? না—দুই ভাইকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। এ প্রেমের গভীরতা দেখুন! তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়া আত্মসাৎ করিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ হইলেন। মানুষ হইয়া মানুষের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা হইয়াছিলেন পশু অপেক্ষাও অধম, আর, শ্রীগৌরাঙ্গের আলিঙ্গন পাইয়া হইলেন প্রকৃত মানুষ—দেবতাদেরও আরাধ্য। যাহাদিগের ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিলে কুসঙ্গ প্রভাবে কলুষিত হইবার আশঙ্কায় লোকে দূরে পলায়ন করিত, তাহাদিগকে দেখিয়া এখন লোকে ভক্তি করিতে লাগিল, এবং, তাঁহাদের দর্শনে লোক পবিত্র হইত বলিয়া মনে করিত। কি সহজ মধুর পরিবর্ত্তন! প্রেমের কি অপূর্ব্ব-শক্তি! তবে যে শ্রীগৌরাঙ্গ দুই ভাইকে আলিঙ্গন দেওয়ার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল নিতাইয়ের প্রেমের গভীরতা দেখাইবার জন্য। ইহা দ্বারা গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গ করিলে ত প্রেম লাভ হইবেই; তাঁহার সঙ্গীর সঙ্গ করিলেও প্রেম লাভ অবশ্যম্ভাবী। গৌরাঙ্গ একটু ক্রোধ প্রকাশ করিলে পর নিতাই বলিলেন, "প্রভু, ইহারা অবোধ, না বুঝিয়া আমার রক্তপাত করিয়াছে। কিন্তু, প্রভু, ইহাদের হৃদয় প্রেম-বিহীন বলিয়া ইহারা যে জ্বালা পাইতেছে, তাহাতে আমি যতদূর ব্যথিত হইতেছি, এই রক্তপাতে তাহার কোটী ভাগের এক ভাগও ব্যথা পাই নাই। প্রভু, তুমি ইহাদিগকে প্রেম দাও। ইহাদের দৈন্য দুর্দ্দশা দূর কর।" ইহা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইলেন, গৌর-প্রেম পাইয়া নিতাই মলিন জীবের জন্য কত কাতর, কত ব্যথিত!

কাজী খোল ভাঙ্গিলেন এবং কীর্ত্তনে বাধা দিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ এবং জীবের প্রতি প্রেমার্ত্ত হইয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি এই কীর্ত্তন স্বজন করেন। তাহাতে কাজী বাধা দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন লইয়া কাজীর বাড়ী গেলেন, এবং, সহাস্যবদনে কাজীকে সম্ভাষণ করিলেন। প্রেমের নিকট কাজী হার মানিলেন, এবং, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট চির বিক্রীত হইলেন।

একদিন একটী ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তনে প্রবেশ করিতে অধিকার না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং, ক্রোধান্ধ হইয়া নিজের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনি যেন সংসারের সুখ হইতে বঞ্চিত হন। গৌরচন্দ্র ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক। আপনি আমাকে কাঙ্গাল সাজাইয়া সুখ পান, আমি আপনার সুখের জন্য কাঙ্গালই সাজিব।" সত্য সত্যই শ্রীগৌরাঙ্গ কাঙ্গাল সাজিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন, অবশেষে তিনি গৌরাঙ্গের অনুগত হইয়া প্রেম পাইয়া ধন্য হইলেন। ক্রোধ করা যাঁহার স্বভাব, তিনি বাঞ্ছা করেন যে, তিনি যাঁহার সহিত বিরোধ করিতেছেন, তিনিও তাঁহার সহিত বিরোধ করুন, তাহা হইলে তাঁহার ক্রোধবৃত্তির সফলতা হয়। ক্রোধ করিয়া যদি অপরের ক্রোধ জন্মান না যায়, তবে ক্রোধ সেখানে হার মানিয়া যায়। ব্রাহ্মণ প্রভুকে অভিশাপ দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও অতিশয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ কাটাইতে পারিতেন। বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ ত দূরের কথা, প্রভু যদি মনে একটু বাসনা করিতেন যে, ঐ ব্রাহ্মণ অযথা ক্রোধ করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে তিনি নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুন, তাহা হইলে, ঐ ব্রাহ্মণের ধ্বংস অনিবার্য্য হইত। প্রভুর এইরূপ ইচ্ছা করারও প্রয়োজন হইত না, তিনি যদি নীরব থাকিতেন, এবং, ঐ অভিশাপ অবনত মস্তকে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলেও

ব্রাহ্মণের ভীষণ সর্ব্বনাশ হইত। প্রভু সত্যপরায়ণ ছিলেন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি যাহা বলে, তাহাই সত্য হয়। প্রভু যদি বলিতেন, 'না হে ব্রাহ্মণ, তোমার অভিশাপ আমার লাগিবে না, কারণ আমার কোন দোষ নাই।' শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে উল্টা অভিশাপ না দিয়া শুধু এই কথা বলিলেই, কিম্বা, মনে মনে এই ভাব পোষণ করিলেও ঐ ব্রাহ্মণের ঘোর অনিষ্ট হইত। কারণ মনোরাজ্যের নিয়ম এই, কেহ যদি কারণেই হউক, বা, অকারণেই হউক, অপরের অনিষ্ট চিন্তা করে, তবে তাহার নিজেরই দ্বিগুণ অনিষ্ট হইয়া থাকে, অকারণে হইলে ত আর কথাই নাই। গৌরাঙ্গ দেখিলেন, ব্রাহ্মণের এই অযথা ক্রোধোত্থিত অভিশাপ তাহাকেই অশেষ দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ফেলিয়া দিবে, এ আগুণে ব্রাহ্মণ নিজেই পুড়িয়া মরিবে। কিন্তু প্রভুর স্বভাব ত সকলকে নির্বিচারে ভালবাসা ; অপরে যাহাতে সুখে থাকে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। ব্রাহ্মণের এই ক্রোধবহ্নিতে ব্রাহ্মণ নিজেই না পুড়িয়া মরে, এইজন্য তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপ সফল করিবার নিমিত্তই দুঃখদৈন্য বরণ করিয়া লইলেন—প্রভু কাঙ্গাল সাজিলেন। দেখুন, এ প্রেমের গভীরতা কত! নিজে দুঃখদৈন্য আলিঙ্গন করিয়া ব্রাহ্মণকে সুখ ভোগের সুযোগ দিলেন।

ধোপাকে বলিলেন, "ওহে রজক! হরিনাম লও।" ধোপা বলিলেন, "আমার কাপড় কাচিবে কে ?" প্রভু বলিলেন, "আমিই কাচিব।" এই বলিয়া ধোপার কাপড় কাচিতে লাগিলেন, এবং, তাহাকে হরিনাম লইতে অবসর দিলেন। ধোপা হরিনাম লইবেনা, তাহাতে গৌরাঙ্গের কি ? তা কি হয় ? তিনি অপরের দুঃখ সহিতে পারেন না। সে স্বীয় উদরান্নের জন্য এবং স্ত্রীপুত্র ভরণ পোষণের নিমিত্ত পরের কাপড় ধুইয়া সময় কাটাইতেছে, কিন্তু নিজের অন্তর নির্ম্মল নিস্পৃহ না করায় বিষয়ের চিন্তায় জ্বালা ভোগ করিতেছে। বিষয় কর্ম্ম করায় ক্ষতি নাই, দেহ থাকিলে দেহোপযোগী

কর্ম্মও থাকিবে। কিন্তু, তাই বলিয়া জ্বালা থাকিবে কেন? জীবের এই জ্বালা প্রভুর সহে না। তাই, তিনি ধোপাকে হরিনাম লইতে বিনীত অনুরোধ করিলেন, এবং, নিজে তাহার কাপড় কাচিয়া তাহাকে হরিনাম লইতে অবসর দিলেন। এরূপ ভালবাসা কি আর হয়!

বাসুদেব কুষ্ঠরোগী ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কৃমিকীটপূর্ণ ক্ষত। সমস্ত শরীরে দুর্গন্ধ। ঘৃণায় তাঁহাকে কেহ দর্শন করে না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আপনি আমি কি ইহা পারি? এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিয়া বলিব, লোকটী স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে, এবং এই বলিয়া দূরে সরিয়া পড়িব। যদি বা কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্র হইয়া এইরূপ রোগীর সেবাশুশ্রূষার নিমিত্ত নাকচোক বুজিয়া কষ্টেস্‌ষ্টে তাহাকে স্পর্শ করি, তাহাও ঘৃণায় ভয়ে পাঁচবার হস্তপ্রক্ষালন করি, স্নান করি। আর, এইরূপ সেবায় রোগীরও বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। সহানুভূতি জনিত সাময়িক সুখ কিঞ্চিৎ পায় বটে, কিন্তু দেহ যন্ত্রণা হইতে একবারে অব্যাহতি পায় না। কিন্তু কুষ্ঠী বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের কি হইল? না, প্রভুর প্রেমালিঙ্গন পাওয়া মাত্র তিনি নষ্ট-কুষ্ঠ হইলেন, দেহে ক্ষতের চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। বাসুদেব অতি সুন্দর দেহ ধারণ করিলেন। ইহার হেতু কি? হেতু প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে এত ভালবাসেন যে, তিনি কাহারো দুঃখ সহিতে পারেন না। ভগবান আমাদিগকে দেহ দিয়াছেন সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত, কিন্তু দেহে অতিরিক্ত আসক্তি বশতঃ এই সুখভোগে বিঘ্ন ঘটে। দেহে আসক্তি বশতঃই বিবিধ ব্যাধির উদ্ভব হয়। আবার যদি আত্মার দিকে দৃষ্টি পড়ে, এবং, আত্মার ধর্ম্ম প্রেম লাভ করা যায়, তাহা হইলে দেহ স্বাভাবিক সুস্থ অবিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা যে স্বাস্থ্য বা রোগমুক্তি কামনা করি, তাহাও আমাদের দেহে আসক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া। কিন্তু প্রেমময় প্রভু সত্য সত্যই ইচ্ছা

করিলেন, বাসুদেব প্রেমরাজ্যের সন্ধান পাউক। তাই, বাসুদেব যে কুষ্ঠী, তাহা আর বিচার করিলেন না, তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন এবং বাসুদেব দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইলেন। দেখুন প্রভুর প্রেম কি সর্ব্বতোমুখী! কি সর্ব্বজয়ী!!

সনাতনের দেহে কণ্ডু ছিল, সর্ব্বাঙ্গে ক্লেদ। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নারে'জী ডাকাত ছিলেন। আজীবন দস্যুবৃত্তি করিতেন। শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না। বারমুখী বারবনিতা ছিলেন, তিনিও বঞ্চিতা হইলেন না। তিনিও প্রভুর দর্শন পাইয়া প্রেম পাইয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকাহিনী পাঠ করিলে এরূপ শতসহস্র দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, তিনি আপামর সর্ব্বসাধারণকে নির্বিচারে ভালবাসিয়াছেন, এবং যিনিই তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, বা,তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ মানুষের ধর্ম্ম প্রেম লাভ করিয়াছেন। এখন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, একবার ভাবুন! আমরা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমঘনমূর্ত্তি, প্রেমের মানুষ, প্রেম অবতার, তাহার যথার্থতা উপলব্ধি করুন!!

যিনি যে বিষয়ের পথপ্রদর্শক, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রেমের গুরু। আজ কাল চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলিতেছেন, যে, বর্ত্তমান যুগে জগতগুরুর আবির্ভাব আবশ্যক। কেহ কেহ বলিতেছেন, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলিতেছেন, জগতগুরু শীঘ্রই আসিতেছেন। যাঁহারা প্রেম-প্রবণ, পরের দুঃখে যাঁহারা কাতর, অথচ সেই দুঃখ নিবারণ করিতে যাঁহাদের শক্তি নাই, তাঁহাদের এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক। জগতের সর্ব্বত্রই একটা অশান্তি, হাহাকার অসন্তোষের করুণ রোদন শুনা

যাইতেছে। জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ভাবেন,এই ঘোর অশান্তির দিনে, এই বিষম দুর্দ্দিনের সময় এমন একজন মহাপুরুষ বা অবতারের প্রয়োজন, যিনি জগতের গুরুর আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হন,যিনি দেশে দেশে,জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, জীবে জীবে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া, সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই অশান্তিপূর্ণ জগতখানিকে শান্তিময় নিকেতনে পরিণত করিতে পারেন। ইনি জগদ্‌গুরু হইবেন এবং সকলে ইঁহার পদানত হইবে। ইঁহার নিকট কোন দেশ বা জাতিবিশেষ কিম্বা কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় বিশেষ আপন বা পর থাকিবে না। ইনি সকলকেই আপন দেখিবেন এবং সকলেই ইঁহাকে আপনার জন বলিয়া ভাবিবে। আমরাও বলি,এই দুর্দ্দিনে এমন একটী বস্তুর প্রয়োজন, তাহা না হইলে এই অশান্তির দিনে শান্তি স্থাপনের আশা করা যায় না। আমরা বলি শ্রীগৌরাঙ্গই এই বস্তু। তিনি অচিরে প্রকাশিত হইবেন—জীবের হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হইবেন। তিনি যখন জগতের সর্ব্বত্র প্রতিগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখনই জগতে বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইবে। এই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ এই নহে যে, তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে সকলে তুলসী চন্দনে পূজা করিবেন। যিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, যিনিই তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাঁহার হৃদয়েই তিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই যে বলিলাম শ্রীগৌরাঙ্গই জগদ্‌গুরু, তাহা কেন বলিতেছি শুনুন।

ধর্ম্ম পাঁচটা নহে, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ইত্যাদি। ধর্ম্ম এক। যাহাতে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। যাহাতে মানুষকে মানুষরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাকে হিংস্রজন্তু হইতে দেয়না, যাহাতে জীবে জীবে ও জীবে ভগবানে মিলন করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ম্ম। আর, যাহাতে মানুষকে মানুষের স্বভাব হইতে বিচ্যুত করে, জীবে জীবে বিরোধ জন্মায়, জীবে ভগবানে মিলন করিতে দেয়না, তাহাই অধর্ম্ম।

এই অশেষ শক্তিশালী বস্তুটী কি? না, প্রেম। প্রেমই ধর্ম্ম। কেন না, প্রেমই সকলের মধ্যে মিলন করাইয়া দেয়। প্রেমই সকলের মধ্যে প্রীতি, সৌহৃদ্য, বন্ধুত্ব, স্থাপন করে। এখানে কোন উপাধি নাই, সংজ্ঞা নাই, ভেদবুদ্ধি নাই। ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বভাব, ইহাই মানব-ধর্ম্ম। প্রেমে জাতিগত বৈষম্য নাই, সম্প্রদায়গত ভেদ নাই, পদমর্য্যাদা-জনিত তারতম্য নাই, দেশগত পার্থক্য নাই। প্রেম নিত্য—এক। প্রেমে, খুটিনাটি নাই, ইহাতে বিধির জঞ্জাল নাই, নিয়মের কঠোরতা নাই। প্রেম নিত্যমুক্ত—ইহার অবাধগতি। প্রেম কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে। ইহা বিশ্বব্যাপী, বিশ্বপ্লাবী। ইহাতে সমগ্র বিশ্বকে আপন করিয়া লয়। সকলের শেষ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এই প্রেমের গুরু—তিনি প্রেমের মানুষ।

যদি কাহারো প্রেম লাভ করিতে সাধ হইয়া থাকে, যদি কোন কল্যাণকামী ব্যক্তির মানুষের মধ্যে আবার মানুষের ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে বাসনা হইয়া থাকে, যদি বিশ্ব জুড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া প্রাণ জুড়াইতে আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকাশ করুন—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের কথা প্রচার করুন। শ্রীগৌরাঙ্গকে সকলের হৃদয়ের রাজা করুন। তাঁহার প্রেমকণা চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিবে। তখন আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু, এই কথা ভুলিয়া যাইব। আমরা সকলে এক রাজ্যের প্রজা হইব। সমগ্র জগত জুড়িয়া এক প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর আমরা ভাই ভাই মিলিয়া মিশিয়া পরমসুখে দিনাতিপাত করিব।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ স্পর্দ্ধা সহকারে কথা বলা দাম্ভিকতা। যিনি মুসলমান বা খ্রীষ্টান, তিনি আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন? আমরা বলি তা নয়। আপনি

মুসলমানও নহেন, খ্রীষ্টানও নহেন, বা হিন্দুও নহেন। মুসলমান, খ্রীষ্টান, বা হিন্দু, এ সকল উপাধি। আপনি মানুষ। মানুষের ধর্ম্ম প্রেম, প্রেমই আপনার ধর্ম্ম। মানুষও উপাধি বটে, কেবল আত্মাই উপাধিবিহীন। তবে, যে পর্য্যন্ত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত মানুষও আছে। তাই মানুষ কথাটী রাখিলাম। আপনার ধর্ম্ম যখন প্রেম, তখন আপনি আপনার ধর্ম্মই ত গ্রহণ করিলেন, ইহা ত অপরের ধর্ম্ম নহে! আপনি মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হয় দিউন, বা খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, হউন। তাহাতে আপত্তি কি? এবং আপনার বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসারে আচরণ করিতে হয় করুন। সেই সঙ্গে গৌরাঙ্গকে গুরুরূপে স্বীকার করুন। কেন না, ইনি প্রেম-স্বরূপ, সুতরাং ইনি জগদ্গুরু। তাঁহাকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া প্রেমচর্চ্চা করুন। যাঁহার কাছে কিছু শিক্ষা করা যায়, তিনিই গুরুপদবাচ্য। হিন্দু মুসলমান গুরুর নিকট, মুসলমান হিন্দুগুরুর নিকট অধ্যয়ন করে, এবং গুরু বলিয়া যথোচিত ভক্তি করে, ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি। এখানে সম্প্রদায় লইয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে কেন? আমাদের প্রেম প্রয়োজন। প্রেম লাভ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হইব, বিশ্ববাসী সকলকে ভালবাসিয়া জীবনের সফলতা করিব। এই প্রেম লাভ করিতে হইলে ইহার যিনি মহাজন—যিনি প্রেমনিধি বা প্রেমস্বরূপ, তাঁহার অনুগত হইতে হইবে, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে।

ভক্তি করা অর্থ কি? প্রেমলাভের নিমিত্ত প্রেমের গুরু, আদর্শ প্রেমের মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তি ও পূজা করিতে হইলে, এই কথায় কেহ বুঝিবেন না যে, তাঁহার বিগ্রহ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে তুলসী বা পুষ্পচন্দন দিলেই ভক্তি করা হইবে। যিনি এইরূপ করিয়া তুলসী চন্দন দিতেছেন, তিনি দিউন, তাহাতে আপনার কি? তিনি এইরূপ

করিয়া আত্মকৃতার্থতা লাভ করিতেছেন। ইহা একটী ভক্তির নিদর্শন মাত্র। ভক্তি করা অর্থ গুণে মোহিত হওয়া। আমা অপেক্ষা যাঁহার মধ্যে সদ্‌গুণশ্রেণী অধিক দেখিতে পাই, তাঁহাকে আমরা স্বভাবতঃই ভক্তি করিয়া থাকি। তাঁহার সদ্‌গুণরাশি আলোচনা করিয়া পবিত্র হই। ইহাতে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিচার আমরা করি না। সদ্‌গুণের জাতি নাই। সেইরূপ প্রেমেরও জাতি নাই, বর্ণ নাই, সম্প্রদায় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের কার্য্যকলাপ দেখিলে স্বভাবতঃই তাঁহার প্রেমগুণে প্রাণ মুগ্ধ হয়। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তিকরা অর্থ তাঁহার লোকাতীত বিশ্বপ্রেমে মোহিত হওয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী আমাদের সকলের পাঠ ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা পরকে আপন করিতে পারি না বলিয়াই অপরের সমৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যা করি। এই ঈর্ষ্যা প্রথমতঃ ব্যক্তিগত ভাবে হয়, পরে জাতিগত ও দেশগতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবল অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সৃজন করে। আমরা পাঁচ সহোদর এক অন্নে থাকিলে যেমন একের উন্নতিতে অন্যে প্রীত হই, সেইরূপ এই বিশ্বসংসারের যে কোন স্থানে এক ভাই উন্নতি লাভ করিলে আর এক দেশের আর একটী ভাইএর সন্তুষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য। আমার এক ভাই কর্ম্মী, কর্ম্ম করিয়া সে পার্থিব উন্নতি সাধন করিয়াছে, আমার কর্ম্মে স্পৃহা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নাই বলিয়া আমি তাহার মত সমৃদ্ধিশালী হইতেছি না, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিতে ত পারি। সে আর আমি যখন পৃথক্ নহি, তখন তাহার উন্নতি আমারই উন্নতি, সুতরাং প্রাণ খুলিয়া আমি তাহারই মত সুখভোগ করিতে পারি। একথা আমি বলিতে পারি, 'আমার ভাই বড় সুখে আছে। তাহার সুখ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইতেছে।' উপেক্ষার সহিত নহে, প্রকৃতই প্রাণে সুখ উপলব্ধি করিতে হইবে। এই ভালবাসায় আমারও উপকার হইবে, ভাইএরও মঙ্গল হইবে।

কারণ, কর্ম্ম করিয়া ভাইএর হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভালবাসা পাইলে উহা সরস হইবে। তখন ভাইও এই ভালবাসা পাইয়া এরূপ বিকাইয়া যাইবে, যে, তাহার অর্জিত অর্থ সে একা উপভোগ করিয়া সুখ পাইবে না, ভাইকে উহা না দিয়া কিছুতেই শান্তি বোধ করিবে না। এই অর্জ্জিত অর্থ সে উপেক্ষার সহিত দিবে না, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সজল নয়নে পরম প্রীতির সহিত সে উহা দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবে। আর, আমি যদি ঈর্ষ্যা পোষণ করি, তবে সেই ভাইও ঈর্ষ্যান্বিত হইবে এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তির উদ্রেক হইবে। অর্থ উপার্জ্জন সুখের নিমিত্ত, কিন্তু, সেই অর্থ দুঃখের নিদান হইবে। আমি অক্ষমতা বশতঃ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখভোগ করিতে পারিলাম না, অপরের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে সুখভোগ করিতে দিলাম না, উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। আর ভালবাসাদ্বারা উভয়েই পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারি। ইংরেজগণ বা জাপানীগণ কর্ম্মবীর, সৃষ্টিবৈচিত্র্যে জলবায়ু প্রভৃতি উপাদানের প্রভাবে তাহাদের প্রকৃতিই এইরূপ ; আর, আমরা ভারতবাসী কর্ম্মে যদি অপটু হইয়া থাকি, তাই বলিয়া তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিব কেন? তাহারা ও আমরা যে একই বিশ্বপরিবারের লোক। তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সত্য সত্যই আমরা প্রাণে সুখ উপলব্ধি করিব। তাহাদিগকে ভালবাসিব, এবং কর্ম্মে তাহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ভালবাসা দিয়া উহা সরস করিব। তাহাতে তাহারাও ধন্য হইবে, আমরাও ধন্য হইব। আমরা যদি এখানে কর্ম্মে অক্ষমতা বশতঃ শুষ্কজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া ঐহিক অর্থের অসারতা প্রতিপাদন করি, এবং, উপেক্ষার সহিত বলি, উহারা অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখ লইয়া ব্যস্ত, আমরা উহা চাই না, তাহা হইলে ইহাতে কিছু ফল হইবে না। তাহারাও উপকৃত হইবে না, আমরাও উপকৃত হইব না। ইহা কেবল আত্মবঞ্চনা। তাহাদের মত ঐহিক

শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারি না বলিয়া উহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? আমরাও যখন ইহ জগতে আছি, সুখদুঃখ লইয়া বসতি করিতেছি, যৎকিঞ্চিৎ হইলেও অর্থের প্রয়োজন বোধ করিতেছি, তখন ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করা শোভা পায় না। তবে কি করিতে হইবে? না, তাহাদের সুখে সুখ উপলব্ধি করিতে হইবে। সকলকে ভালবাসিতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে আজকাল যে সকল দেশ কর্ম্মে উন্নত, সর্ব্বত্রই একটা অশান্তির বহ্নি জ্বলিতেছে। কর্ম্মের প্রতিযোগিতায়, কে কাহাকে পরাস্ত করিবে, এই চেষ্টায় সকলেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। যে দেশ কর্ম্মে পটু নহে, সে দেশও কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই বিরাট বিশ্বপরিবারে বিভিন্ন দেশের এক এক দেশের উপর এক একটী কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুরূপই কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা বিশ্বনিয়ন্তার বিধান। বর্ত্তমানে কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় অনেকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা ভগবদ্দত্ত অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ প্রেমশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা। আদর্শ প্রেমের মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দের প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইব। আবার জগত হাসিবে, আবার শান্তির সুধাধারা প্রবাহিত হইবে।

যেরূপ সঙ্গ করা যায়, সেইরূপ গুণ ও ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ নির্ব্বিচারে সকলকে ভালবাসিয়াছেন, কাহাকেও তুচ্ছ করেন নাই, জাতিবর্ণ ভেদ করেন নাই, পতিত দেখিয়া উপেক্ষা করেন নাই, বড় ছোট পার্থক্য করেন নাই, দুঃস্থ, দুর্গত, মলিন জীব দেখিয়া ঘৃণা করেন নাই, সকলকেই তুল্যভাবে তাঁহার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, সকলকে আলিঙ্গন দিয়াছেন। এই বিশাল বিশ্বপ্রেম আলোচনা করিলে আপনার ও আমার হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হইবে। আমরাও স্ব স্ব

পরিমাণ অনুরূপ পূর্ণ হইয়া যাইব। সমুদ্রে গেলে এক পোয়ার ঘটী এক পোয়ার মতই পূর্ণ হইবে, যে পাত্রে একমণ ধরে, তাহা সেইরূপই পূর্ণ হইবে। আমরাও সেইরূপ প্রেমনিধির সঙ্গ প্রভাবে স্ব স্ব পরিমাণ অনুরূপ পূর্ণ হইব। অপূর্ণতা বা অভাব বোধ হইতেই কলহ বিবাদের সৃষ্টি হয়। মানুষ যে পর্য্যন্ত প্রেম না পায়, সে পর্যান্ত অন্যান্য বস্তুর বহুল প্রাপ্তি সত্ত্বেও সে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ করিয়া আমরা যখন পূর্ণ হইয়া যাইব, তখন আর জগতে দুঃখ দৈন্য, কলহ বিবাদ, থাকিবে না—সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কোন সম্প্রদায় সৃজন বা জাতি গঠন করিতে আসেন নাই। মানুষমাত্রেই এক জাতি। এই জাতীয়তা যাহাতে রক্ষিত হয়, মানুষ যাহাতে মানুষপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এইজন্য আদর্শ প্রেমের মানুষ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের সকলেরই নমস্য, সকলেরই পূজা ও ভক্তির পাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া বলিলেন না, "তুমি যে সম্প্রদায়ে আছ, তাহা ছাড়িয়া আর এক সম্প্রদায়ে প্রবেশ কর।" তিনি বলিলেন না, "তুমি গৃহ ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী হও বা কঠোর বৈরাগ্য সাধন কর।" তবে তিনি কি বলিলেন? না—"তুমি যাহা আছ, তাহাই থাক। তুমি গৃহী, গৃহে থাক; তুমি কর্ম্মী, কর্ম্ম কর; তুমি কর্ম্ম করিতে ভালবাসনা, করিওনা। তোমার স্বভাবে যাহা চায়, তাহাই করিও। তবে সেই সঙ্গে প্রেম চর্চ্চা কর। পরস্পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর। সকলকে নির্বিচারে ভালবাস। প্রেম অমূল্য নিধি। ইহা যদি পাও, তবে আর তোমাদের অভাব থাকিবে না। আর তাহা না হইলে, যাহা কিছু করনা কেন, কিছুতেই তোমাদের অভাব ঘুচিবেনা। এই প্রেম তোমাদের নিত্য-সিদ্ধ। ইহা কোথাও হইতে অর্জন করিয়া আনিতে হইবে না। একবার হরিবল। তোমাদের প্রেম উদ্বুদ্ধ হইবে,

আর বিশ্বসংসার সুখময় দেখিবে। তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। শুধু হরিবল।” প্রভু যে কেবলমাত্র বলিলেন, তাহা নহে। আচরণ করিয়াও দেখাইলেন। তিনি কাহারও কর্ণে মন্ত্র দিলেন না, কিম্বা প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা কাহাকেও ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত করিলেন না, কিম্বা, মালা তিলক বা অন্য কোন চিহ্ন বিশেষ ধারণ করিয়া কাহাকেও সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিশিষ্টতার কথা বলিলেন না।

আপনি মুসলমান, আপনি বলিবেন, ‘আমি হরি বলিব কেন? আমি ‘আল্লা’ বলিব। আমরা বলি, এরূপ তর্ক করার প্রয়োজন কি। ভগবানের অনন্ত নাম। অনন্ত নামে অনন্ত ভাব জড়িত রহিয়াছে। আপনি যে কোন নাম গ্রহণ করিতে পারেন। তবে মানুষের চরম লক্ষ্য প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ সকলের শেষ অবতার এবং তিনি প্রেমের গুরু। তিনি বলিয়াছেন, ‘হরি নামের বহু অর্থ, দুইটী মুখ্যতম। তাহা কি কি? একটী অর্থ এই, ইহাতে সর্ব্ব অমঙ্গল হরণ করে। অপর অর্থ এই, ইহাতে প্রেম দিয়া মন হরণ করে।” আমরা যখন সকলে প্রেম চাই, তখন প্রেমের গুরু যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমাদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কোন বস্তু পাইতে হইলে, সেই বস্তু যিনি দান করেন, তাঁহারই দ্বারস্থ হইতে হয়; এবং তিনি যে উপায় নির্দ্দেশ করেন, তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বা অন্য উপায় অবলম্বন করিলে তাহাতে ফল হইবে কেন? আপনি যে সম্প্রদায়-ভুক্ত আছেন, তাহাই থাকুন, যাহা করিতেছেন, তাহাই করুন। সেই সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গকে গুরু করুন, এবং তাঁহার উপদিষ্ট নাম জপ করুন। গুরু অনেক হইতে পারে। যে বিষয় যাঁহার কাছে পাওয়া যায়, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের গুরু। সুতরাং তাঁহাকে গুরু স্বীকার করুন। তিনি ‘হরে’ ‘কৃষ্ণ’ ‘রাম’ এই তিনটি নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। হরি

নামের সম্বোধনে 'হরে'। ইহার অর্থ উপরে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ নামের অর্থ এই, যিনি প্রেমদ্বারা হৃদয় কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন ও আনন্দ দান করেন, তিনিই কৃষ্ণ। যিনি প্রেমে জীবের চিত্ত রমণ করেন, তিনি রাম। এই তিনটী নামই প্রেমার্থবাচক। প্রেম যখন আমাদের প্রয়োজন, তখন সেই প্রেমের গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই নাম তিনটী জপ করিলেই আমাদের অভীষ্ট লাভ হইবে। আপনাকে জোর করিয়া কেহ কোন মূর্ত্তিবিশেষের ধ্যান করিতে বলিতেছে না। চরম লক্ষ্য প্রেম যখন পাওয়া যাইবে, তখন পূর্ণের প্রাপ্তিতে আর অভাব থাকিবেনা। প্রেম পূর্ণ। সুতরাং এখানে অভাব নাই। প্রেম পাইলে তাহার আনুষঙ্গিক যাহার যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা আপনা হইতেই পাওয়া যাইবে। সুতরাং, হে আমার বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন আমরা এই প্রেমের অনুসন্ধান করি, এই প্রেম লাভের জন্য: যত্নপরায়ণ হই। স্ব স্ব সংকীর্ণতা ভুলিয়া যাইয়া যাহাতে বিশ্বজোড়া প্রেম লাভ করিতে পারি, সকলকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করি। আসুন, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট নাম তিনটী জপ করি। আসুন আমরা জপ করি—

হরে [illegible] হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

ইহাতেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। হে আমার জগদ্‌বাসী ভাই সব! আসুন আমরা এই প্রেমের মহাজন শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়া বিশ্বপ্রেম অর্জ্জন করি। তখন আমরা পরস্পর ভাই ভাই বলিয়া উপলব্ধি করিব, আর পরস্পর পরস্পরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে প্রীত হইব ও সুখ পাইব, হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যাইব। কেহ আর পর থাকিবেনা সুতরাং পরশ্রী কাতরতা আসিয়া কলহবিবাদের সৃজন করিবেনা। সর্ব্বত্র

এক সুখের তরঙ্গ খেলিবে, আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইবে। তখন কি এক সোণার সংসার প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃত মানুষের ধর্ম্ম পাইয়া মানুষ-জন্ম সার্থক করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বস্তুটী কি দেখুন। ঘনশ্যামের কথায় বলিতেছি। ঘনশ্যামের অপর নাম নরহরি চক্রবর্ত্তী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ স্বনাম-প্রসিদ্ধ। এখানি বৈষ্ণব জগতে অতি প্রামাণ্য একখানি ইতিহাস। ইহার বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল, মধুর, হৃদয়গ্রাহী। কোন কোন স্থানে ইহা এত মধুর, যে, অমিয় নিঝরে। ইহাতে অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জিত কিছু নাই, এবং ইহা একদেশদর্শিতাদুষ্ট নহে। যাহা তিনি সত্য জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তাহাই নিঃসঙ্কোচে, সরল ভাবে, প্রাণ খুলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের দর্শন পান। তাঁহার পদেই তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বহু মহাপুরুষই আবির্ভূত হন, তাঁহারা অনেকেই মহাপ্রভুর ও তাঁহার সমসাময়িক পার্ষদ গণের দর্শন পাইয়াছিলেন। দর্শন না পাইলে কেহ দৃঢ়তার সহিত সত্য বস্তু প্রচার করিতে পারেন না। ইহাদের মধ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল মহাপুরুষ মহাপ্রভুর অপ্রকটেও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন, ঘনশ্যাম তাঁহাদের মধ্যে একজন।

প্রসঙ্গ-ক্রমে দর্শন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলি। দর্শন দুই প্রকারে হয়—জ্ঞানচক্ষে দর্শন ও ভক্তিতে দর্শন। জ্ঞানের দর্শন জটীল ও অপরের দুর্ব্বোধ। ইহা যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। শ্রীভগবান

অতীন্দ্রিয় বস্তু, তিনি স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং, জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে, কঠোর সংযমের প্রয়োজন। পুরাকালে ঋষিগণ এইরূপ সংযত হইয়া ভগবৎতত্ত্ব যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী লোকের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, যথা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য ইত্যাদি ষড়-দর্শন। তার পর আবার বৌদ্ধ-দর্শনও হইয়াছে। জ্ঞানের বিচার যতই সূক্ষ্ম হউক, তাহাতে কিঞ্চিৎ আমিত্ব থাকে, সুতরাং সে দর্শন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বরূপনির্ণয়ে পরিপূর্ণ নহে। আর একপ্রকারে দর্শন হয় ভক্তিতে। ইহা আবার দুই প্রকার। রাগানুগা ভক্তি ও বিধি ভক্তি। রাগানুগা ভক্তিতে প্রথম দর্শন হয়, পরে রাগ ও ভক্তি সঞ্জাত হয়। বিধিভক্তিতে প্রথমতঃ মহাজনের বাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিধি আচরণ করা হয়, পরে দর্শন হয়, এবং অবশেষে রাগ সঞ্জাত হয় এবং ভক্তি দৃঢ় হয়। সব ভক্তিই শেষে পরিপক্ক হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। ভক্তি অর্থ গুণে মোহিত হওয়া। বস্তুর দর্শন না পাইলে রাগ সঞ্জাত হইবে কিরূপে? এই দর্শনই বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, নির্ম্মল ও নির্ভুল। কারণ, ভগবান স্বপ্রকাশ। তিনি আপনা হইতে দর্শন না দিলে সীমাবদ্ধ দৃষ্টি বা সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাঁহাকে দর্শন করিতে প্রয়াস করা বা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। ইহাতে তাঁহার যে কিছু অনুভূতি বা উপলব্ধি হয়, তাহাতে জীব সাময়িক বুঝ পাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাণ জুড়ায়না। জ্ঞানিগণ শক্তিধর, তাঁহারা আত্মচেষ্টায় সংযমী হন এবং সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করেন; আর, ভক্তগণ ভগবদ্দর্শন পাইয়া স্বভাবতঃই সংযমী হন, এবং সকল তত্ত্ব তাঁহাদের কাছে আপনা হইতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, এবং ভগবৎকৃপায় তাঁহারা আরো শক্তিধর হন। ভগবদ্দর্শন পাইলে ও তাঁহার রস আস্বাদন করিলে

অন্য রসে স্বভাবতঃই স্পৃহা থাকেনা; সুতরাং, তাঁহাদের সংযম স্বাভাবিক, —কষ্টলব্ধ নহে; এবং সকল তত্ত্বের মূল শ্রীভগবানের দর্শন পাইলে আর কোন তত্ত্বই তাঁহাদের অবিদিত থাকেনা। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া জীবকে এই শেষোক্ত প্রকারের দর্শনসৌভাগ্য দান করিলেন। শ্রীভগবান্ জানেন, কলির জীব দুর্ব্বল, অসংযমী, আত্মশক্তি প্রয়োগে অসমর্থ, অল্পায়ুঃ, বহির্ম্মুখ। তাই তিনি প্রথমতঃ দর্শন দিলেন, এবং দর্শন দিয়া জীবের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে স্বভাবতঃই সংযমী, সমর্থ, সবল, অন্তর্ম্মুখ করিয়া লইলেন। এইজন্য কলিকালে ভক্তির পন্থাই সহজ, সুগম, মধুর ও একমাত্র পন্থা। প্রকট লীলায় বাল্যকাল হইতেই তিনি বহু ভক্তের নিকট স্বরূপ * প্রকাশ করিলেন। পরে, তিনি অশেষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানবিচারে যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাহা দেখাইলেন। তিনি যে স্বপ্রকাশ, এবং তিনি দর্শন দিলেই যে তাঁহাকে দর্শন করার অধিকার হয়, তাহাও দেখাইলেন। তারপর মহাপ্রকাশে তিনি দেখাইলেন, তিনি কি স্বরূপ। কেবল মাত্র যে শ্রীবাসের বাড়ীতে সাতপ্রহরিয়া ভাবে তিনি আপনাকে প্রকাশ করিলেন, তাহা নহে, বহু স্থানে—নবদ্বীপে, নীলাচলে, দাক্ষিণাত্যে, কাশীধামে, বৃন্দাবনে, বহু সময় বহু ভক্তের নিকট তিনি আপনাকে প্রকাশ করিলেন। দীনহীন ভিখারী, অখণ্ডপ্রতাপ রাজা, শাস্ত্রজ্ঞানহীন নিরক্ষর মূর্খ, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, অসংযত নরনারী, সংযতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী; আচারহীন চণ্ডাল, শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ, দুর্নীতিপরায়ণ দস্যু, সাধুচরিত মহাজন, ভোগবিলাসরত জীব, বিষয়ে বীতস্পৃহ ভক্ত, বহু স্তরের অসংখ্যলোক অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতে ভাবে সেই স্বয়ং

---

* পাঠক পাঠিকাগণ কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা সম্যক্ জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন।

বস্তুটীর দর্শন পাইলেন, এবং সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি হইল, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপতঃ বস্তুটী কি, সকলেই বুঝিলেন, ইনিই সেই। এই ত গেল প্রকট লীলাকালে। তিনি অপ্রকট হইলেন পরও বহুলোকে তাঁহার দর্শন পাইলেন। একদিন দুইদিন নহে, বহু বৎসর পর্য্যন্ত! অদ্যাপি বহুলোকে তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহাদের আর তর্ক বিচারে স্পৃহা নাই। কারণ, এ দর্শন যে তর্ক বিচারের অতীত, জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য, বাক্যমনের অগোচর; ইহাতে সারা প্রাণখানি অধিকার করিয়া লয়। শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিত্য, সত্য, স্বয়ং ভগবান্, এই দর্শনই তাহার সাক্ষী পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী কালে এই দর্শনের আবির্ভাব। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম, সরস্বতী প্রবোধানন্দ, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত, রাজা প্রতাপরুদ্র, কবিরাজ গোস্বামী, রূপ সনাতন প্রভৃতি ছয় গোস্বামী, ঠাকুর বৃন্দাবন, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, প্রভৃতি বহু মহাজনগণ কর্ত্তৃক এই দর্শনের প্রচার। বর্ত্তমানযুগে এই দর্শন শাস্ত্রই আলোচ্য, অবলম্বনীয় ও অনুসরণীয়। ইহাই সর্ব্বশেষ দর্শন। এই মহাজনগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। ঘনশ্যাম তাঁহাদের মধ্যে একজন।

ঘনশ্যামের আর এক নাম নরহরি। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তথাপি বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজকে নরহরি দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন। কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর সমসাময়িক বৈদ্যবংশসম্ভূত শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, তিনিই গৌরলীলা প্রকাশেব নিমিত্ত পুনরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা আরো বলেন, মহাপ্রভুর পার্ষদগণও যে নিত্য, ইহা প্রতিপন্ন করাও তাঁহার আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ নিত্যসিদ্ধ। নরহরি সরকার ঠাকুর যে আবার আসিবেন, ইহা অসম্ভব কি?

বৈষ্ণবের জন্ম নহে করম বন্ধন।
বিষ্ণুর ইচ্ছায় ভবে গমনাগমন॥
বিষ্ণু অনুচর তাঁরা বিষ্ণুর সেবক।
তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম সকলি পাবক॥

তিনি যে গৌরকথা কহিয়া, গৌরলীলা প্রকাশ করিয়া এই ভাবে তাঁহাব প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সেবা করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? বরং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ঘনশ্যাম সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত ছন্দঃ সমুদ্র তাহার প্রমাণ। যাহা হউক, ঘনশ্যাম শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন শুনুন—

কো কহে, অপরূপ প্রেম-সুধানিধি
কোই কহত, রস সেহ।
কোই কহত, ইহ সোই কল্পতরু,
মঝু মনে হোত সন্দেহ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত—যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে,
ঐছে রতন হরিনাম॥ ধ্রু॥
যো এক সিন্ধু, বিন্দু নাহি যাচত,
পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি বহুত কল্পতরু,
কো অছু করুণা অপার॥

যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পূর।
উমড়ই নয়ন অধম মরুভূম হি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর ॥
নামহি যাঁক তাপ সব মেটয়ে
তাহে কি চাঁদ উপাম।
ভণ ঘনশ্যাম, দাস নাহি হোয়ত
কোটি কোটি একু ঠাম ॥

ঘনশ্যাম বলিতেছেন—

কেহ কহেন, শ্রীগৌরাঙ্গ অশেষ রূপনিধি; কেহ কহেন, তিনি প্রেম-সুধানিধি; কেহ কহেন, তিনি রসস্বরূপ, অর্থাৎ, শ্রুতিতে যে "রসো বৈ সঃ বলা হইয়াছে,ইনিই তিনি; কেহ কহেন,ইনিই সেই কল্পতরু ইহধামে প্রকট হইয়াছেন। এই সব শুনিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে, অর্থাৎ, কোন বর্ণনাই যে আমার মনঃপুত হইতেছেনা। কেন? বলিতেছি—

(হাম) পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম

আমি গৌরচন্দ্রকে যে দর্শন করিলাম, তাহার ত উপমাই হয়না; এমন কোন বস্তুই ত আমি পাইনা, যাহার সঙ্গে উপমা দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে ভাষা দ্বারা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি। আমি তাঁহাকে কি অবস্থায় দর্শন করিলাম, বলিতেছি। আমি দেখি, জীবগণকে এমন একটী বস্তু যাচিয়া যাচিয়া দান করিতেছেন, ত্রিভুবনে সে বস্তুর তুলনা হয় না। সেটী কি? না, হরিনাম, ইহা অমূল্য রত্ন।

যাচত—যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে,
ঐছে রতন হরিনাম।

তিনি যে অপার্থিব রত্ন দান করিতেছেন, তাহারই মূল্য হয়না—তাহারই তুলনা হয়না ; আর, যিনি দান করিতেছেন, তাহার তুলনা আমি কি দিয়া দিব! এই যে তিনি অমূল্য রত্ন দান করিতেছেন, ইহাও আবার যাচিয়া যাচিয়া। জীব চাহিতে জানে না ; কেহ হয়ত কাঞ্চনের বদলে কাঁচ চাহিয়া বসিতে পারে, রত্নের বদলে প্রস্তর খণ্ড চাহিতে পারে, কেহ বা কিছুই না চাহিতে পারে, কারণ, কিসে তাহার সুখ হবে কি না হবে, তাহার কি অভাব, সে বোধই তাহার নাই ; তাই তিনি যাচিয়া দিতেছেন, যেন কেহই বঞ্চিত না হয়। কেহ হয়ত এই দানে উপেক্ষা করিতেছে, তাহাকেও তিনি যাচিয়া যাচিয়া দিতেছেন। হরিনাম-বিহনে জীবের যে দুঃখ, তদপেক্ষা তাঁহার দুঃখ অধিকতর, জীব আপনার দুঃখে যত কাতর,তিনি জীবের জন্য ততোধিক কাতর,তাই তিনি হরিনাম যাচিতেছেন। এ দানের উপমা নাই, এ প্রেমের তুলনা নাই। তাঁহাকে যে"প্রেমসুধানিধি" বলা হয়, সেও ঠিক হয় না ; কারণ—

যো এক সিন্ধু, বিন্দু নাহি যাচত ;

এই যে প্রকাণ্ড বিস্তৃত সমুদ্র অপার জলরাশি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ত একবিন্দুও কাহাকেও যাচিয়া দেয় না। সুতরাং, সেই অনন্ত জলরাশি জীবের কোন উপকারেই আসেনা। তবে মেঘে জল সঞ্চারিত হইলে সেই মেঘ চারিদিকে উহা বিস্তৃত করিয়া দেয়। কিন্তু, এই মেঘসঞ্চারও সমুদ্র যাচিয়া করে না। অপরে, অর্থাৎ, সূর্য্য জোর করিয়া সমুদ্র হইতে জল আকর্ষণ করিয়া লয়—

পরবশ জলদসঞ্চার।

তাই জীব এই জল পায়। আবার এই জলদ যে জল দান করে, তাহাও সব সময় সকলে পায় না। কিন্তু, গৌরাঙ্গ সুন্দর নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র সকল সময়ই যাচিয়া যাচিয়া জীবের দুয়ারে দুয়ারে এই অপূর্ব্ব রত্ন 'হরিনাম'

দিতেছেন,—এই জন্যই উচ্চ সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই দেখিতেছি, মায়ের কোলে অপোগণ্ড শিশু, বিদ্যাভিমানী বহির্মুখ দাম্ভিক পণ্ডিত, গৃহকোণে আবদ্ধ কুলবধূ, বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীব, বনের হিংস্র পশু, সকলেই এই অপার্থিব রত্ন 'হরিনাম' পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সকলের কর্ণেই এই অপার্থিব সুধা বিতরিত হইতেছে। সুতরাং, সিন্ধুর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে তুলনা করিতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কল্পতরু। সে কথাও ঠিক হয় না। কল্পতরু কি করে? না, যে যাহা চায়, সে তাহাকে তাহাই দান করে। শ্রীগৌরাঙ্গ ত চাহিবার অপেক্ষা করেন না, না চাহিতেই ত অপার্থিব বস্তু দান করেন। যদি বলেন, কল্পতরুও না চাহিতেই দান করে; তাহা হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করা যায় না। কেন না, তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তি-বলে মানসে বহু কল্পতরু সৃজন করিয়াছেন, যেন, আপামর সর্ব্বসাধারণে এই অশেষ কল্পতরু হইতে প্রেমফল পাইয়া ধন্য হইতে পারে। ঘনশ্যাম বলিতেছেন—

মানস অবধি বহুত কল্পতরু
কো অছু করুণা অপার॥

জীবের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া মনন করা মাত্র বহু কল্পতরু সৃজন করিলেন। কে এই করুণার পার পাইবে! তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রভু নীলাচলে যাইতে পথে রজককে কৃপা করিলেন। রজক হরিনাম লইবে না, আপত্তি উঠাইল, কে তাহার কাপড় কাচিবে? প্রভু নিজে তাহার কাপড় কাচিতে লাগিলেন। রজক হরিনাম লইয়া নাচিল। তাহার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রজক সেই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সেই অঞ্চলে হরিনাম বিলাইতে লাগিলেন। এই একটী কল্পতরুর সৃজন হইল। এইরূপে স্থানে স্থানে

বহু কল্পতরু সৃজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক একটী ভক্ত এক একটী কল্পতরু হইলেন। ঘনশ্যাম দেখিতেছেন, এইরূপে প্রভু গৌড়ে, দক্ষিণ দেশে, বৃন্দাবনে, পশ্চিম ভারতবর্ষে, বিভিন্ন পাহাড় অঞ্চলে, সর্ব্বত্রই স্থানে স্থানে"বহুত কল্পতরু" সৃজন করিয়া রাখিয়া দিলেন ; আর তত্রত্য জীবনিচয় সেই সেই কল্পতরু হইতে অযাচিত ভাবে অপার্থিব ধন পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। তাই, তিনি বলিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করাও ত ঠিক হয় না।

এই সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনাটী পাঠক পাঠিকাগণকে ভেট দিতেছি * —

প্রভু কহে –আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা পানি॥

* * *

মূলস্কন্ধের শাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল, অমৃতকে জিনে॥
পাকিল সে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥

---

* আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদ।

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি, জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায়, মালাকার হাসে॥

তার পর প্রভু বলিতেছেন—

একা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব, আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥

প্রভু বলিতেছেন, "তোমরা এই ফল বিলাইতে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করিওনা। ইহা অফুরন্ত; যতই দেওনা কেন, ফুরাইবেনা।" যথা—

আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব, সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজরে অমরে॥

মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা পাইয়া সকলে প্রেমফল বিলাইতে লাগিলেন। যথা—

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।

এই ফল পাইয়া সকলের কি হইল? না—

ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক, হাসে, নাচে, গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার।

ইহা দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বড় আনন্দিত হইলেন। যথা—

দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার॥

ঘনশ্যাম তাঁহার পদে আরো কি বলিতেছেন, শুনুন—

যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পূর।

অর্থাৎ, শ্রীগৌরাঙ্গের চরিতামৃত শ্রবণপথে সঞ্চারিত হইলে হৃদয় সরোবর পরিপূর্ণ হইয়া যায়। শুধু পূর্ণ হয়, তাহা নহে, উদ্বেলিত হয়; হৃদয় সরোবর যে উথলিয়া পড়ে, তাহা নয়নের ধারায় প্রকাশিত হয়। এই নয়নধারায় কি হয়? না, শুষ্ক যে মরুভূমি, তাহাতেও অঙ্কুরের উদ্গম হয়, অর্থাৎ, দেহে পুলক (রোমাঞ্চ) হয়। যথা, পদ—

উমড়ই নয়ন অধম মরুভূম হি
হোয়ত পুলক অঙ্কুর।

ঘনশ্যাম কি ভাগ্যবান্! তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে হরিনাম বিলাইতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইতেছে, নয়ন তৃপ্ত হইতেছে, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের চরিতগাথা শুনিয়া আবার শ্রবণেন্দ্রিয়ও চরিতার্থ হইল, এবং, তাহাতে তাঁহার অশ্রুপুলকাদি যে ভাব হইল, তাহাই তিনি পদে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে তিনি যখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দেখিলেন বলিয়া পদে প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহাকে চাঁদের সহিত কতক তুলনা করিয়াছেন বটে, যথা—পেখলুঁ গৌরচন্দ্র। কিন্তু বাস্তবিক তিনি দেখিতেছেন, গৌরাঙ্গের

সহিত চাঁদের তুলনাই হয় না। চাঁদ রবিকিরণজনিত তাপ নিবারণ করে। এক প্রকারের তাপ নিবারণ করিলেও অন্যান্য নানাবিধ তাপ থাকিয়া যায়, এবং, এমন কি, চাঁদ নিজেও আবার এক রকম তাপের সৃজন করে, যেমন, বিরহব্যথিত ব্যক্তি চাঁদের দর্শনে আরো ব্যথিত হয়, আরো জ্বালা অনুভব করে। আর গৌরনামে কি করে? না—

নাম হি যাঁক তাপ সব মেটয়ে

সুতরাং—

তাহে কি চাঁদ উপাম?

একটী চাঁদ ত দূরের কথা; কোটী কোটী চাঁদ একত্র হইলেও ত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হওয়ার যোগ্য হয় না।

ঘনশ্যামের উপরি উক্ত পদটী কামোদ রাগিণীতে গাহিলে ভক্তগণ বড় আনন্দ পাইবেন।

এইরূপ বহু মহাজন শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পরও তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। ইহাতে আমাদের সকলেরই ভরসা হয়, আমরাও যদি ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি মহাজনগণের অনুগত হই, তবে আমরাও তাঁহার দর্শন পাইব। এই দর্শনই সমস্ত দর্শনের সার; ইহাতে নিজেও তৃপ্ত হওয়া যায়, অপরকেও তৃপ্ত করা যায়। অতএব, হে আমার কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ! আসুন, আমরা এই দর্শনেরই অনুশীলন ও পর্য্যালোচনা করিয়া জীবন ধন্য করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রেমের গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এখন আর একটী বস্তুর কথা বলিব। ইনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীগৌরাঙ্গের পত্নী। ইঁহার কাহিনী না কহিলে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, এবং, বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ প্রেম লাভ হয় না।

শাস্ত্রকারগণ বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ভূস্বরূপিণী। ইহার অর্থ এই—পৃথিবীর সারভূতা মূর্ত্তিই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় লইয়াই পৃথিবী। পৃথিবী বলিতে জীবসমষ্টি বুঝাইতেছে। আনন্দ চিন্ময়, নিরানন্দ মায়া। যাঁহারা আনন্দে বিরাজ করেন, অর্থাৎ, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর যাঁহারা নিরানন্দে আছেন, অর্থাৎ, মায়ার মধ্যে থাকিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন, তাঁহাদেরও আশ্রয় স্থল দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আমরা শ্রীরাধাতত্ত্বে দেখিতে পাই, তিনি শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ, ও আনন্দ, এই তিন শক্তির সদংশকে সন্ধিনী, চিদংশকে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি বলা হয়, এবং আনন্দাংশকে হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। শ্রীরাধা এই হ্লাদিনী শক্তি; সুতরাং, তাঁহার অনুগত হইয়া ভগবদ্‌ভজন করিতে হইলে জীবের আনন্দ শক্তি জাগ্রত করিতে হইবে, অর্থাৎ, নিরানন্দ যে মায়া, তাহার অতীত হইয়া শ্রীরাধার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জীবই সচ্চিদানন্দের অংশ, কিন্তু মায়াবৃত। দেহ, ও দেহ লইয়া যে সংসার, তাহা মায়া-প্রসূত। দৈহিক ভোগ-বিলাস ও ধনজন ইত্যাদি মায়িক বস্তুর অতীত হইয়া শ্রীরাধার অনুগত হইতে হইবে; কিন্তু, মায়া অতিক্রম করা বড় কঠিন। এই পন্থার সাধনের ক্রম বড় দুরূহ।

ভাবিতে ভাবিতে যখন ভাবময় দেহ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তখন রাধাকৃষ্ণ ভজনে অধিকার হইবে। লীলায় দেখিতে পাই, শ্রীরাধা সংসার পরিজন সব ফেলিয়া, সব ভুলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলেন। গোপীগণ যে শ্রীরাধার অনুগত হইলেন, তাঁহারাও এইরূপ করিলেন। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য নহে। এই জন্যই গৌর-অবতারের প্রয়োজন হইল। ভূস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া এই গৌরলীলায় প্রধান সহায় হইলেন। আনন্দময় শ্রীভগবান্ নিষ্ক্রিয়। পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি মায়ামানুষরূপে জগতে আসিলেন, এবং, জগতের সারভূতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া তিনি ক্রিয়াবান্ হইলেন। আমরা লীলায় দেখিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন পর তিনি পতিত-উদ্ধারণরূপে প্রকাশিত হইলেন, জগাই মাধাই প্রভৃতি পতিত জনকে উদ্ধার করিলেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া প্রভু দুই ভাইকে স্বীয় বাড়ীতে আনাইলেন, এবং, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এই দুই ভাইয়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া যত আনন্দ পাইলেন, আর কেহ তত আনন্দ পাইলেন না। কেনই বা হইবে না! ইঁহারা যে বিষ্ণুপ্রিয়ারই জীব। উদ্ধার করিয়া দুইজনকে বাড়ী আনয়ন করার উদ্দেশ্যও এই যে, যাঁহার জীব তাঁহার নিকট অর্পণ করা। কাজী উদ্ধারেও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমাধিক্য দেখিতে পাই। যখন শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, কাজী খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এবং কীর্ত্তনে বাধা দিতেছে, তখন প্রভু রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে, কাজীকে ইহার সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। কিন্তু, প্রভু যখন অন্তঃপুরে গেলেন, তখন আর তাঁহার রুদ্রভাব রহিল না। তিনি আর এক মানুষ হইয়া গেলেন, তিনি যে প্রেমের মানুষ—সেই প্রেমের মানুষ হইলেন। তাই আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই যে, প্রাতঃকালে যদিও তিনি ভক্তগণের নিকট রুদ্রভাব প্রকাশ করিয়া কাজীকে সমুচিত দণ্ড

দিবেন বলিয়াছিলেন, বিকাল বেলা ভক্তগণ তাঁহার আঙ্গিনায় সম্মিলিত হইলে তিনি গৃহাভ্যন্তর হইতে ভুবনমোহন বেশে বাহির হইলেন, এবং, এই মধুর বেশে যাইয়া কাজীকে প্রেম দিয়া আয়ত্ত করিলেন, একটী রূঢ় কথাও কহিলেন না। এখন দেখুন, বিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী কি! কতদুর প্রেমের গভীরতায় তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রুদ্রভাব দূর করিয়া প্রেমের মানুষ করিয়া কাজীর নিকট প্রাণবল্লভকে পাঠাইলেন! দেখুন, জীবের দুঃখে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কত কাতর!

কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ! এই লীলাটী লইয়া একবার বিচার করুন। কাজীর তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তাঁহার অধীনে অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তখন মুসলমান রাজত্ব, সুতরাং, কাজীর পশ্চাতে প্রবল শক্তি রহিয়াছে। বিশেষতঃ, তখন বহু আনুষ্ঠানিক কর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুও সংকীর্ত্তনের বিরোধী হইয়া কাজীর সহায়তা করিতেছিল। এদিকে প্রভুও রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ও ভক্তগণকে মিলিত হইতে আদেশ দিয়াছেন। এইভাবে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হইলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইত, তাহা ভাবিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রভুর বলে ভক্তগণ বলীয়ান্। সুতরাং, তিনি যখন তাঁহাদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া কাজী দমন করিতে যাইবেন, তখন তিনি যাইবেনই যাইবেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রভু পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। আর, তিনি পশ্চাৎপদ হইলে ভক্তগণ যে আর সংকীর্ত্তন করিতে পারেন না! তাহা হইলে, তিনি যে যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন, তাহাতে বাধা পড়ে, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া সকল বিষয় শুনিতেছেন, এবং, ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর, তাহা আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই অবস্থায় স্বীয় প্রাণবল্লভকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কাজীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিক্ষুব্ধ হইলেন না, বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রভুকে বিদায় দিলেন। সে কিরূপে দেখুন। ইতিহাসে অনেক স্থলে দেখা যায়, বীর স্বামীকে বীর পত্নী যুদ্ধে যাইতে প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি প্রদান করেন, এবং, এমন কি, স্বীয় হস্তে স্বামীকে যোদ্ধৃবেশে সাজাইয়া দেন। এতাদৃশ বীর পত্নীর আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু, একবার বিচার করিয়া দেখুন, বীরপত্নী যে এরূপ করিলেন, তাহা কেবল জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া, এবং, যুদ্ধে শত্রুর মুণ্ডপাত করিতে পারিলে স্বীয় ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ্যাতি হইবে, এই আশা করিয়া। যাঁহাদের জিঘাংসা বৃত্তি প্রবল, এবং এইরূপে শত্রুদমন করিতে যাঁহাদের প্রবল বাসনা, তাঁহারাই এতাদৃশ কার্য্যের প্রশংসা করেন, এবং ইহা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু, দেখুন—দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কি করিলেন! তিনি জানেন, প্রভুর কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই। অস্ত্রের মধ্যে হরিনাম, আর শস্ত্রের মধ্যে তাঁর ভুবনমোহন রূপ। ওদিকে কাজী ভীষণ বলমদে মত্ত। যদি হরিনাম অস্ত্র লইয়াই যাইতে হয়, তবে তদনুরূপ ভাব ধারণ করিতে হইবে। রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলে চলিবে কেন? শ্রীমতী জানেন, প্রেমের শক্তি সর্ব্বোপরি এবং শত্রুকে আপন করিতে পারিলেই প্রকৃত শত্রুদমন হয়। শ্রীমতী জানেন, কাজী যাহা করিয়াছে, তাহা মায়ার অধীন হইয়াই করিয়াছে। কাজী একটী পতিত জীব। পতিত অবস্থায় এরূপ করা স্বাভাবিক। কাজীর ইহাতে দোষ কি! এই পতিত অবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলে আর সে ইহা করিবে না! তাই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কাজীর প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া প্রভুর রুদ্রভাব দূর করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রেমমূর্ত্তিতে কাজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ভুবনমোহন নদীয়া-নাগর প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দর্শন করিয়া কাজীর আর পূর্ব্ব ভাব রহিলনা। তিনি আর এক মানুষ হইয়া গেলেন। কাজী উদ্ধার হইল,

তিনি প্রেম পাইয়া ধন্য হইলেন। এই কাজী উদ্ধারের মূলে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। এখন দেখুন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু! জীবের প্রতি তাঁহার কি অসীম দয়া! তাঁহার কি অপার পতিতপাবনী শক্তি! এইরূপ করিয়া স্বীয় প্রাণবল্লভকে একটী দুর্দ্দান্ত শত্রুর নিকট প্রেরণ করা মায়িক জীবে সম্ভবে না।

কথা এই, শ্রীমতী ভূস্বরূপিণী। জীবসমষ্টি লইয়া পৃথিবী। জীব ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ—মায়ার অধীন। শ্রীমতী যখন প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তিনি পতিত দুর্গত সকল জীবেরই নেতৃত্ব লইয়া সকলেরই প্রতিনিধি স্বরূপে প্রভুর সহিত সঙ্গতা হইলেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই সকলের আশ্রয় স্থল। মায়াপ্রসূত ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার একমাত্র স্থান, একমাত্র অবলম্বন তাঁহার সুশীতল শ্রীচরণযুগল। কবিকর্ণপূর যখন শিশু ছিলেন, যখন তিনি লেখাপড়া কিছু জানিতেন না, তখন প্রভুর বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তিনি একটী অতি সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সেই কর্ণপূর দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সকলের তত্ত্ব যথাযথ নিরূপণ করাইয়া প্রকাশ করিলেন, এবং এই কর্ণপূরই শ্রীমতীকে ভূস্বরূপিণী বলিয়াছেন। এখন দেখুন, এই ভূস্বরূপিণী কথার মূলে কত গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, পতিত জীবের পক্ষে প্রভু কর্ণপুরের মুখ দিয়া কত আশার কথা জানাইয়াছেন। আমরা পতিত জীব, যদি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত হই, তবে আর মায়া আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শ্রীমতী আমাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণে ভেট দিবেন, আমাদের হইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের নিকট বলিবেন। শুধু তাহাই নহে, কেবল যে আমরা ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, তাহা নহে, আমরা প্রেম পাইয়া ধন্য হইব।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যে জীবের দুঃখে কাতর, তাহা আমরা জগাই মাধাই ও চাঁদ কাজীর উদ্ধারে বিশেষরূপেই দেখিতে পাই। আর সাধারণ ভাবে

দেখিতে পাই, প্রভু জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কীর্ত্তন করিতেন, এবং, বহু দিনই সারানিশি শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তনে কাটাইতেন, শ্রীমতী প্রাণবল্লভের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে পারিতেন না। ইহাতে তিনি প্রভুকে স্বীয় সুখের নিমিত্ত কীর্ত্তনে যাইতে বাধা দিতেন না। কিন্তু, কোন দিন শ্রীমতীর সখীগণ প্রভুকে এই বলিয়া অনুযোগ দিতেন যে, তিনি প্রায়ই শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তনে নিশি যাপন করেন, শ্রীমতীর নিকটে বড় একটা থাকেন না, ইহা প্রভুর বড় অন্যায়। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কহিতেন, "আমাকে তোমরা বৃথা অনুযোগ দিতেছ, আমি ত প্রিয়ারই ইচ্ছা পোষণ করিতেছি মাত্র। শ্রীমতী জীবের দুঃখে কাতর ; সকল জীবেরই সে কল্যাণ কামনা করে। সে নিজে আনন্দস্বরূপ—সে ত আমারই হ্লাদিনী শক্তি। জীবের নিরানন্দ তাহার সহেনা। তাঁহার ইচ্ছা, সকল জীবের নিরানন্দ দূর হয়—সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হয়। নামসংকীর্ত্তন আনন্দস্বরূপ। বহু জীব আছে, তাহারা নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়ার প্রভাব তাহাদের উপর এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, তাহারা নাম লইতে চায় না। আবার বহু জীব নাম গ্রহণে অসমর্থ। এইরূপ স্থাবর জঙ্গম বহু জীব আছে। শ্রীমতী ত সকলেরই উদ্ধার কামনা করিতেছে! উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন হইলে জীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনিলে উদ্ধার হইবে। জীবোদ্ধারের নিমিত্তই আমি কীর্ত্তনে নিশি যাপন করি। আমার হ্লাদিনী শক্তি তিন ভাগে বিভক্ত—নামসংকীর্ত্তন, নিত্যানন্দ, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া, অর্থাৎ, বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনস্বরূপে জীবের কল্যাণ করিতেছে। ইহা সত্য কিনা বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটই জিজ্ঞাসা কর, আমাকে বৃথা অনুযোগ করিতেছ!" প্রভুর এই কথায় বিষ্ণুপ্রিয়া নীরব থাকিতেন।

নবদ্বীপে এইরূপ জীবগণকে কৃপা করার পর নবদ্বীপের বাহিরে শ্রীমতীর দৃষ্টি পড়িল। কত তৃষিত তাপিত জীব রহিয়াছে, শ্রীমতী তাহা জানেন। তিনি ত জীবগণেরই প্রতিনিধি। তিনি ভূস্বরূপিণী। এই দুর্গত জীব-

গণকে তাঁহার কৃপা করিতে হইবে। এই কৃপা করার একমাত্র উপায় হরিনামসংকীর্ত্তন। নামসংকীর্ত্তন আনন্দস্বরূপ, সুতরাং ইহা শ্রীমতীরই অংশভূত। নামে অপ্রাকৃত শক্তি। ইহাতে জীবের আনন্দশক্তি উদ্বুদ্ধ করে, ইহাতে জীব স্বরূপে অবস্থান করে। জীব যে শ্রীভগবানের দাস, মায়ায় দাস নহে, জীবকে তাহা উপলব্ধি করাইয়া দেয়। ইহা কিভাবে হয়, তাহা জীববুদ্ধির অগোচর। এই নামসংকীর্ত্তন নবদ্বীপের বাহিরে প্রচার করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, তাহার তাপত্রয় দূর হইবে। কিন্তু ইহা প্রচার করার উপযুক্ত পাত্র প্রভু ছাড়া আর কে? সুতরাং প্রভুকে নবদ্বীপের বাহিরে পাঠাইতে হইবে। শ্রীমতী জানেন, নামসংকীর্ত্তনকালে প্রভু কিরূপ আত্মহারা হন, কিরূপ ধূলায় গড়াগড়ি যান। নবদ্বীপে থাকাকালীন কীর্ত্তনান্তে তিনি প্রভুর সেবা করার সুযোগ পাইতেন, কিন্তু নদীয়ার বাহিরে গেলে তাঁহার আর এ সুযোগ থাকিবেনা, ইহাও শ্রীমতী জানেন। সময় মত প্রভুর ভোজন-শয়ন হইবেনা, ইহাও শ্রীমতী জানেন। নবদ্বীপে থাকার সময় শ্রীবাসের কীর্ত্তন-কুঞ্জে যখন প্রভু নিশিযাপন করিতেন, তখন শ্রীমতীর সাময়িক বিরহ সহ্য করিতে হইত; কিন্তু নদীয়ার বাহিরে গেলে, দু একদিনের জন্য নহে, বহুকালের জন্য বিরহ শ্রীমতীর সহ্য করিতে হইবে, তাহাও তিনি বুঝিলেন। প্রভুর সুখ স্বাস্থ্যের দিকে একবারেই লক্ষ্য থাকিবেনা, এবং তাঁহার মরম বুঝিয়া সেবা করার যোগ্যপাত্রও নদীয়ার বাহিরে কেহ থাকিবেনা, ইহাও তিনি সম্পূর্ণ বিদিত ছিলেন; তথাপি, তিনি স্বীয় প্রাণবল্লভকে দুর্গত জীবের কল্যাণের নিমিত্ত নদীয়ার বাহিরে পাঠাইলেন, আর তিনি শ্রীশচী মাকে লইয়া নদীয়ায় রহিলেন।

শুধু যদি প্রবাসে পাঠান হইত, তাহা হইলেও শ্রীমতী কতকটা সুস্থ থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাও বড় সহজ নহে। এ বিরহ-বেদনাও

অসহনীয়। তথাপি, প্রবাস হইতে কিয়দ্দিন পরে প্রভু ফিরিয়া আসিবেন, এই আশায় তিনি নিজকে প্রবোধ দিতে পারিতেন। কিন্তু, শুধু প্রবাসে পাঠানও নহে। ইহা অপেক্ষাও অতিশয় কঠিন কার্য্য শ্রীমতীর করিতে হইয়াছিল। পাষাণে বুক বাঁধিয়া শ্রীমতীর এই কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ইহা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতেই সম্ভব। জীবে ইহা পারে না। কলিতে দুর্ব্বল জীবের হরিনামসংকীর্ত্তন ব্যতিরেকে অন্য পন্থা নাই। যোগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কৃচ্ছ্রসাধন, বা জ্ঞানবিচার কলির জীবের শক্তির অতীত। হরিনাম একমাত্র উপায়। ইহা শ্রীমতী জানেন। কিন্তু, জ্ঞানাভিমানী সন্ন্যাসিগণ এই হরিনামসংকীর্ত্তনের প্রধান বিরোধী। তখন জ্ঞানমার্গাবলম্বী সন্ন্যাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, এবং জীবসমাজে তাঁহাদের প্রভূত প্রভাব ছিল। জীবগণ জ্ঞানপথ অবলম্বন করিতে পারুক আর না-ই পারুক, সন্ন্যাসিগণের আদর্শেই তাহারা জ্ঞানচর্চ্চা করিত। ইহাতে কেবল অভিমানের সৃজন হইত। এই অভিমান ভগবদ্‌ভক্তির প্রধান অন্তরায়। অভিমানই মায়ার বন্ধন আরো দৃঢ় করে এবং ত্রিতাপ জ্বালায় জীবকে জর্জ্জরিত করে। শ্রীমতী দেখিলেন, এই সন্ন্যাসিগণকে প্রথমতঃ অভি-মানাত্মক জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিপথে আনিতে হইবে, সন্ন্যাসিগণকে হরিনাম দিয়া শোধন করিতে হইবে, তাহা হইলেই সকলে দ্বিধাশূন্য হইয়া হরিনাম লইবে। এইজন্য প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে কঠিন সন্ন্যাসিগণ প্রভুর কথা গ্রহণ করিবে না। লীলায় দেখিতে পাই, প্রভু সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অর্থাৎ, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, সংকীর্ণ স্বার্থ বলিতে তাঁহার কিছুই নাই; যদি কোন স্বার্থ থাকে, তবে তাহা কেবল জীবগণকে হরিনাম দেওয়া, ও তাহাদের ত্রিতাপ জ্বালা দূর করা; তথাপি, সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত অদ্বিতীয় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, ও এইরূপ কত বৌদ্ধাচার্য্য, কত তান্ত্রিক,

কত মুসলমান মৌলভী প্রভুকে প্রথমতঃ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, অবশেষে অবশ্য প্রভুর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। জীব মায়ার বশে কতদূর কলুষিত হয় দেখুন, প্রভু সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তথাপি পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ প্রভুকে উপেক্ষা করিয়াছেন, আর যদি সন্ন্যাসী না হইতেন, তবে ত আর কথাই ছিল না। যাহা হউক, শ্রীমতী জীবচরিত্র জানেন। তাই তিনি ভাবিলেন, জীবগণকে আকর্ষণ করার জন্য প্রভুর সন্ন্যাস করা প্রয়োজন। সন্ন্যাস করিলে যে তিনি গার্হস্থ্য-সুখ হইতে চিরবঞ্চিত হইবেন, ইহা শ্রীমতী বেশ জানিতেন। তথাপি তিনি অম্লানবদনে প্রভুকে সন্ন্যাসে অনুমোদন করিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে পারি, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে চিরবিরহ-বেদনা সহ্য করিয়া সকলকে মিলন-সুখ আস্বাদন করিতে সুযোগ দিলেন—স্বীয় প্রাণবল্লভকে জগতের প্রাণবল্লভ করিয়া দিলেন। এখন দেখুন, শ্রীমতীর হৃদয় কত গভীর! কত অতলস্পর্শী! জীবের দুঃখে তিনি কত কাতর! জীবের সুখের লাগিয়া তিনি কত ত্যাগ স্বীকার করিলেন! মানুষে এ হেন ত্যাগ অসম্ভব। জগতের ইতিহাসে এতাদৃশ ত্যাগ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

আবার ভাবুন, তখনকার দিনে সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম যথোচিত পালন করিতেন না। শঙ্করাচার্য্য যে আদর্শ লইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, সেই সময় তাহার বহুপরিমাণে ব্যত্যয় হইয়াছিল। সন্ন্যাসিগণের অনিকেত ও নিরালম্ব হওয়া কর্ত্তব্য, তখনকার সন্ন্যাসিগণ সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা দৈহিক সুখের অতীত ছিলেন না। বহু মঠ ছিল, প্রত্যেক মঠের এক একজন অধ্যক্ষ থাকিতেন, তাঁহার অধীনে বহু সন্ন্যাসী থাকিতেন। ইহাতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন হউক আর না-ই হউক, এক একটী সম্প্রদায়ের সৃজন হইয়াছিল। এইরূপে সন্ন্যাসীদিগের

মধ্যে প্রতিযোগিতাও হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পরিবার ছাড়াইয়া বিশ্বপরিবার গ্রহণ করা সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সময়ের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এ ভাব দেখা যাইত না। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রসার লাভের জন্য সকলের চেষ্টা থাকিত। ইহাতে কেবলমাত্র অভিমানের পোষণ করা হইত। যিনি কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন, তিনি যদি শুনিতেন, অপর কোন সন্ন্যাসী তাঁহার মত কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অপরকে ঘৃণা করা বা কটাক্ষ করা অর্থই তাহাকে ছোট মনে করা ও আত্মাভিমান প্রকাশ করা। এই অভিমানে সকল সাধন ভজন নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইলে সম্পূর্ণ আদর্শ সন্ন্যাসী হইতে হইবে—তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরভিমান, সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে। দৈহিক সুখ একবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তাঁহাকে অনিকেত হইতে হইবে, বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গাল সাজিতে হইবে, ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে, নাসায় আহার করিতে হইবে। যিনি সন্ন্যাসী, তিনি সকলের গুরু। গৌরববর্জিত হওয়াই গুরুর ধর্ম্ম, অর্থাৎ, যিনি যত গুরুত্বাভিমানহীন, তিনি সেই পরিমাণে অপরের গুরু বলিয়া পূজিত। প্রভুর এইরূপ সম্পূর্ণ গৌরববর্জ্জিত পরিপূর্ণ আদর্শ গুরু হইতে হইবে। প্রভুকে তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইতে হইবে, তবে ত সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে, এবং, প্রভুপ্রদত্ত হরিনাম পাইয়া সকলের চিত্তশোধন হইবে। এখন, ভাবুন দেখি একবার শ্রীমতীর কথা। প্রভুকে যে এতদূর কঠোরতা করিতে হইবে, তাহা তিনি অবশ্যই জানেন। যিনি নদীয়ার রাজা, নদীয়া-বিনোদ, নবীন কিশোর, যিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, নদীয়ায় যিনি বহু ভক্তগণ কর্ত্তৃক কত যত্নে সেবিত, যাঁহাকে শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ দিয়া, বহুবিধ সুস্বাদু আহার্য্য ও পানীয় দিয়াও ভক্তগণ তৃপ্ত হইতে পারিতেন না, প্রভুকে সেবা করার বাসনা তাঁহাদের

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, সেই গৌরাঙ্গসুন্দরকে কাঙ্গাল সাজিতে হইবে, তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। এ চিত্র শ্রীমতী পূর্ব্বেই হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছিলেন। আর, ইহাও তিনি জানিতেন যে, ভক্তগণ বরং, প্রভু যেখানেই থাকুন, সেখানে যাইয়া তাঁহার সেবা-সুখ আস্বাদন করিতে পারিবেন; কিন্তু, তিনি এই সুখ হইতে চিরবঞ্চিত হইবেন। এখন ভাবুন দেখি, এই সব জানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের জন্য, জীবকে ভব সমুদ্র হইতে উদ্ধার করার নিমিত্ত শ্রীমতী প্রভুকে বিদায় দিলেন। শ্রীমতীর প্রেমের গভীরতা কত! জীবের প্রতি তিনি কত কৃপার্দ্র! এ ত্যাগের তুলনা নাই, এ কৃপার অবধি নাই।

যাঁহার প্রেম যত গভীর, তিনি বিরহবেদনা তত সহিতে পারেন। প্রভু অধ্যাপক থাকার সময় যখন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি জাকজমকের সহিতই আসিয়াছিলেন, সঙ্গে অনেক প্রভুর শিষ্য ছিল। ভৃত্যও সঙ্গে ছিল। তাহারা প্রভুর সেবা করিত; এবং আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার যশঃ-সৌরভ এদিকে বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহার আগমনে চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিল। সকলেই প্রভুর সেবা করার ভাগ্য পাইয়াছিল। ইহা ব্যতীতও কীর্ত্তন-তরঙ্গে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ তরঙ্গায়িত করেন। সুতরাং বহু লোকই প্রভুর সেবা করিতেন। তখন প্রভু গৃহী—পণ্ডিত। তাঁহার নবীন নাগর বেশ। তখন তিনি কাঙ্গাল বেশ ধরেন নাই। আর, পূর্ব্ববঙ্গে ছিলেন প্রভু ছয় মাসমাত্র। প্রভুর এত সব সুখ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভুর এই ছয় মাস কাল বিরহ সহিতে পারিলেন না। তিনি বিরহে অন্তর্ধান করিলেন। আর, এখন, প্রভু চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছেন। সে বিদায়ও কিরূপ? না, সন্ন্যাসী হইয়া—দীন হীন কাঙ্গাল বেশে। সুখের অন্বেষণে তিনি যাইতেছেন না, উজ্জ্বল নির্ম্মল সুখ জীবকে দেওয়ার জন্য তিনি জগতের

যাবতীয় দুঃখ দৈন্য স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া লইতে যাইতেছেন। সুখ ও দুঃখ জগতে দুইটী বস্তু আছে। জীব নিরাবিল সুখ পাইতেছে না। তাই তিনি নিজে দুঃখ বরণ করিয়া লইতে যাইতেছেন, আর জীবকে সুখের ভাগ দিতে যাইতেছেন। ইহা একদিন দুই দিনের জন্য নহে, ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নহে, যে সেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে প্রভু আবার আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলিত হইবেন, এবং আবার নদীয়ায় থাকিয়া গার্হস্থ্য সুখ আস্বাদন করিবেন। যতদিন প্রভু প্রকট লীলা করিবেন, ততদিন প্রভুর এইরূপ দুঃখ দৈন্য আলিঙ্গন করিয়া লইতে হইবে, আর বিষ্ণুপ্রিয়ায় বিরহ-বেদনা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। ইহা শ্রীমতী জানেন ; তথাপি, তিনি পরের হিতের নিমিত্ত প্রভুকে সন্ন্যাস করিতে অনুমতি দিলেন। জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীমতী নিজের বুকে নিজে শেল মারিলেন, তথাপি জীব সুখে থাকুক, জীব উদ্ধার হউক। শ্রীমতী জীবের লাগিয়া প্রভুর বিরহে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে, অনিদ্রায়, দিবসরজনী কাটাইতেন, একাদিক্রমে কতদিন বা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন ; তথাপি তিনি এই দুঃসহ বিরহ-বেদনার অবসানের জন্য সুরধুনীতে দেহ-বিসর্জ্জন করিলেন না। মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তর্ধান করিলেন না, তাহা হইলে যে প্রভুর কার্য্যে বাধা পড়ে। পাষাণে বুক বাঁধিয়া নীরবে তিনি সকল সহিলেন। এখন দেখুন—বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু! তাঁহার প্রেম কত গভীর! মহাজনগণ এই জন্যই তাঁহাকে মহাভাবময়ী বলিয়া থাকেন।

প্রভুর বিরহে নদীয়ার অবস্থা কি হইয়াছিল, একবার ভাবনেত্রে দর্শন করুন। যিনি নদীয়ার সম্পত্তি, তিনি নদীয়ায় নাই ; যাঁহার গৌরবে নদীয়া গৌরবান্বিত, তিনি নদীয়া ছাড়া হইয়াছেন ; যাঁহার দর্শনে নদীয়ার নরনারী তরুলতা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত পুলকিত হইত, এমন কি, যাঁহার

দর্শনে সুরধুনী পর্য্যন্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত, তিনি এখন নদীয়ায় অদর্শন হইয়াছেন,এক কথায় শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াণ প্রাণ, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গর বিরহে নদীয়া প্রাণহীন হইয়াছে ; ইহাতে নদীয়ার কি অবস্থা হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনার অতীত ;—ভাবে কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। কোন কোন মহাজন এই অবস্থা ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। জগদানন্দকে শ্রীশচীদেবী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও ভক্তগণের সংবাদ লওয়ার জন্য ও তাঁহাদিগকে প্রভুর কুশলবার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত প্রভু নদীয়ায় প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ কিঞ্চিৎ দূর হইতে নদীয়ার দৃশ্য কিরূপ দেখিলেন, দেখুন—

নীলাচল হ'তে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুল পুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে,
এই অনুমানে ধায় ॥ ধ্রু ॥

জগদানন্দ পণ্ডিত কি দেখিলেন, দেখুন—

লতা তরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা ॥
শাখে বসি পাখী মুদি দুটী আঁখি
ফল জল তেয়াগিয়া।
কাঁদয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া ॥

ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।

ইহা দেখিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের কি হইল? না, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা, পদ—

মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ি গা॥

প্রভুর বিরহে তরুলতার পাতা অকালে খসিয়া পড়িয়াছে, রবির কিরণ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিতেছে না, পাখী সকল ডালে বসিয়া আঁখি মুদিয়া রহিয়াছে, ফলজল সব ত্যাগ করিয়াছে, আর, গোরাচাঁদের নাম লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতেছে, ধেনুগণ পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। ভক্তগণ ভুলেও মিথ্যা কথা বলেন না। আর বিশেষতঃ এই মাধবী দাস প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। ইনি শিখী মাহিতীর ভগ্নী। ইঁহার আর এক জন ভ্রাতার নাম মুরারি মাহিতী। মাধবী দাসী পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ন্যায় কঠোর সাধনা করিতেন, এই জন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগকে "তিন ভ্রাতা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মাধবী দাসী সম্বন্ধে বলেন—

প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ দামোদর, আর, রায় রামানন্দ।
শিখী মাহিতী, তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজজনের মধ্যে এই সাড়ে তিন জন পাত্র ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদ করিতে অধিকারী ছিলেন। এই মাধবী দাসী প্রভু সম্বন্ধে বহু পদ রচনা করিয়াছেন, এবং অনেক পদের ভনিতায়ই আপনাকে

মাধবী দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সম্ভবতঃ জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, তাঁহার মুখে নবদ্বীপের অবস্থা শুনিয়া মাধবী ইহা উপরি উক্ত পদে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভুর এই অতিশয় অন্তরঙ্গ ভক্ত কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিবেন, ইহা মনে করা অন্যায়। যিনি বিশ্বাস করিতে না পারেন, তিনি কৃপা করিয়া তর্ক করিবেন না। ফল কথা, যিনি আত্মার আত্মা, যিনি সকলের প্রাণ, তাঁহার বিরহে পশু পক্ষী, তরুলতার এ হেন দশা হইবে, ইহা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস কালেও অযোধ্যার এইরূপ দশা হইয়াছিল আমরা দেখিতে পাই।

যাহা হউক, এখন ভাবুন দেখি, গৌর-বিরহে নদীয়ার তরুলতা, পশুপক্ষীর যদি এরূপ দশা হইল, তবে প্রভুর প্রাণবল্লভা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কিরূপ দশা হইতে পারে! ইহা সত্ত্বেও শ্রীমতী স্বীয় প্রাণবল্লভকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া নদীয়ার বাহিরে জীবের দুয়ারে দুয়ারে পাঠাইলেন! জীবের দুঃখে শ্রীমতী কত কাতর!

গৌর-বিরহে নদীয়ার অবস্থা আরো কিঞ্চিৎ দর্শন করুন। পণ্ডিত জগদানন্দ কিয়ৎকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, পরে সম্বিৎ পাইয়া নদীয়া নগরে চলিলেন, যাইয়া কি দেখিলেন? দেখুন—

ক্ষণেক রহিয়া চলিল উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়া নগরে দেখে ঘরে ঘরে
কাহার নাহিক স্পন্দ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কাঁদয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি॥

নদীয়া নগরের চারিদিকে এই অবস্থা দর্শন করিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন, সেখানে তিনি কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিলেন, দেখুন—

দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করিল যাই।
আধ মরা হেন পড়ি আছে যেন
অচেতনে শচী মাই॥
প্রভুর রমণী— সেহ অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসনে
মুদিত নয়নে ধারা॥
বিশ্বাসী প্রধান কিঙ্কর ঈশান
নয়নে শোকাশ্রু ঝরে।
তবু রক্ষা করে শাশুড়ী বধূরে
সর্ব্বদা শুশ্রূষা করে॥

ভক্তগণ! কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ! আর অগ্রসর হওয়ার দরকার নাই। এখানেই একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া এই দুইটী বস্তুর বিরহদশা দর্শন করুন। প্রথমতঃ শচীমাকে দেখুন, তিনি আধ মরা হইয়া পড়িয়া আছেন। একে ত তিনি নিমাই-হারা হইয়া আধ মরা হইয়া আছেন, প্রাণের নিমাই বিনে আর তাঁহার মা বলিতে কেহ নাই। ইহাতে যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার সোণার নিমাইচাঁদ সুখে আছেন, নিমাই সুস্থ আছেন, তাহা হইলে শচী মা কতক আশ্বস্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। স্বপ্নে তিনি নিমাইকে যেরূপ দর্শন করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ আরো শুখাইয়া যাইত। নিমাই একদিন

স্বপ্নে আসিয়া শচী মাকে দর্শন দিলেন। শচী মা দেখিলেন, নিমাইয়ের চাঁচর কেশ নাই, দেহের শ্রী নাই, শ্রীঅঙ্গের লাবণ্য নাই, অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, পাগলের মত চেহারা হইয়াছে, আর দুনয়নে সদা ধারা বহিতেছে। ক্ষণেক দর্শন করিয়া শচী মা আর দেখিলেন না। নিমাই অদর্শন হইলেন। কিন্তু, তাঁহার কঙ্কালময় চেহারাখানি মায়ের চোখের সাম্‌নে রাখিয়া গেলেন, আর সেই সঙ্গে মায়ের বুকে বিষম শেল হানিয়া গেলেন। ইহার উপর আবার বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁহাকে লইয়া তিনি যেন জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া বসতি করেন। কোন দিন বা শচী মা রজনীতে স্বপ্নে নিমাইকে দর্শন করিয়া উহা সত্য করিয়া মানিতেন, এবং নিদ্রান্তে নিমাইয়ের উদ্দেশ্যে গৃহের বাহিরে ছুটিতেন। আর, নিমাইকে না দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কত বিলাপ করিতেন, "নিমাইরে! দুঃখিনী মায়েরে যদি একবার স্মরণ করিলি, তবে আবার, বাপধন, লুকাইলি কেন? কত করিয়া তোকে পড়াইলাম, আর, আমি নিমাই পণ্ডিতের মা বলিয়া কত লোকে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করিত, কিন্তু, এই বৃদ্ধকালে কপালদোষে সকল বিপরীত হইল। তুই সন্ন্যাসী হইলি! আমি যে মরিব, তাহার দায় নাই, আমার ননীর পুতলী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি উপায় হইবে?" শচীমার এই বিলাপ শুনিয়া বৃক্ষপত্র ঝরিত, পশুপাখী কাঁদিত ; যথা, পদ—

শচীর বিলাপ শুনি বৃক্ষপত্র ঝরে।
পশুপাখী কাঁদে, আর পাষাণ বিদরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সম্বিত হারায়।
তা দেখি মালিনী দুঃখে করে হায় হায়॥
কি করিলে গোরাচাঁদ কহে প্রেমদাস।
মাতৃহত্যা করিবে কি লইয়া সন্ন্যাস॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা লিখিতে আর মন উঠে না, লেখনী সরে না। সেই নিদারুণ কাহিনী, সেই মর্ম্মভেদী বিরহযাতনা না বলাই ভাল। বলিলে যে আবার তাহার পুনরভিনয় হয়। সন্ন্যাস দুইবার হয় না। একবার যা হওয়ার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন শ্রীমতীর সহিত প্রভুর নিত্য মিলন। কোন্ কঠিন জীব পুনরায় দেখিতে চাহেন —

প্রভুর রমণী— সেহ অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসনে
মুদিত নয়নে ধারা॥

কোন্ প্রাণহীন নিষ্ঠুর পাষাণ জীব আবার দেখিতে চাহেন যে, শ্রীমতী সখীদের নিকট রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন—

সজনি! অবদিন বিফলহি ভেল।
সোঙরিতে সো মুখ হৃদয় বিদারত
পাঁজরে বজরক শোল॥
উঠ বস করি কত, ক্ষিতি মাহা লুঠত,
পবন আনল দহ অঙ্গ।
কি করব, কা দেই সমবাদ পাঠাওব,
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ॥

জীবের দুঃখ দূর করিতে যাইয়া শ্রীমতী বিরহ সমুদ্রে পড়িলেন। সখীগণ যখন আসিয়া শ্রীমতীকে ঘিরিয়া বসিতেন, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া তাঁহারা নিজেরাই অধীর হইতেন, তখন শ্রীমতীর কত কষ্টে ভাব সম্বরণ করিয়া সখীদের সান্ত্বনা করিতে হইত। কখন বা তিনি বলিতেন—

সখিরে! সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥

কখন বা শ্রীমতী বলিতেন, সখিরে! আর কতদিন বাঁচিব। এ বিচ্ছেদ-জ্বালা আর কতদিন সহিতে হইবে?

ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন?

কখন বা কোন সখী কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীমতীর কাছে কহিতেন, "কোথায় গেলে গৌরাঙ্গ-চাঁদকে দর্শন করিব? অবশেষে বিধি কি কপালে ইহাই লিখিয়াছিল?" ইহাতে শ্রীমতী আরো অধীর-হৃদয় হইতেন।

কোন দিন বা সাত পাঁচ নাগরী মিলিত হইয়া শ্রীমতীর কাছে আসিতেন, আর পরস্পর মন উঘারিয়া কত কথা কহিতেন। কেহ বা বলিতেন, "এই জন্যই কি কুলশীল ছাড়িয়াছিলাম? পতি, শাশুড়ী, ননদী, কাহারো কথায় কর্ণপাত করি নাই। দেহ, মন প্রাণ সব ঐ গৌরপদে বিকাইয়া দিয়াছিলাম। দিনান্তে সুরধুনী-তীরে দূর হইতে যদি একবারও সে চাঁদ-বদন দর্শন করিতে পারিতাম, তবে জীবন ধন্য মনে করিতাম। আর, এই জন্য জল আনিবার ছল করিয়া গৃহের বাহির হইতাম। সখিরে, এখন যে সকলি আমার গরলসম বোধ: হইতেছে।" কোন নাগরী বলিতেন, সখিরে!

ফুকরি কাঁদিতে নারে চোরের রমণী।
অণুক্ষণ পড়ে মনে গোরা মুখখানি॥
ঘরের বাহির নহি কুলের ঝি।
স্বপনে না হয় দেখা করিব কি?
সে রূপ মাধুরী লীলা কাহারে কহিব?
গোরা পহুঁ বিনে মুই অনলে পশিব॥

সখীগণের এই বিরহবেদনা দেখিয়া শ্রীমতীর বিরহ আরো দ্বিগুণিতা হইত, আরো অসহনীয় হইত, কিন্তু প্রাণের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া তাঁহাকে সখীদের সান্ত্বনা করিতে হইত।

হে পাঠকগণ, এ বিরহকাহিনী আর কহিয়া কাজ নাই। শ্রীমতীর এক এক দিন এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইত। সময় আর ফুরাইত না। যখনকার যে ফল বা কোন সুস্বাদু খাদ্য আসিত, তাহা দেখিয়া শ্রীমতী প্রভুকে স্মরণ করিয়া কেবলমাত্র কাঁদিতেন। কোন নাগরী হয় ত একটী সুস্বাদু দ্রব্য লইয়া শ্রীমতীকে খাওয়াইবার নিমিত্ত অতি যত্ন করিয়া লইয়া আসিতেন, কিন্তু পাছে বা শ্রীমতীর বিরহ-জ্বালা ইহাতে আরো বৃদ্ধি পায়, এই ভয়ে শ্রীমতীর কাছে নিতেও সাহস করিতেন না। শচীমার কাছে নিয়া দিতেন। শচী দেবী আর কি করেন! তাঁহারও নিমাইর কথা মনে পড়িত। কিন্তু নাগরীগণকে সুখ দেওয়ার জন্য ভাব সম্বরণ করিয়া শ্রীমতীকে ডাকিতেন, আর বলিতেন,"মা তোমার সখীগণকে সুখী কর। তারা এই দ্রব্য নিয়া আসিয়াছে।" শ্রীমতী মাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ফলটী বা কোন খাবার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, সখীরাও মুখে তুলিয়া দিতেছেন, এমন সময় হয়ত একটা কাক কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিত, অমনি কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া শ্রীমতী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, নাগরীগণও ভাবিতেন, তবে কি নীলাচলের সংবাদ শুভ নয়! কাক অমন করিয়া ডাকিল কেন? শচীমারও তখন অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। এইরূপে শ্রীমতী অনন্ত বিরহসমুদ্রে পড়িয়া নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেন। নিত্য নব নব ভাবে এই বিরহ-বেদনা আসিয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিত। হে পাঠক, আর এ নিদারুণ চিত্র আঁকিয়া কাজ নাই। কোন্ পাষাণ-হৃদয় দেখিতে চাহে যে, বালা বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন, আর চৌদিকে সখীগণ ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন, এবং নাসার উপরে তুলা ধরিয়া দেখিতেছেন—শ্বাস বহে কি না। কোন প্রিয় সখী এই দৃশ্য সহিতে না পারিয়া পাগলের মত হইয়া সুরধুনীর তীরে ধাইয়া চলিলেন, এবং নবদ্বীপ

থাকা কালীন প্রভু যেখানে বসিতেন, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া প্রভুকে যেন সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া গদ গদ হইয়া কত কি প্রলাপ কহিতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া পাষাণ গলিয়া যায়। যথা, পদ—

তছু দুঃখে দুঃখী এক প্রিয় সখী
গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমনি বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী তীরে
যেখানে বসিতা পঁহু।
তথায় যাইয়া গদ গদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু॥
সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে যৈছন, গৌড়ে,
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বেয়াকুল
শুনিতে মরমে বেথা॥

সখী যাইয়া কি কহিলেন, শুনুন—

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়াগুণ সোঙরিয়া
মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তুল ধরি নাসার উপরে॥

তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর,
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়া নিবাসী যত তারা ভেল মূরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধ মরা দেহ তার প্রাণছাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া॥
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস বহে দরশন আশে।

পদকর্ত্তা মাধবঘোষ সখীর অনুগত হইয়া বলিতেছেন—

এ দেহে রসিকবর, চলহে নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥

শ্রীমতীর সখী আরো কি বলিতেছেন শুনুন—

গৌরাঙ্গ, ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত॥
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া॥

সখীর অনুগত হইয়া—

কহয়ে মাধব ঘোষ—শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্ব, আমি আগে যাই মরি॥

শ্রীমতীর বিরহ পদে কথঞ্চিৎ মাত্র ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার গভীর বেদনা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হে ভক্তগণ! আপনারাও

কি শ্রীমতাকে এইরূপ দেখিয়া ঐ সখীর মত দৌড়িয়া গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে আনিয়া শ্রীমতীকে প্রাণে বাঁচাইবেন না! আপনার কি সাধ হইবেনা, নদীয়ার চাঁদ আবার নদীয়ায় ফিরিয়া আসুন এবং নিত্য নদীয়ায় বিরাজ করুন! আপনার কি আকাঙ্ক্ষা হইবেনা যে, বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিয়ড়েই চির বিরাজ করুন, আর এই যুগল মিলন দেখিয়া আপনার নয়ন ও মনঃপ্রাণ চিরশীতল হউক! শ্রীশচীমায়ের আলয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ান্তিকে থাকিয়া প্রভু সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন, ইহা আপনার স্বতঃই আকাঙ্ক্ষা হইবে। কেনই বা হইবেনা। সেই সময়ও ভক্তগণের এইরূপ বাসনা হইয়াছে এবং তাঁহারা যুগল মিলন করাইয়া প্রাণের সাধ মিটাইয়াছেন।

ব্রজলীলায় দেখিতে পাই, চন্দ্রাবলী ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইতে দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইবেন, ইহা তাঁহার সহিত না। এমন কি, শ্রীরাধার নাম পর্য্যন্ত তিনি লইতেন না। ইহার হেতু এই, চন্দ্রাবলী, শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা কত, তাহা জানিতেন না। তিনি মনে করিতেন, শ্রীরাধা তাঁহারই মত। কিন্তু শ্রীরাধা কখনও কাহারো বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করিতেন না। শ্রীরাধার ভাব এই—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো।
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ *

---

* ভক্তগণ কৃপা করিয়া এই অর্থটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা বিংশপরিচ্ছেদ হইতে আস্বাদন করিয়া লইবেন।

অর্থাৎ, শ্রীমতী বলিতেছেন, "আমি কৃষ্ণপদ-দাসী, আমাকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎই করুন, অথবা আমাকে দেখাইয়া অন্যের সহিত সঙ্গতই হউন, কিম্বা, অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন, অথবা তিনি যেখানে সেখানে স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যই করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণসর্ব্বস্ব, দেহ-গেহাদি নহে।" শ্রীরাধা বলিতেছেন, "আমি স্বীয় সুখবাঞ্ছা করিনা, একমাত্র কৃষ্ণসুখই কামনা করি। আমাকে দুঃখ দিয়াও যদি তাঁহার সুখ হয়, তবে সেই দুঃখই আমি শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মনে করি। কৃষ্ণ যদি অন্য কাহারো সঙ্গ করিয়া সুখ পান, তবে আমি তাঁহার পদসেবা করিয়া, তাঁহার পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণসঙ্গ করাইব, তাহাতেই আমার সুখের উল্লাস হইবে।"

শ্রীরাধা বলিলেন এইরূপ। অথচ, চন্দ্রাবলী শ্রীমতীর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারিতেন না। কারণ, তাঁহার আত্মসুখবাঞ্ছা ছিল, তিনি কৃষ্ণসুখ চাহিতেন না। এই আত্মসুখবাসনা হইতেই ঈর্ষ্যা দ্বেষের সৃজন হয়। প্রেমের ধর্ম্মই এই, যাঁহাকে ভালবাসা যায়, তাঁহার সুখ হইলেই আত্মতৃপ্তি হয়। তিনি দুঃখ দিয়াও যদি সুখ পান, তবে সে দুঃখ দুঃখই নহে, পরন্তু পরম সুখ বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রাবলীর এরূপ উচ্চ ভাব ছিল না। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাকে রাধাপ্রেমের মহিমা কিঞ্চিৎ বুঝাইবেন। শ্রীরাধার অনুগত না হইলে প্রেম পাওয়া যায় না। চন্দ্রাবলী, শ্রীরাধার অনুগত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাকে রাধার অনুগত করিতে হইবে। এই আনুগত্য কিরূপে সম্ভবপর? যিনি চিরকাল ঈর্ষ্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা সহজ নহে। শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য বিরহ-লীলার অবতারণা করিলেন। বিরহে, কাহার কতদূর প্রেম, তাহা ধরা পড়ে। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গেলেন, আর

আসিলেন না, তখন শ্রীরাধা বিরহে দশম দশায় উপনীত হইলেন, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, আর সখীগণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবলীও কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং, পথে শ্রীমতীর ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বিরহে এইরূপ দশা হইতে পাবে, তাহা তিনি পূর্ব্বে ভাবিতেও পারেন নাই। তখন তাঁহার স্বীয় প্রেমের অল্পতা বোধ হইল। এমন কি, তিনি শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইবার জন্য স্বয়ং মথুরায় গেলেন। শুধু তাহাই নহে,কৃষ্ণ মথুরার রাজা ; তিনি বৃন্দাবনের একজন গোয়ালিনী। রাজার নিকট তিনি সামান্য গোয়ালিনী হইয়া যাইবেন কিরূপে? তিনি নিজের বিরহ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়া শ্রীবাধার দুঃখেই দুঃখিত হইয়া পাগলিনীর মত 'রাধে' 'রাধে', বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি কৃষ্ণদর্শন পাইলেন। যিনি শ্রীরাধার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতেন, তিনি তাঁহার অনুগত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেম পাইলেন।

হে গৌর-ভক্তগণ! আপনারাও যদি চন্দ্রাবলীর মত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে বিষ্ণুপ্রিয়ান্তিকে রাখিতে আপত্তি করেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে না রাখিয়া একক শ্রীগৌরাঙ্গকে আপনাদের নিকটেই রাখিতে ইচ্ছা কবেন, তবে একবার কৃপা করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-লীলাকাহিনী পাঠ করুন, দেখুন বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহে অনিদ্রায়, অনশনে, দিনযামিনী যাপন কবিতেছেন, জগদানন্দ যেরূপ নীলাচল হইতে আসিয়া দেখিলেন, আপনিও সেই পণ্ডিত জগদানন্দের অনুগত হইয়া দেখুন

প্রভুর রমণী— সেহ অনাথিনী,
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসনে,
মুদিত নয়নে ধারা॥

আর দেখুন—শ্রীশচীমা আধ মরা হইয়া পড়িয়া আছেন। আর কি? আর দেখুন

দাস দাসী সব আছয়ে নীরব
দেখিয়া পথিক জন।
সুধাইছে তারে কহ মো সবারে
কোথা হইতে আগমন।

দাসদাসীদের এই কথায় যখন পণ্ডিত উত্তর করিলেন, তিনি নীলাচলপুর হইতে আসিয়াছেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাদিগের তত্ত্ব লইবার নিমিত্ত তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন, তখন কেহ বা তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া সজল নয়নে শচীমাকে সংবাদ দিলেন, কেহ বা ধাইয়া গিয়া শ্রীবাসগৃহিনী মালিনা দেবীকে সংবাদ দিলেন। মালিনী দেবীও মরার মতন ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি প্রাণ পাইলেন। অমনি শ্রীশচীর আলয়ে ধাইয়া আসিলেন। আসিয়া কি করিলেন? না—

মালিনা আসিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইলা ত্বরা করি।

তাঁহাদিগকে উঠাইয়া

বলে, চাহি দেখ, পাঠাইলা লোক
তত্ত্ব লৈতে গৌরহরি॥

শচীমা ইহা শুনিয়াই চারিদিকে চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, জগদানন্দ পণ্ডিত আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শচীমা পণ্ডিতের ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিমাই কতদূরে আসিয়াছে?" শচীমার ধারণা, পণ্ডিতকে নিমাই অগ্রে পাঠাইয়াছেন, নিমাই পশ্চাতে আসিতেছেন। আসিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। তাই শচীমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাই আমার কত দূরে আসিয়াছে? আর কত দেরী?"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া আর কোন কথা কহিতেছেন না, কহিতে পারিতে-ছেন না। কেবলমাত্র ফ্যাল ফাল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন, আর, পণ্ডিতের মুখে প্রাণনাথের আগমনবার্ত্তা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। শুধু পণ্ডিতের মুখে নহে। তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহার প্রাণনাথ আসিলে ত হরিধ্বনি শুনা যাইবে। হরিবোল ধ্বনিতেই ত তাঁহার প্রাণবল্লভের আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়। যেখানেই তাঁহার প্রাণনাথ যান, সেখানেই ত লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'হরিবোল' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করে। এই 'হরিবোল' ধ্বনি শুনা যায় কি না, এইজন্যই শ্রীমতী বিশেষ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। শচী মা যেন পণ্ডিতকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার নিমাই আসিতেছেন। মালিনী দেবী ও সীতাদেবী এবং প্রভুর মাসীমা সকলেই সেইভাবে ভাবিত হইয়া তন্ময় হইয়া পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরী-বৃন্দেরও সেই অবস্থা। পাঠক, এই চিত্রটী একবার হৃদয়ে আঁকিয়া লউন, দেখুন—গৌরবিরহে নদীয়ার কি অবস্থা! এদিকে জগদানন্দের আগমনবার্ত্তা নদীয়ায় রাষ্ট্র হইল। নীলাচল হইতে সংবাদ আসিয়াছে। সকলের আনন্দ উল্লাস আর ধরেনা। সকলে 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে পরম আনন্দ উল্লাসে শ্রীশচীমায়ের অঙ্গনের দিকে ছুটিলেন। কাহারও নয়নে ধারা, কাহারও নৃত্য। আর তুমুল 'হরিবোল' ধ্বনি। এই ধ্বনি শ্রীমতীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইল, একবার ভাবুন দেখি! শ্রীমতী ভাবিলেন, "এইত 'হরিবোল' ধ্বনি! ঐ আমার প্রাণনাথ আসিতেছেন!" যতই ধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল, ততই শ্রীমতী আর এক ভাবসাগরে পড়িলেন। শ্রীমতী নয়নের ইঙ্গিতে কাঞ্চনাপ্রভৃতি সর্ব্বসখীগণের নিকট বলিতেছেন, "সখিরে, প্রাণনাথ আসিলে আমি কি করিব? আমার ভয় হয়! আমি তাঁকে

দেখিয়া পাছে মূর্চ্ছা যাই! সখিরে, আমি ত তাঁর সেবা করিতে জানিনা! আমি কি বলিয়া তাঁকে বরণ করিয়া লইব, তা-ও ত জানিনা! তোরাই আমার হইয়া সব করিস্!” শ্রীমতী ভাবপ্রাবল্যে কথা কহিতে পারিতেছেন না। ভাবে সখীগণের নিকট প্রাণের কথা জানাইলেন, আর, তাঁহার নয়ন হইতে ধারা পড়িতে লাগিল। আবার ভাবিতেছেন, ‘সত্যই কি আমি ‘হরিবোল’ ধ্বনি শুনিতেছি? না আমার ভ্রম হইতেছে?’ আবার ভাবিতেছেন—“না, না, সত্যই ত ঐ ‘হরিবোল’ ধ্বনি শুনা যায়! তবে সত্যই কি প্রভু আমার, প্রাণ আমার আসিতেছেন!” নয়নের কোণে কাঞ্চনাকে কহিলেন, সত্যই কি, সখি, প্রভু আমার আসিতেছেন! না, সখি, আমার এ ভাগ্য নাই! অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ ভাবপ্রাবল্যে কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কখন আবার শচীমা ও সখীগণ চেতন করান, আবার মূর্চ্ছিত হন। জগদানন্দ নবদ্বীপদেবীগণের এই ভাবাম্বুধি দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। হে ভক্তগণ! শ্রীমতীকে এই অবস্থায় কি রাখিতে আপনার আর ইচ্ছা হইবে! কোন্ পাষাণহৃদয় এই সময় বলিতে সাহস করিবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আছেন, নীলাচলেই থাকুন। জগদানন্দ শচীমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “মা, গৌর গুণমণি যুগে যুগে তোমার প্রেমের বশ, তুমি স্থির হও। ঠাকুরাণীকে সুস্থ কর।” জগদানন্দের মত আপনারাও সকলে একবাক্যে বলিবেন, প্রভু শ্রীশচীমায়ের আলয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াস্তিকে নিত্য বিরাজ করুন। আর বিরহলীলা অভিনয়ে কাজ নাই।

জগদানন্দকে প্রভু নবদ্বীপে পাঠাইলেন কেন? মহাজনগণ বলিয়া থাকেন, জগদানন্দ পূর্ব্ব অবতারে সত্যভামা ছিলেন। তিনি গৌরভামিনী ছিলেন। গৌরাঙ্গকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি

গৌরাঙ্গের উপর মান করিতেন। প্রিয় জনের উপর মান করা প্রেমেরই কার্য্য বটে, কিন্তু, অধিক মনে ভাল নয়; তাহাতে প্রেমাস্পদ বড় ব্যথা পান। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে যে সকল মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহা তাঁহাতে অর্পিত হইলেই সুন্দর ও মধুময় হয়। ক্রোধ একটী বৃত্তি, শ্রীভগবানে ইহার পূর্ণ প্রয়োগ মানে বিকাশ। তাই প্রেমিক ভক্ত শ্রীভগবানের উপর মান করিয়া থাকেন। ইহাতে শ্রীভগবান্‌ও সুখ পান, ভক্তেরও রসাস্বাদন হয়। শ্রীরাধা কৃষ্ণের উপর মান করিতেন, কৃষ্ণ তাহাতে সুখ পাইতেন। গৌরলীলায়ও দেখিতে পাই, বহু ভক্তই প্রভুর উপর মান করিয়াছেন। কিন্তু, ইহা আবার অত্যধিক মাত্রায় হইলে প্রভু তাহাতে বড় ব্যথা পাইতেন। শ্রীরাধার কথা এই—

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণমর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥

কিন্তু, গৌরভামিনী শ্রীজগদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের উপর একটু বেশী মান করিলেন। প্রভু জগদানন্দের ইচ্ছানুযায়ী সুগন্ধি চন্দনতৈল মাখিলেন না বলিয়া জগদানন্দ মান করিলেন—তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি উপবাস করিয়া রহিলেন, এই তিন দিনের মধ্যে একবার আসিয়া প্রভুকে দর্শনও করেন নাই। ভক্তগণ প্রভুর সন্ন্যাসের কঠোরতা দেখিয়া যে দুঃখ পাইতেন, সেই দুঃখ দেখিয়া প্রভু নিজেই ত কত ব্যথিত! মুকুন্দকে

ত তিনি বড় দুঃখ করিয়াই বলিলেন, "মুকুন্দ, এই শীতের মধ্যে আমি তিন বেলা স্নান করি, ইহাতে তুমি দুঃখ পাও ; তোমার সেই দুঃখ দেখিয়া আমি প্রাণে বড় দুঃখ পাই।" প্রভু দুঃখ পান দেখিয়া মুকুন্দ আর বাহিরে দুঃখ প্রকাশ করিতেন না, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিতেন। প্রভুর কঠোরতায় ভক্তগণ যে দুঃখিত, তাহাতে প্রভু নিজেই ত কত ব্যথিত ! এই জন্য তিনি ভক্তগণের নিকট কত ভয়ে ভয়ে থাকিতেন ; অথচ তিনি এই কঠোরতা না করিয়াও পারেন না। এই সব জানিয়া শুনিয়াও, এবং প্রভুর এই কঠোরতা যে অপরিহার্য্য, তাহা বুঝিয়াও জগদানন্দ প্রভুর উপর রাগ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত না খাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়া রহিলেন। স্বরূপদামোদরও প্রভুর উপর রাগ করিয়া কাশীধামে যাইয়া সন্ন্যাস করিলেন, আবার কিছুদিন পরে আসিয়া প্রভুর সহিত নীলাচলে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে প্রভুর সাধিতে হইল না। কিন্তু, জগদানন্দকে সাধিতে হইল—সেও কিরূপ ? না, জগদানন্দ পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া প্রভু দ্বারে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতকে ডাকিলেন, এবং কহিলেন, "পণ্ডিত, উঠিয়া রন্ধন কর ; আজ তুমি আমাকে ভিক্ষা দিবে।" তাহা না হইলে—প্রভু নিজে আহার করিবেন, ইহা না বলিলে, পণ্ডিত যে আহার করা দূরের কথা, উঠিবেনও না। জগদানন্দ বহুবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। মধ্যাহ্নে প্রভু আসিলেন এবং পণ্ডিত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সি কিরূপ ? না,

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।

প্রভু ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। অন্যান্য দিন হইতে প্রভু দশ গুণ ভোজন করিলেন, তবু জগদানন্দের মন উঠে না। প্রভু ভোজন সমাপন করিয়া উঠিতে উপক্রম করেন, সেই সময় আবার পণ্ডিত ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন। প্রভু আর কি করেন !—

কিছু বলিতে নারে, প্রভু থায় ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥

অবশেষে তিনি "বিনয় সম্মান" করিয়া জগদানন্দকে বলিয়া কহিয়া উঠিলেন। ইহাতেও প্রভু সুস্থ হইতে পারিলেন না। ভোজন করিয়া উঠিয়া প্রভু পণ্ডিতকে সাধিতে লাগিলেন, কহিলেন—

আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে।

কিন্তু জগদানন্দ ভোজন করিলেন না, বলিলেন, রামাই রঘুনাথ রন্ধনের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ভোজন হইলে তিনি প্রসাদ পাইবেন। প্রভু বিশ্রাম করিতে গেলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; গোবিন্দকে রাখিয়া গেলেন; তাঁহাকে বলিলেন, 'গোবিন্দ, তুমি এখানে থাক, পণ্ডিত ভোজন করিলে আমাকে কহিও।' যেমন ভক্ত, তেমনই প্রভু বটেন! গোবিন্দকে জগদানন্দ প্রভুর পাদসম্বাহনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু, প্রভু কিছুতে সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। তিনি পুনরায় গোবিন্দকে পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন—

দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার জানি কহত আমায় ॥

গোবিন্দ আবার প্রভুর কাছে যাইয়া সংবাদ দিলেন যে, পণ্ডিত প্রসাদ পাইয়াছেন, তখন প্রভু সুস্থ হইলেন, যথা—

তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন ॥ *

এইরূপে দেখা যায়, পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রভুর বহু সাধিতে হইয়াছে। জগদানন্দও গৌরভামিনী বটেন, কিন্তু প্রভু ভাবিলেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার

* জগদানন্দের এই প্রেমবিবর্ত্ত লীলাটী বড় সুন্দর। পাঠকগণ কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে পড়িয়া লইবেন।

প্রেমের মহিমা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিলে পণ্ডিত পূর্ণমাত্রায় প্রেমরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। তাই, তিনি ইচ্ছা করিলেন, জগদানন্দ একবার নবদ্বীপ যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহদশা দেখিয়া আসুক, তাহা হইলে বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব সে বুঝিবে। সত্যসত্যই জগদানন্দ নবদ্বীপ আসিয়া বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব বুঝিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের মিলনবাঞ্ছা করিয়া একটী মধুর পদ রচনা করিলেন,তাহার কথঞ্চিৎ দিতেছি। শ্রীমতী বলিতেছেন—

আলিরি, হোত মনহুঁ উলাস সুলছণ,
বাম নিজভুজ উরজ ঘন ঘন,
ফুকরই দূর সঞে প্রাণপিঙ কিয়ে অদূর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব,
আগে লিখন সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূখণ সবহুঁ ভায়ব রে॥

* * * *

পদের ভণিতা দেখুন—

নাথ আওল, এতনি ভাখণ
মৃতসঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন
জগত ভণ জনু জীবন-মৃত তনু জীবন পাওল রে॥

প্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পরমানন্দ পুরীকেও এই নিমিত্ত নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। মহাজনগণ পরমনন্দ পুরীকে উদ্ধব-স্বভাব বলিয়া থাকেন। উদ্ধবকে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেম বুঝাইবার জন্য ব্রজে পাঠাইলেন, যেন, উদ্ধব স্বচক্ষে দেখিতে পায়েন, যে, গোপীপ্রেমের তুলনায় উদ্ধবের প্রেম অতি অকিঞ্চিৎকর, এবং ইহা দেখিয়া যেন তাঁহার অভিমান চূর্ণ হয়; পরমানন্দ পুরীকেও প্রভু সেইরূপ ঠিক সেই নিমিত্তই নাগরীপ্রেম বুঝাইবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন।

বাসুঘোষ নদীয়াবাসী ভক্তগণের বিশেষতঃ শ্রীশচীমা ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ দুঃখ সহিতে না পারিয়া প্রভুকে নদীয়ায় লইয়া আসিলেন। সত্যসত্যই প্রভু নবদ্বীপে আসিলেন। বাসুঘোষের অনুগত হইয়া প্রভুর নবদ্বীপ আগমন একবার দর্শন করুন—

শুনিয়া ভকত দুঃখ বিদরিয়া যায় বুক,
চলে গোরা সহচর সাথে।
তুরিতে গমন যার নিমেষে যোজন পার
ভকত মিলন নদীয়াতে॥

গৌরাঙ্গ নদীয়ায় আসিয়া ভক্তের দশা দেখিয়া কহিলেন--

হায় কি করিলাম কাজ! সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ!
মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যাব নীলাচলে, থাকিব ভকত মেলে,
ইহা বলি হরল গেয়ান॥

প্রভুকে সকলে সুস্থ করিলেন। তখন বাসুঘোষ বলিতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ দেখি শীতল হইল আঁখি,
পরশেতে হিয়া জুড়াইল।
আর না ছাড়িয়া দিব, হিয়ায় মাঝারে থোব,
বাসুঘোষের আনন্দ বাড়িল॥

বাসুঘোষ প্রভুকে নদীয়ায় আনিয়া যখন শ্রীমতীর সহিত মিলন করাইলেন, তখন যুগল মিলন দেখিয়া তাঁহার আঁখি শীতল হইল, প্রাণ জুড়াইল। এই বাসুঘোষই শ্রীমতীর অসহনীয় বিরহবেদনা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থা দেখিয়া প্রাণ বাঁচে না।" যথা পদ—

হে দেহে পরাণ নিলাজিয়া।
এখন না গেলি তনু তেজিয়া॥

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে।
মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।

শ্রীমতীর বিরহ বর্ণনা করিয়াই বাসুঘোষ উপরোক্ত পদ লিখিয়াছেন, এবং, এই বিরহবেদনা আর সহিতে না পারিয়া বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর কি বলিতেছে, শুনুন—

বাসু কহে না রহে পরাণি॥

আর একটী পদে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা তিনি বলিতেছেন—

এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাঞা
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।

শ্রীমতীর এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া বাসুদেব কি বলিতেছেন? না—

বাসুদেবানন্দে কয়, মো সম পামর নাই,
তবু হিয়া রহয়ে আমার॥

শ্রীমতীর দশা দেখিয়া বাসুঘোষের যখন এইরূপ হইয়াছিল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গকে নদীয়ায় আনিয়া যুগলমিলন করাইয়া যে তিনি নয়ন তৃপ্ত করিবেন, প্রাণ শীতল করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

হে কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ! শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপায়ই আপনারা এই প্রেমের গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইয়াছেন, আপনারা যে এখন রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কথা কহিতেছেন, এজন্য আপনারা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট চিরঋণী। তিনিই আপনাদের উদ্ধারের পন্থা করিয়াছেন।

আপনাদের প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া আপনাদেরই উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি স্বীয় প্রাণবল্লভকে কাঙ্গাল সন্ন্যাসী সাজাইয়া আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আর তিনি স্বয়ং অসহনীয় বিরহ-বেদনা সহিয়াছেন। আপনারা যদি ভক্ত হন, তবে, বাসুঘোষের মত, জগদানন্দের মত, শ্রীমতীর বিরহ-দশা দেখিয়া আপনাদের প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে চাহিবে। যতই বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে আপনার অশ্রুপাত হইবে,ততই আপনার হৃদয় নির্ম্মল হইবে,এবং,বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবেন ; তখন এই নদীয়ার নিত্যযুগল আপনার চির আরাধ্য হইবেন। আর আপনি যদি ভক্ত না-ও হন, তবেও শ্রীমতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া আপনি নিশ্চয়ই বলিবেন, "প্রভু হে! কাজ নাই তোমার জীবোদ্ধারে। আমরা যে পতিত,সেই পতিতই থাকি, সে-ও ভাল ; তথাপি, প্রভু, তুমি শচী দেবীকে ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া তিলমাত্র থাকিও না। নদীয়ার চাঁদ নদীয়ায় থাক। আমি চিরদুঃখে থাকি, তথাপি, তুমি, প্রভু, চিরসুখে থাক, আর, এই দুইটী বস্তুকে সুখে রাখ। ইঁহাদের বিরহবেদনা আর সহিতে পারি না।" আপনি যতই এইরূপ বলিবেন ও বাঞ্ছা করিবেন, ততই আপনার হৃদয় নির্ম্মল হইবে, ততই শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার হৃদয় জুড়িয়া বসিবেন। আপনি পতিত হইয়া থাকিতে চাহিলেও প্রভু আপনাকে পতিত থাকিতে দিবেন না। প্রভু আপনাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইবেন। এইজন্যই প্রভু এই করুণ রসের অবতারণা করিলেন, যেন, ইহাতে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। আপনার মলিন দশা দেখিয়া প্রভু কাঁদিতেছেন, শ্রীমতীও কাঁদিতেছেন। আপনি ইহা দেখিয়া প্রভুর সুখ চাহিবেন, এবং শ্রীমতীর সুখ চাহিবেন, প্রভু ও প্রিয়াজীও আপনার সুখ চাহিবেন। ইহাই ত প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থা। অতএব, প্রেম পাইতে হইলে চন্দ্রাবলীর ন্যায় আপনারও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার

অনুগত হইতে হইবে। আপনার মানবজীবন সার্থক হইবে। এই শুদ্ধ রাগমার্গ প্রচার করিতেই প্রভু আসিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥
"প্রেম-রস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অবতারের মূল কারণ কহিলেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য এবং লোকের মধ্যে রাগমার্গভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত—এই দুই হেতু জীবসমাজে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন যে, সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত গণের বিনাশ সাধনের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হন। ইহা বহিরঙ্গ কথা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচার করাই অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই এই ভাব গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত প য়ারে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামীর এই বাক্যের কিঞ্চিৎ অর্থ-বিস্তার করা যাউক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অথচ, কবিরাজ গোস্বামী প্রথম দুইটী অবতারের কারণ ধরিলেন না, ইহাকে তিনি আনুষঙ্গিক কারণ বলিলেন, এবং শেষোক্ত কারণটীকেই মুখ্য হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মদনমোহনের আজ্ঞায়ই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন। সুতরাং, তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহা শ্রীমদনমোহনেরই অভিপ্রায়। কাজেই

বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই শেষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামীকে কেবল নিমিত্ত-মাত্র রাখিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত অবতারের উদ্দেশ্যত্রয়ের শেষোক্ত উদ্দেশ্যটী কি, এবং এই মুখ্য উদ্দেশ্যটী সাধিত হইলে অপর দুইটী উদ্দেশ্য কিরূপ আনুষঙ্গিক ভাবে আপনা হইতেই সাধিত হয়। এই মূল উদ্দেশ্যটী কি? না, ধর্ম্ম সংস্থাপন। ধর্ম্ম কি? না, প্রেম। প্রেমের যে জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই, ইহা যে ভেদ-বুদ্ধিবর্জ্জিত, ইহাতে যে সকলের মধ্যে মিলন হয়, এবং ইহাই যে মানবের একমাত্র ধর্ম্ম, ইহা অল্প পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যদি প্রেম সংস্থাপিত হয়, তবে অসুর নিধন আপনা হইতে হইয়া যায়। অসুর কি? না, একটী প্রেমবিরোধী ভাব। ইহাতে জীবে জীবে ভেদ-বুদ্ধি জন্মায়। ইহাতে বড় ছোট এই ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া হিংসা দ্বেষের সৃজন করে। প্রেমের সঞ্চার হইলে আর এই অসুর ভাব থাকেনা, সুতরাং, আপনা হইতেই অসুর সংহার হইয়া যায়। এইরূপ সংহারই প্রকৃত সংহার। কেননা, অসুরভাবদ্বারা অসুরবিনাশ করিতে গেলে অসুরভাব আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রেমদ্বারা অসুরভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, প্রেম সংস্থাপন করাই অবতারের মূল হেতু। এই হেতু আবার কবিরাজ গোস্বামী দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

(১) শ্রীভগবানের স্বয়ং প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করা;

(২) রাগমার্গ-ভক্তি লোকে প্রচার করা।

যাহা সত্য, তাহা সব সময়ই সত্য। রাম-অবতারই বলুন, আর কৃষ্ণ অবতারই বলুন, কিম্বা গৌর-অবতারই বলুন, প্রত্যেক অবতারেরই মূল হেতু এই দুইটী। তবে, ক্রমবিকাশ যেমন প্রকৃতির নিয়ম, অবতারেও এই হেতু দুইটী ক্রমান্বয় পরিস্ফুট হইয়াছে। গৌর-অবতার সর্ব্বশেষ

অবতার। এই অবতারে এই হেতু তুইটী পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিরূপে, তাহা বলিতেছি। শ্রীরামচন্দ্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অসুর নিধন করিলেন। যেমন শাণিত অস্ত্র লইলেন, তেমনই আবার প্রেমদান করিলেন। রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে ভয় করিলেন, কিন্তু গুহক তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর শবরী বহুদিনের সঞ্চিত ফলমূলদ্বারা তাঁহার সেবা করিলেন। মন্থরা ও কৈকেয়ী শ্রীরামকে কণ্টক মনে করিয়া বনে দূর করিয়া দিলেন, আর, কৌশল্যা, সুমিত্রা প্রভৃতি তাঁহার বিরহে দিবানিশি কাঁদিয়া কাটাইলেন। বালি বধ হইল, সুগ্রীব বন্ধু হইলেন, হনুমান দাস হইলেন। সুতরাং দেখা যায়, তিনি অসুর দমনও করিলেন, এবং প্রেমরস আস্বাদনও করিলেন। যে রামচন্দ্র দশবৎসর বয়সে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিলেন, তিনি কৈকেয়ীর কথায় কাঙ্গাল সাজিলেন, এবং বলবীর্য্যবিহীন হইয়া বনে গমন করিলেন। কৈকেয়ীও মাতৃরূপে একরূপ রাক্ষসী, কেননা, তিনি অপরকে সুখে বঞ্চিত করিয়া, অন্যে যাহা ন্যায়সঙ্গতরূপে পাইতে পারে, তাহা হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া, সব আত্মগ্রাস করিতে চাহিলেন, পরের গ্রাস নিজে কাড়িয়া লইতে চাহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে তাড়কা রাক্ষসীর মত বধ করিলেন না, কিন্তু, আর এক ভাবে তাঁহাকে বধ করিলেন, অর্থাৎ,নিজে যখন কাঙ্গাল হইয়া বনে গেলেন, এবং সমস্ত রাজ্য তাঁহার পুত্র ভরতকে ভোগ করিতে সুযোগ দিয়া গেলেন, তখন ভরতের নিস্পৃহতা ও ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন, তাঁহার আত্মগ্রাসী রাক্ষসভাব দূর হইল। কোথায় ভরতচন্দ্র রাজা হইয়া ধূমধাম করিবেন, এবং তাহা দেখিয়া কৈকেয়ীর রাক্ষস-ভাবের তৃপ্তি সাধন হইবে,আর কোথায় সেই গুণের ভাই ভরত দাদার পাদুকাখানি সিংহাসনের উপর রাখিয়া তাঁহার উপরই ছত্র ধরিয়া থাকিবেন, এবং শ্রীরামচন্দ্র যেমন দণ্ডকারণ্যে দীন হীন বেশে দিন কাটাইতেন, তিনিও সেইরূপ কাঙ্গালভাবে

থাকিয়া ভ্রাতৃবিরহে অঝোরনয়নে কাঁদিতেন, কেবলমাত্র রামচন্দ্রের প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত রাজ্যশাসন করিতেন, আর, এক দুই করিয়া দিন গণনা করিতেন, কবে এই দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইবে ও তাঁহার দুঃখের অবসান হইবে। রাজ্যে তাঁহার সুখ নাই, গৃহে তাঁহার শান্তি নাই, আহারে তাঁহার রতি নাই। শ্রীরামচন্দ্রবিহনে সবই তিনি শূন্য দেখিতেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভাইয়ের বিরহে অঝোর নয়নে কাঁদিতেন। কোথায় তিনি আশা করিয়াছিলেন, দাদা রাজা হইবেন, এবং তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, যথাসাধ্য তাঁহার আজ্ঞাপালন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন, কোথায় তিনি ভাবিয়াছিলেন, দাদার স্নেহ পাইয়া, দাদার কাছে থাকিয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইবেন, আর কোথায় সেই দাদা এখন জটাবল্কলধারী দীন হীন কাঙ্গাল, পর্ণ কুটীরে তাঁহার বাস, হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার প্রতিবেশী, অরণ্যের ফলমূল তাঁহার আহার। ইহাও তিনি কিঞ্চিৎ সহ্য করিতে পারিতেন, যদি, তিনিও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার আদেশ পাইতেন এবং তিনিও দাদাব মত কাঙ্গাল সাজিতে পারিতেন। কিন্তু, তাহা না হইয়া তিনি হইলেন রাজা, আর, দাদা হইলেন ভিখারী! ইহা কি ভরতের প্রাণে সয়! একে ত শ্রীরামচন্দ্রের বিরহ, তাহাতে আবার শ্রীরামের কাঙ্গালবেশের কথা যখনই স্মরণ হইত, তখনই তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিসের তিনি রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন! রাজ্য তাঁহার পক্ষে বিষম কণ্টক হইল। কৈকেয়ীর সাধ পূর্ণ হইল না। এত সুখের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও যদি ভরতের সুখই না হইল, দিবানিশি যদি "হ, রাম" বলিয়া ভরতের কাঁদিয়াই কাটাইতে হইল, তাহা হইলে আর তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল কি? ভরতের এতাদৃশ ভাব দেখিয়া কৈকেয়ীর রাক্ষসভাব বিদূরিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র এখানে প্রেম

দিয়া রাক্ষস বধ করিলেন। এইরূপে তিনি ভরতকে দিয়া শুদ্ধ রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিলেন।

আবার দেখুন, যে রামচন্দ্র অশেষ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া দশাননকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিলেন, তিনিই আবার সামান্য একজন রজকের কথায় তাঁহার চিরপ্রণয়িনী সীতা দেবীকে বনবাস দিয়া নিভৃতে বসিয়া কাঁদিতেন। বিরহলীলার অবতারণা করিয়া তিনি বিশুদ্ধ রাগমার্গভক্তি প্রচার করিলেন, এবং স্বয়ং প্রেম-রসনির্য্যাসও আস্বাদন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও দেখিতে পাই, এই দুই হেতু লইয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানেও অসুরসংহার আছে, এবং সেই সঙ্গে প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন ও শুদ্ধ রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারণও আছে। যে কৃষ্ণ সখাগণকে লইয়া ধেনু চড়াইলেন, ও বিবিধ ক্রীড়া করিলেন, এবং তাঁহাদের কাঁধে চড়িলেন ও তাঁহাদিগকে কাঁধে চড়াইলেন, তিনিই আবার অসুর নিধন করিলেন। সর্ব্বশেষে একবারে অসুর নিধন করিতে যাইয়া ব্রজবাসিগণকে বিরহ-সাগরে ভাসাইলেন, ও ইহাতে রাগমার্গ-ভক্তি প্রকাশিত হইল।

এই রাগমার্গ ভক্তি কি? ভক্তির দুইটী পন্থা—বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। ঈশ্বর বোধে তাঁহাকে ভক্তিকরা বিধিভক্তি; ইহার মন্ত্র—"আমি তোমার।" সখা বা পুত্র বা পতিবোধে তাঁহাকে ভালবাসা রাগ-ভক্তি বা প্রেমভক্তি; ইহার মূল মন্ত্র—"তুমি আমার।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই দ্বিবিধ ভক্তি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি, না হই অধীন॥

ইহা বিধি ভক্তি।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

ইহা শুদ্ধ রাগ-ভক্তি। এই বিশুদ্ধ রাগবলেই মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করেন, এবং অতি ছোট মনে করিয়া লালন পালন করেন, শ্রীদাম সুদাম স্কন্ধে আরোহণ করেন, এবং শ্রীমতী মান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে র্ভৎসনা করেন। ইহাতে কৃষ্ণের যত প্রীতি, বেদস্তুতিতে তত নহে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এইরূপ লীলা করিলেন। কিন্তু, বৃন্দাবনের বাহিরে ইহার প্রচার হইল না। তিনি ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইলেন।

গৌরলীলায় রাগ-ভক্তি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে আপন বলিয়া ভালবাসিতে অবসর পাইয়াছে। কারণ, এখানে অসুর-নিধন নাই। এই লীলায় তিনি ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি, কুষ্ঠ রোগীকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে প্রাণের পরম বান্ধব মনে করিয়াছেন। এবার ভয় নাই, ত্রাস নাই, কেবল বিশুদ্ধ ভালবাসা। যিনি অতিশয় দুর্গত পতিত পাষণ্ড, তিনিও তাঁহাকে ভালবাসার সুযোগ পাইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে আপন-জন বলিয়া ধরিতে পারিয়াছে। এমন কি, যিনি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তিনিও তাঁহাকে প্রাণের বান্ধব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এবার কেবল বিশুদ্ধ ভালবাসার খেলা। সর্ব্বত্র প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। এ যুগে তিনি কেবল ভালবাসা দিয়াছেন ও ভালবাসা পাইয়াছেন। এবার আর শত্রু নাই, অসুর নাই। সকলে তাঁহার বান্ধব, তিনি সকলের বান্ধব। কি আপার মহিমা, কি আশ্চর্য্য লীলা, যাহা কোন যুগে হয় নাই, তাহাই এবার হইয়াছে। যিনি ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি, সংহারে প্রচণ্ড ভৈরবমূর্ত্তি, তিনি

এবার সম্পূর্ণ ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, তিনি শুধুই প্রেমময়। তিনি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভালবাসা স্বভাব লইয়া আসিয়াছেন, এবং সকলকে অবিচারে ভালবাসিয়াছেন ও সকলের ভালবাসা পাইয়াছেন। এইরূপে তিনি শুদ্ধ রাগমার্গভক্তি প্রচার করিলেন। শ্রীগৌর-লীলায় আমরা জানিলাম, ভালবাসা শ্রীভগবানের স্বভাব। সুতরাং, তাঁহাকে ভয় করার কি আছে? প্রেমিককে কেহ ভয় করেনা। এই ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলেই ত অনাবিল আনন্দ। আমরা বুঝিলাম, আমরা যতই কেন দোষ করিনা, তিনি দোষ গ্রহণ করেন না, তিনি কেবলই ভালবাসেন। দোষ ধরা ত দূরের কথা, পাছে আমাদের কৃত কোন কার্য্যের জন্য আমরা দুঃখ পাই, এই জন্য তিনি কত প্রবোধ বাক্য বলিয়া থাকেন। আমাদের সুখের জন্য তিনি সতত ব্যস্ত। যখন আমরা বুঝিলাম, তিনি শত অপরাধেও আমাদিগকে ভালবাসেন, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? এই ভালবাসার কথা স্মরণে নয়নে জল আসে, আর নৃত্য করিতে ইচ্ছা করে। এই ভালবাসার কথা মনে হইলে আর ঈশ্বর বিচার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবল বলিতে সাধ হয়, "হে গৌরাঙ্গ সুন্দর! কাজ নাই আমার ভগবানে, এস তুমি, আমার কাছে বস! এস গৌর, আমি তোমায় নিয়ে ঘর করি। গৌর হে! এস তোমায় নিয়ে সংসার করি, আর নাচিয়া গাহিয়া কাল কাটাই। বন্ধুহে! প্রাণের বান্ধব আমার! তুমি আর আমি, এ হ'লেই ত আমার সব হ'ল। আর আমি চাই কি! কিছুই না। শুধু তুমি ও আমি।" এই শুদ্ধ রাগ-ভক্তি প্রভু জীবকে দিলেন—আপামর সর্ব্ব সাধারণ সকল জীবেই ইহা পাইল।

এখন, অবতারের অন্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করা অবতারের আর একটী মূল হেতু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "দর্পণাদিতে যখন আমি স্বীয় মাধুরী দর্শন করি, তখন ইহা আস্বাদন করিতে আমার লোভ হয়, কিন্তু আস্বাদন করিতে পারিনা।" এই কথার অর্থ কি? শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যামৃত মূর্ত্তি। এই মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও জড়িত আছে, কেননা, তিনি এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা অসুর নিধন করেন। এক একটী জীব এক একখানি দর্পণ। এই দর্পণে সময় সময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় বটে, কিন্তু জীব ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ থাকে বলিয়া সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য কি? না, ধন, জন, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের বাসনা পোষণ করিলে কিছুতেই এ বাসনার তৃপ্তি হয় না। এই অতৃপ্ত বাসনা লইয়া মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব ভগবানের নিকট কেবল একটীর পর আর একটী, আবার তাহার পর আর একটী ভিক্ষা মাগিতে থাকে। এ দৈন্য কিছুতে ঘুচেনা, সুতরাং, বাসনাময় জীব যে ভিক্ষুক সেই ভিক্ষুকই থাকিয়া যায়। ঐহিক সুখসম্পদের জন্য প্রার্থনা করাও যেমন ভিক্ষা, ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য, অর্থাৎ, মুক্তির জন্য প্রার্থনা করাও ভিক্ষা। ভিক্ষুকে ও দাতায় কখন প্রেম হয় না। মনে করুন, একটী সুন্দর পুরুষ আপনার নিকট আসিল, আপনি, বুঝিলেন, ইনি আপনাকে ভাল বাসিতেছেন, এবং ভালবাসিয়া আপনার সুখের ব্যবস্থা করিতেছেন, আর আপনি ইহাও বুঝিলেন যে, এই সুপুরুষটীর খুব দাতৃত্বশক্তি আছে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই দিতে পারেন। আপনি যদি এই পুরুষটীর কাছে কেবল বলিতে থাকেন, আমায় ইহা দাও, আমায় উহা দাও, এইরূপ কেবল দেহি, দেহি করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে থাকেন, তবে তিনি কোন রকমে আপনার নিকট

হইতে অব্যাহতি পাইলে যেন রক্ষা পান। ইহাতে আপনিও বঞ্চিত হইলেন, তিনিও সুখ পাইলেন না। শ্রীভগবান্ না চাহিতেই আপনাদিগকে কত সুখের সামগ্রী দিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রতিনিয়ত দিতেছেন। জলবায়ু আমরা চাই নাই, না চাহিতেই পাইয়াছি। রসনা ও রসনার তৃপ্তিকর কত পদার্থ, এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাহার তৃপ্তিকর কত সামগ্রী তিনি না চাহিতেই দিয়াছেন। কোন্ জিনিষ কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার বুদ্ধিও তিনি দিয়াছেন। এ সকলই তাঁহার ভালবাসার পরিচায়ক। তথাপি, তিনি আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে যদি তাঁহার কাছে এটী দাও, ওটী দাও, বলিয়া ভিক্ষা করি, তাহা হইলে আর কিরূপে প্রীতি থাকে। জীব ঐশ্বর্য্যেই বিশেষ লুব্ধ। শ্রীভগবান্ও দাতারূপে এই বাসনা পূরণ করিতেছেন। সুতরাং জীবের ভাগ্যে আর মাধুর্য্য আস্বাদন করা হয়না। কাজেই শ্রীভগবান্ও জীবকে লইয়া এই মাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করিতে পারেননা। প্রেমের স্বভাব এই, প্রেমের যিনি আস্পদ, এবং যিনি প্রেমের অবলম্বন,উভয়ের মধ্যে সুখ পরস্পর ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। একের সুখে অপরের সুখ হইবে। ইহার আদর্শ ব্রজগোপীগণ। গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট কিছু চাহিতেন না, কেবল ভালবাসিতেন। সুতবাং গোপীগণকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের সুখ হইত, এবং শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হইত, ইহাতে আবার গোপীগণের সুখ হইত, এই গোপীসুখে আরো কৃষ্ণের সুখ হইত। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে সুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিত। এ ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। কিন্তু জীবগণ স্বার্থপরায়ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জীবদর্পণে স্বীয় মাধুরী দেখিয়াও তাহা আস্বাদন করিতে পারিলেন না। প্রেমময় কৃষ্ণ দেখিলেন, ইহাতে জীবের দোষ কি? তিনি ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুই লইয়াই প্রকাশিত হইয়াছেন। জীব স্বভাববশতঃ ঐশ্বর্য্যের দিকেই ধাবমান হয়। তখন কৃষ্ণ উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, যথা—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে ভালবাসিতেন, শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না, কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা ছাড়া আরো কাজ ছিল, যথা—অসুর বিনাশ করা, বৃন্দাবনের বাহিরে যাইয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, জীবগণকে শৃঙ্খলিত করা, এবং, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি। কর্ম্ম প্রেমচর্চ্চার অন্তরায়। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, "শ্রীমতী ত আমারই স্বরূপ। আমি আর শ্রীমতী ত একই বস্তু, কেবল প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত ও জীবগণকে ইহা আস্বাদন করাইবার জন্য দুই হইয়াছি। কিন্তু শ্রীমতী প্রেমে নিমগ্ন, সে কেবল প্রেম লইয়াই আছে। আর, আমি প্রেমের সঙ্গে কর্ম্মও লইয়াছি। ইহাতে আমি সম্পুর্ণ প্রেমরস আস্বাদন করিতে পারিতেছি না। আমি যদি রাধিকাস্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হই, অর্থাৎ, বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপে অবতীর্ণ হই, তাহা হইলে আমি নিজেও আস্বাদন করিতে পারিব, জীবকেও আস্বাদন করাইতে পারিব।" এই উপায় নির্ণয় করিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধার ভাব কি? না, প্রেম। এই প্রেম লইয়া তিনি আসিলেন। আর জীব-দর্পণে তাঁহার পূর্ণ মাধুর্য্য প্রতিফলিত হইল। তিনি নিজেও প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিলেন, এবং জীবকেও প্রেমরস আস্বাদন করাইলেন। গৌরলীলায় আমরা দেখিতে পাই, নদীয়ার বাহিরেও বহু ভক্ত উন্নতোজ্জ্বল মধুর নদীয়াযুগলরস আস্বাদন করিয়াছেন, যথা—সরস্বতী প্রবোধানন্দ, রায় রামানন্দ, পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, মহারাজ প্রতাপরুদ্র, প্রভৃতি।

কেহ কেহ প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন সম্বন্ধে এইরূপ অর্থ করেন যে, কৃষ্ণের ব্রজধামে রসাস্বাদন-বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, শ্রীরাধাকে তিনি কাঁদাই-

য়াছেন, তাই তিনি যেন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নদীয়ায় আসিয়া 'রাধে' 'রাধে' বলিয়া কাঁদিয়াছেন, এবং কখন কখন বা 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে শ্রীরাধা যেমন বিরহসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছেন, এবং এইরূপে বিরহলীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ শ্রীরাধা হইয়া নীলাচলে বসিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছেন, অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে যে কষ্ট দিয়াছিলেন, তিনি নিজে সেই কষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়া সেইরূপ বিরহ-লীলার মধ্যে পড়িয়া উহার প্রতিশোধ দিলেন, এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণমাধুর্য্য বা স্বমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। ইহা অবশ্য ভাবে হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধা হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ দূরে রহিলেন। এই ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কখন বা ভাবে মিলন হইল, এবং তাহার পরেই আবার বিরহ হইল। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিলেন। এই অর্থ শ্রীগৌরঙ্গের ভক্তভাব ধরিতে গেলে সঙ্গত বটে, কিন্তু, তাঁহার স্বয়ং ভাব বা ভগবদ্‌ভাব ধরিলে এ অর্থ সমীচীন হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব এই দুইভাবের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। ভক্তভাবে তিনি যেমন শ্রীরাধা বা পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত হইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছেন, এবং ভক্তি ও প্রেমের গভীরতা দেখাইয়াছেন, ভগবান্ ভাবেও তেমনই আবার বিরহের মধ্য দিয়া স্বমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। এই স্বয়ং ভাবে প্রেমরস আস্বাদন করিতে হইলে দুইটী বস্তুর প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানতা প্রয়োজন, এবং, এই দুইটী বস্তুর মধ্যেই কখন বা মিলন, কখন বা বিরহ, এইরূপে প্রেমরস আস্বাদন করা হইবে। রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া গৌর হইলেন, আর দুইটী বস্তু পৃথক্ রহিলেন না। ইহাই যদি হয়, তবে প্রেমরস আস্বাদনে বাধা পড়ে। প্রেমের স্বভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যাওয়া, বা একের অন্যেতে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া নহে। প্রেমের

স্বভাবে দুই এক হইবে, অথচ দুই-ই থাকিবে, দুইয়ের পৃথক্ সত্ত্বা থাকিবে। তাহা হইলে প্রেমরস আস্বাদন হইবে। কেবল অভেদ হইবে না। ভেদও থাকিবে, ইহাই ভেদাভেদতত্ত্ব। ইহা অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই গৌরলীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেন—

রাধিকার প্রাণপতি কিভাবে কাঁদয়ে নিতি
ইহা বুঝে ভকত সমাজ।

কাঁদিলেন কে? না, শ্রীগৌরাঙ্গ। অথচ শ্রীগৌরাঙ্গকে কি বলা হইল? না, রাধিকার প্রাণপতি। লীলায় আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণপতিই দেখিতে পাই। সুতরাং, ঠাকুর মহাশয় অল্পাক্ষরে জানাইলেন, যে, রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া গৌর হইলেন, তথাপি প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা পৃথক্ রহিলেন, ইনিই বিষ্ণুপ্রিয়া। রাধাকৃষ্ণ এক হইলেন, তথাপি পৃথক্ রহিলেন, অর্থাৎ, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। তাহা না হইলে সম্ভোগ হইবে কিরূপে? ইহাদেরই এখন মিলন ও বিরহ। গম্ভীরা লীলায় যে প্রভু বিরহরস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা অন্তরঙ্গ ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া-বিরহ। একদিকে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমতী গৌরবিরহে রস আস্বাদন করিয়াছেন, আর, অপরদিকে শ্রীনীলাচলে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-বিরহরস আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা বা দ্বারকায় চলিয়া গেলে শ্রীরাধা বৃন্দাবনে বসিয়া কাঁদিয়া দিবানিশি কাটাইলেন, কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা বা মথুরায় বসিয়া শ্রীরাধার জন্য কাঁদিলেন না। মধ্যে মধ্যে হা হুতাশ করিতে পারেন, কিন্তু, শ্রীরাধার মত দিবানিশি কাঁদিয়া কাটান নাই, কাটাইবেনই বা কিরূপে? তিনি যে সেখানে কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত। এবার উভয়ে তুল্য বিরহলীলা আস্বাদন করিলেন। প্রভুর কৃপা হইলে ইহা অন্যত্র কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলার ইচ্ছা রহিল। যাহাহউক, একদিকে যেমন নদীয়ায়

মিলনরস ও নদীয়ার বাহিরে বিরহরস উভয়ে তুল্যভাবে আস্বাদন করিলেন, তেমনই আবার অন্যদিকে নদীয়ায় ও নদীয়ার বাহিরে সর্ব্বত্রই ভক্তগণকে এতদুভয়রস আস্বাদন করিতে অধিকার দিলেন, এবং এই কান্নাকাটা ও বিরহ-বেদনার মধ্য দিয়া সকলকেই এত বড় বস্তুকে অতি নিজ জন—প্রাণের পরম বান্ধব বলিয়া ভাবিতে ও তদনুরূপ ভালবাসিতে সুযোগ দিলেন। ইহাই প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন ও শুদ্ধ রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারণ। এবার আর প্রভু অসুর নিধনাদি কর্ম্মে ব্যস্ত নহেন, প্রয়োজনও হয় নাই। প্রেম দিয়া সকলের হৃদয় শোধন করিয়াছেন। তিনি জানাইলেন, ভগবান্ ভীতির বস্তু নহেন, ভালবাসার বস্তু।

এই ব্যাখ্যাটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে আর একটু বিস্তার করিয়া বলা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে একমাত্র পাত্র শ্রীরাধা। শ্রীরাধার সৎপ্রেমদর্পণ অতি নির্ম্মল, স্বচ্ছ, ইহাতে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। কারণ, শ্রীরাধা প্রেম ছাড়া কিছু জানেন না। এই মাধুর্য্যও যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে নবনবায়মান হয়, শ্রীমতীরও প্রেম তদ্রূপ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব ভাব ধারণ করে। মাধুর্য্যও যেমন অনন্ত, প্রেমও সেইরূপ অনন্ত। সুতরাং, একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অধিকারী। ভক্তগণ শ্রীরাধার ভাবকণা লইয়া স্বস্ব ভাবানুরূপ এই মাধুর্য্য কথঞ্চিৎ আস্বাদন করে। যথা—

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥

ইহার পরই আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি॥

কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বে নির্ম্মল রাধাপ্রেম-দর্পণের কথা বলিয়াছেন, এবং সে দর্পণে তিনি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হন, তাহাও বলিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, শ্রীরাধা তাঁহাকে যত ভালবাসেন, ততই তাঁহার মাধুর্য্য আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং, মাধুর্য্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, প্রেমও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সুতরাং, কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারে না—উভয়ই অনন্ত। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে রূপসুধা আস্বাদন করাইয়া সুখী, আর শ্রীমতী আস্বাদন করিয়া সুখী। শ্রীকৃষ্ণ ভালবাসা পাইয়া সুখী, শ্রীমতী ভালবাসা দিয়া সুখী। শ্রীরাধা যেরূপ রস আস্বাদন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ রস আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না? তাই তিনি বলিতেছেন—

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি॥

শ্রীরাধার নির্ম্মল প্রেমকে দর্পণ বলা হইয়াছে। এখানে দর্পণাদ্য অর্থাৎ, দর্পণ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই—শ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেম দর্পণ, এবং জীবের প্রেম দর্পণের অনুকরণ, আদি বলিতে জীবদর্পণ বুঝাইতেছে। এ প্রেম অবিশুদ্ধ বলিয়া জীবদর্পণ স্বচ্ছ নহে। এ দর্পণে কৃষ্ণমাধুর্য্য সেরূপ প্রতিফলিত হয় না। জীবগণকে যদি তিনি স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করার সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি স্বয়ং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন। জীবগণ কর্ম্মে

আবদ্ধ। তিনিও আনুষঙ্গিক কর্ম্ম লইয়া অবতীর্ণ। জীবগণকে ফেলিয়া—তাহাদিগকে কর্ম্মজনিত দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া তিনি সুখ পাইতে পারেন না। বাসনা হইতে কর্ম্মের উদ্ভব। ইহাতেই জীবের চিত্তদর্পণ মলিন। এই মলিন দর্পণ যদি মার্জ্জিত হয়, তবে তাহাতে তাঁহার মাধুর্য্য প্রতিফলিত হইতে পারে। ইহা মার্জনা করার যদি তিনি সহজ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলেই জীবেরও মাধুর্য্য আস্বাদন সুগম হয়, তিনিও স্বমাধুর্য্য আস্বাদ করিতে পারেন। এইজন্যই গৌর অবতার। গৌরাঙ্গ আসিয়া বলিলেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

শুধু বলিলেন, তাহা নহে। নিজে কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন করাইলেন এবং জীবের চিত্তদর্পণ নির্ম্মল করিয়া ভগন্মাধুর্য্য আস্বাদন করাইলেন। কীর্ত্তন করিতে জপও বুঝায়।

এইরূপে তিনি অপরকেও মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইলেন, নিজেও আস্বাদন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আকর, তাহা ভুলিয়া গিয়া তিনি শুদ্ধ পূর্ণ মাধুর্য্যময় হইলেন। তাই তিনি শচীর দুলাল, নিত্যানন্দের ভাই, স্বরূপের সখা, বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হইলেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, সকল রসের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি হইয়া তিনি পূর্ণ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। শচী মা নিমাইকে স্নেহ করিয়া বাৎসল্য রস আস্বাদন করিতেন, নিমাইও এই স্নেহ পাইয়া ও মাকে ভক্তি দিয়া রস আস্বাদন করিতেন। নিতাই প্রভুকে ভাই বলিয়া ভ্রাতৃসুখ পাইতেন, নিমাইও পাইতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরীগণ বল্লভভাবে মধুর রস

আস্বাদন করিতেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহাদিগের ভালবাসা পাইয়া ও তাঁহাদিগকে ভালবাসা দিয়া এই মধুর রস আস্বাদন করিতেন। ইহাই স্বমাধুর্য্যরস আস্বাদন। অর্থাৎ, ঐশ্বর্য্য এখানে সম্পূর্ণ লুক্কায়িত, মাধুর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ। যুগে যুগেই এই মাধুর্য্যরস আস্বাদন হইয়াছে, কিন্তু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ছিল। এ অবতারে শুদ্ধ মাধুর্য্যেরই বিকাশ। তবে যে প্রভু জগাই মাধাই উদ্ধারে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও আবার নিত্যানন্দ প্রভুর শুদ্ধ মাধুর্য্যময় সখ্যের নিকট লুকাইয়া গেল। শ্রীমন্নিত্যানন্দকে তিনিই এই শুদ্ধ সখ্য দিয়াছেন, ও তাঁহার শুদ্ধ সখ্যের নিকট যে ঐশ্বর্য্যের প্রভাব পরাভূত, তাহা তিনি নিতাইকে দিয়া দেখাইলেন। আবার, কাজীদমনের সময়ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, ভক্তগণের নিকট কাজীর খোল ভাঙ্গা ও অন্যান্য উপদ্রবের কথা শুনিয়া রুদ্রমূর্ত্তি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার শুদ্ধ মাধুর্য্যে সে ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া গেল। তিনি যে ভুবনমোহন, নবীন নাগর, সেই ভুবনমোহন নবীন নাগর স্বরূপে নগরে বাহির হইলেন। কাজীকে দমন না করিয়া প্রেম দিয়া আত্মসাৎ করিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে বা চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে যে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীশচীর মন্দিরে তিনি শুদ্ধ মাধুর্য্যের খেলা খেলিয়া তিনি নিজে যেমন স্বমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিলেন, তেমন উহাদ্বারাই আবার জীবগণের মধ্যে রাগানুগমার্গ প্রচার করিলেন, যেন, জীব ভগবানকে ভয় না করিয়া শচীমার বাড়ীর এই শুদ্ধ মধুর লীলার দিকে দৃষ্টি করিয়া স্ব ভাবানুরূপ ভগবানকে ভালবাসিতে পারে, এবং যিনি যেমন আস্বাদন করিতে লুব্ধ, তিনি যেন সেই রসের অনুরূপ শচীমার, বা নিতাইয়ের, বা বিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরীগণের অনুগত হইয়া ভজন করেন। কিন্তু, পাছে বা শচীমার বাড়ীর এই শুদ্ধ মাধুর্য্যের খেলা বা বিশুদ্ধ নরলীলা

দর্শন করিয়া জীব ইহা মায়িক বলিয়া মনে করিয়া এই রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, এই জন্য তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। ইহা দেখিয়া জীব যখন বুঝিতে পারিবে যে, নিমাই বস্তুটী স্বয়ং ভগবান, তখন আর সে অযথা ঐশ্বর্য্যের দিকে না যাইয়া এই সহজ মধুর ভাব ধরিয়া কৃতার্থ হইবে। যখন এই শচীর দুলাল বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভই সেই বস্তু, তখন আর জীব এই সহজ সুন্দর রাগের পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাইবে কেন? শ্রীবাসের বাড়ীর কীর্ত্তন ও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, শচীমার বাড়ীর মধুর লীলা জীবের ধরিবার পক্ষে সহজ সুগম ও সন্দেহনির্ম্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই মাত্র বিশেষ। ইহাও জীবের প্রতি ভগবানের ভালবাসার পরিচায়ক।

অতএব, হে আমার ভাই ভগিনীগণ! আসুন, আমরা ভগবানকে ভালবাসিয়া ধন্য হই। বিধির বন্ধনে না যাইয়া, ভগবানকে ভীষণ হইতেও ভীষণ মনে না করিয়া, তাঁহার কাছে ভয়ে করযোড়ে কম্পিতকলেবরে না থাকিয়া, এমন প্রেমের ঠাকুরকে হৃদয়ের রাজা করিয়া রাখি। আসুন, আমরা প্রতি গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করি, এবং শচীমার বাড়ীর শুদ্ধ মাধুর্য্যের খেলা দর্শন করি। আমাদের প্রত্যেকের সংসার শচীমার সংসার হইয়া যাউক, আর, আমরা আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া জীবন অতিবাহিত করি। বিশ্বসংসার প্রেমের রাজ্যে পরিণত হউক!

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীভগবানের দুইটী প্রকৃতি—অপরা ও পরা। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই প্রকৃতি দুইটীর স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ—ভূমি, আপ (জল), অনল (তেজ), বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকারাত্মক প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি। এক কথায় বলিতে গেলে, দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই কয়টী অপরা প্রকৃতি। ইহা ভগবান হইতে ভিন্ন প্রকৃতি, অর্থাৎ, ইহা চিন্ময় নহে।

আর, জীবভূতা যে প্রকৃতি জগৎ ধারণ করিয়া আছে, উহাই শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতি।

ঐ যে উপরে অপরা প্রকৃতির কথা বলা হইল, উহার মধ্যে অহঙ্কারটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ইনিই সব নষ্টের গোড়া,—দেহে 'আমি' জ্ঞান জন্মাইয়া দেন। অহংতত্ত্ব হইতে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হইতেই ত্রিতাপ জ্বালার উদ্ভব। ইনি নিজেও কিছু ভোগ করিতে পারেন না, আর অপরকেও কিছু ভোগ করিতে দেন না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটী বলি। যেমন এক রাজার দুইটী মহিষী, একটী শান্ত, আর একটি মুখরা। শান্ত স্ত্রীটী রাজার সর্ব্বদা অনুগত, এবং মুখরাটি কেবল কলহ বিবাদ করেন, রাজার সঙ্গেও তাঁর নিত্য কলহ। রাজার কর্ত্তৃত্ব ছাড়াইয়া নিজেই কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন। রাজা যতই তাঁকে তাঁর সুখের সামগ্রী দিতে থাকেন, ততই

তাঁর আরো স্পর্দ্ধা বাড়িতে থাকে ; তিনি ভাবেন, তাঁর এই মুখের জোরেই সব মিলিতেছে, ইনিই অপরা প্রকৃতি ; আর শান্ত মহিষীটি পরা প্রকৃতি। এই মুখরা স্ত্রীটী বড় আত্মগ্রাসী, কেবল 'দেও' 'দেও', 'খাই' 'খাই', এই ডাক। বিশ্বসংসার তাঁর উদরে দিলেও যেন তাঁর তৃপ্তি হয়না। সে কর্ত্তার প্রতিকূল। সে ভাবে, সে যদি না থাকে, তা'হলে কি আর সংসার চলে ! সে কর্ত্তাকে একবারে যে মানে না,তা-ও নয় ; কিন্তু কর্ত্তার অনুগতও নয়। তাঁর ইচ্ছা, কর্ত্তা তাঁর অনুগত হইয়া থাকুক। এই মুখরা স্ত্রীটীর অভাব কিছুতেই ফুরায়না। ইনি নিজেও যেমন সর্ব্বদা জ্বালা পান, প্রজাবর্গকেও জ্বালা দেন, অর্থাৎ, আমরা দেহাভিমানে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরকে মানি বটে, কিন্তু তাঁহার অনুগত হইতে চাহি না, পক্ষান্তরে ইচ্ছা করি, ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সুখের সামগ্রী আদায় করিয়া লই, ঈশ্বরের দাসত্ব না করিয়া তাঁহাকেই দাসরূপে খাটাইতে ইচ্ছা করি। ইহাতে সুখ শান্তি পাওয়া দূরের কথা, সর্ব্বদা জ্বালা, দেহ মন খিন্ন, অবসন্ন হইয়া পড়ে, জগতের সব বস্তুতে একটা বিরক্তির উদয় হয়। ইহাই অপরা প্রকৃতির কার্য্য। আর, পরা প্রকৃতি ধীর, শান্ত, আনন্দমূর্ত্তি, স্বামীর চির অনুকূল।

শ্রীভগবান্ যখন দেখেন, যে, অপরা প্রকৃতির প্রভাবে জীব অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছে, জীবগণকে সে ধ্বংসের মুখে নিয়া যাইতেছে, তখন তিনি তাঁহার পরা প্রকৃতির প্রকাশ করেন, যেন, জীবগণ তাঁহার শান্ত, সুশীতল চরণছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে পারে। শ্রীগৌরলীলায় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াই মূর্ত্তিমতী পরা প্রকৃতি—যিনি জীবজগত ধারণ করিয়া আছেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বর পুত্র ছিলেন। তিনি শ্রীমতীকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগত ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া তিনি বিশ্বম্ভর।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই পরা-প্রকৃতি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদ্বারাই জগৎ ধারণ ও পোষণ করিতেছেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, শ্রীমতী কিরূপে স্বীয় প্রাণবল্লভকে জীববল্লভ করিয়া দিয়া তাঁহার জীবগণকে তিনি ধারণ ও পোষণ করিয়া আছেন। আমরা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ারই অংশভূত জীব। তিনিই আমাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু, আমাদের তাহা স্মৃতি নাই বলিয়াই অপরা প্রকৃতি আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে ও আমরা জ্বালা পাইতেছি। সুতরাং, আমরা যদি শ্রীমতীকে প্রভুর সহিত মিলন করাই, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্য দিয়া শ্রীপ্রভুর সহিত মিলিত হইব। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। আমরা বিষ্ণুপ্রিয়ার জীব, ইহা আমরা স্বীকার করি না বলিয়াই দুঃখ। যদি শ্রীমতীকে শ্রীপ্রভুর বামে বসাইয়া তাঁর পাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করিয়া বলি, 'আমি তোমার,' তাহাহইলে সেই সঙ্গেই বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের লইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। আর যদি এই নিষ্ক্রিয় পরমপুরুষকে একক রাখি, তাহা হইলে, অপরা প্রকৃতি আসিয়া আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকিবে। আমাদিগকে এই অপরা প্রকৃতির হাত হইতে উদ্ধার করার নিমিত্তই তিনি পরা প্রকৃতির বিকাশ করিলেন। সুতরাং, হে গৌরভক্তগণ! আপনারা যতই কিছু করেন না কেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বীকার না করিলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবেন। ঐ মুখরা অহঙ্কারাত্মিকা অপরা প্রকৃতিটী আসিয়া আপনাদিগকে অধিকার করিয়া বসিবেন, এবং তাঁহার দাপটে, জ্বালায় ছট্ ফট্ করিবেন, আর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। ইঁহার নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জগতের সারভূতা এই ঘনীভূতা পরাপ্রাকৃতি চিদানন্দ-মূর্ত্তি জীবেরধারণপোষণ-কারিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার শরণাগত হউন। দেখিবেন, যে অপরা প্রকৃতি আপনাকে প্রতি মুহূর্ত্তে জ্বালা দিতেছিলেন, তিনি আপনার অনুকূল থাকিয়া আপনাকে

সুখ দেওয়ার জন্য সতত ব্যস্ত হইবেন। দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার থাকিবে বটে, কিন্তু দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপায় তাহাদের প্রকৃতি বদলিয়া যাইবে, এবং আপনার সুখবর্দ্ধন করিবে।

সমগ্র গৌর-লীলা-সমুদ্র মন্থন করিলে এই নদীয়াযুগল শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াভজনই যে কলির জীবের একমাত্র সারাৎসার ভজন, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। নদীয়াযুগল ভজনই গৌরলীলার সংক্ষিপ্ত সারার্থ। এই কথাটী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামির কথায় বলিতেছি। তিনি বলিলেন—

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনাবিতীর্ণৈ
স্তজ্‌জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥

অর্থাৎ, শ্রীগৌর-সমুদ্র রামানন্দ রায় রূপ ভক্তমেঘে স্বভক্তি-সিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চার করিয়া ঐ রায় রামানন্দ কর্তৃক বর্ষিত সেই সিদ্ধান্ত স্বরূপ অমৃতদ্বারা সিদ্ধান্তজ্ঞানস্বরূপ রত্ন সমূহের আলয় হইয়াছেন।

শ্লোকটীর ভাব একটু প্রণিধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। শ্রীগৌরাঙ্গকে সমুদ্র বলা হইয়াছে, অর্থাৎ, গৌরলীলা অনন্ত, অপার, ও অতল-স্পর্শী। এখানে কৃষ্ণচৈতন্য না বলিয়া গৌর বলা হইয়াছে; তাহার তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রভু যে লীলা করিলেন, তাহা গৌরলীলার অন্তর্ভুত আংশিক লীলা। যাহা হউক, তৃষিত ব্যক্তি সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখিয়া যদি পান করিতে যায়, সে পারিবেনা, তাহার তৃষ্ণা দূর হইবে না। এই জন্য সমুদ্র মেঘে স্বীয় মধুর জল সঞ্চার করিল, এই মেঘ বর্ষিত হইলে সেই জল মধুর হয়। সর্ব্বাবতারতারী শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বতোমুখী লীলাও অনন্ত, অপার; জীব ইহা ধরিতে পারিবে না। এই জন্য, প্রভু রায় রামানন্দের মধ্যে এই লীলার সার সিদ্ধান্ত সঞ্চার করিলেন,

যেন, জীব রায় রমানন্দের অনুগত হইয়া সেই সিদ্ধান্তামৃত পান করিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত কি? না, স্বভক্তি-সিদ্ধান্ত। স্বভক্তি বলিতে কি বুঝায়? যখন গৌরাব্ধি বলা হইয়াছে, তখন স্বভক্তি বলিতে গৌরভক্তিই বুঝাইতেছে। এই গৌরভক্তির পরিপক্কাবস্থাই অবশ্য গৌর-প্রেম। এই ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ শ্রীচরিতামৃতকার পরে বর্ণনা করিয়াছেন—ইহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেম। এই সকলের শেষে সার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' এবং উহা রায়রামানন্দকৃত 'পহিলহি রাগ' গানে প্রকাশ হইয়াছে ও অবশেষে এই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-মূর্ত্তি গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে রাম রায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। এই নদীয়া-যুগল-ভজন ও প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরস আস্বাদনই সার সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে। এই অমৃতই গৌর-সমুদ্র রায় রামানন্দরূপ মেঘে সঞ্চার করিলেন, এবং রাম রায় উহা বিতীর্ণ করিলেন। এই মেঘের বর্ষণে রত্নের উদ্ভব হয় এবং তাহাতেই সমুদ্র রত্নালয় হয়; তদ্রূপ, রায় রামানন্দের মধ্যে প্রভু যে সিদ্ধান্ত সঞ্চার করিলেন, তাহাই তাঁহার মুখনিঃসৃত হওয়ায় এই সিদ্ধান্তের বোধরূপ রত্নের উদ্ভব হইল এবং শ্রীগৌরাঙ্গ এই রত্নের আলয় হইলেন।

কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। শ্রীগৌর-লীলা-সমুদ্র অপার, অনন্ত। গৌর-লীলায় আমরা দেখিতে পাই, প্রভু ভক্তভাবে কঠোর বৈরাগ্য করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহার ভক্তভাব ধরেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে স্বয়ং ভাবে, অর্থাৎ, ভগবদ্ভাবে ভজনা করিবেন না; তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য আদর্শ করিয়া আপনিও ভক্তের কর্ত্তব্য কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করিতে যাইবেন, কিন্তু তাহা কি আপনা-দ্বারা সম্ভব হইবে? প্রভুর বৈরাগ্যের কোটি ভাগের এক ভাগও আপনা দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। আবার, প্রভু রাধা ভাবে, অর্থাৎ, পরিপূর্ণ

আদর্শ ভক্তভাবে গম্ভীরা লীলা করিলেন, তখন তিনি বিরহে ভূমিতে মুখঘর্ষণ করিতেন, তাঁহার রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইত, ইত্যাদি। কোন্ কঠিন প্রাণে আপনি ইহা সহিবেন, ইহা দেখিতে চাহিলে আপনার প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে চাহিবে। সুতরাং গম্ভীরা লীলাও আপনার আদর্শ ও চিত্তাকর্ষক ও ভজনের বিষয় হইতে পারে না। তার পর দেখুন, প্রভু সাতপ্রহরিয়াভাবে, কখন বা ষড়ভূজ বা চতুর্ভূজ মূর্ত্তিতে, কখন বা বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণই ইহা সহিতে পারেন নাই, আপনি আমি কিরূপে পারিব! আর এই ঐশ্বর্য্যই যদি ভজনের বিষয় হইবে, তাহা হইলে আর গৌর অবতারের প্রয়োজন ছিল কি? চতুর্ভূজ, ষড়ভূজ, অষ্টভূজ, অনন্তভূজ চিরকালই ত আছে। তাহার সঙ্গে প্রেম হইবে কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন প্রেমের ভজন দিতে, তবে এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গবস্তুটীকে চিনিতে সুযোগ দিল, এই পর্য্যন্ত। এইটী শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বর ভাব। ইহাও আপনার ভজনের বিষয় হইতে পারে না। তারপর দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ লোকের মধ্যে অপার শক্তি সঞ্চার করিয়া সকলকে নাচাইলেন, কত লোহাকে সোণা করিলেন, কাককে কোকিল করিলেন, পশুকে মানুষ করিলেন, মৃতব্যক্তিকে বাঁচাইলেন আম্রবীজ পুতিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে গাছ করিলেন, ফল ধরাইলেন, সকলকে আস্বাদন করাইলেন, সপ্তভাল বৃক্ষকে মোচন করিলেন, কুষ্ঠরোগীকে মুহূর্ত্তের মধ্যে সুশ্রী করিলেন, ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি বন্য হিংস্র-জন্তুকে কৃষ্ণ নাম কহিয়া নাচাইলেন, এরূপ সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া গৌরলীলায় দেখিতে পাই। আপনি ইহা পারিবেন না। সুতরাং এই শক্তির সাধন করিতে যাওয়া বিফল প্রয়াস মাত্র। ইহার ভজন করিতে যাওয়ায় সুখও নাই। তবে এই অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়া বস্তুটীকে চিনিয়া লউন; তাহাতে আপনার ভজন-নিষ্ঠা

দৃঢ় হইবে। এইরূপে গৌরলীলা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইহা অনন্ত অপার সমুদ্র। সুতরাং ক্ষুদ্র জীব আমরা ইহা ধরিতে অসমর্থ। সেই জন্যই এই গৌরসমুদ্র রামানন্দমেঘে সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চার করিলেন।

মেঘে জল সঞ্চার * করিলে যদি তাহা বর্ষণ না হয়, তাহা হইলে সে সঞ্চারে জীবের কোন উপকার হয় না। তাই প্রভু যে রায় রামানন্দের মধ্যে সিদ্ধান্তামৃত কেবল সঞ্চার করিলেন, তাহা নহে, সেই সিদ্ধান্তামৃত রাম রায়কে দিয়া বিতীর্ণ করিলেন। রাম রায় যদি সেই সব সার সিদ্ধান্ত নিজেই বুঝিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি উপকৃত হইতে পারিতেন, কিন্তু জীবের কিছু উপকার হইত না। সেই জন্য তাঁহাদ্বারা বিতীর্ণ করাইলেন। এখন এই বিতীর্ণ কথার অর্থ ধরুন, এবং, কি ভাবে তাহা বিতীর্ণ করিলেন, তাহা দেখুন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মধ্য লীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের শিরোভাগে এই শ্লোকটী বলিয়াছেন, এবং, ঐ পরিচ্ছেদেই রাম রায় কর্ত্তৃক বিতীর্ণ এই সিদ্ধান্ত সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। বিতীর্ণ করা অর্থ বিস্তার করিয়া বলা। রাম রায় এমন ভাবে পর পর স্তরে স্তরে বিস্তার করিয়া বলিলেন যে, সব সম্যক্-রূপে বিশ্লেষণ করা হইল, যেন জীবের আর দ্বিধা বা সন্দেহ না থাকে। এই বিতীর্ণ কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শ্লোকের আর একটী কথা ধরিতে হইবে, তাহা না হইলে অর্থ পরিস্ফুট হইবে না। সেটী এই—তজ্জ্ঞত্বরত্ন, অর্থাৎ, সেই স্বভক্তিসিদ্ধান্তের জ্ঞান বা অববোধ-রূপ-রত্ন। গৌর-সমুদ্র সেই রত্নের আলয় হইলেন। মেঘের বর্ষণে রত্ন হয়। সমুদ্র সেই রত্নের আলয় হয়, অর্থাৎ, সমুদ্র নিজের জল মেঘরূপে সঞ্চার করিয়া বর্ষণ দ্বারা রত্নের সৃজন

---

* প্রথম পরিচ্ছেদে ঘনশ্যামের বা নরহরি দাসের পদ ব্যাখ্যায় যে বলা হইয়াছে, যে, সমুদ্র পরবশ, নিজে মেঘে জল সঞ্চার করিতে পারে না; সে সমুদ্র প্রাকৃত, আর গৌর-সমুদ্র অপ্রাকৃত, সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র, স্ব ইচ্ছায়ই রামানন্দমেঘে সঞ্চার করিলেন।

করিয়া নিজেই রত্নালয় হয়। প্রভুও স্বভক্তিসিদ্ধান্ত রায় রামানন্দের মধ্যে সঞ্চার করিয়া তাঁহা দ্বারা বিশ্লেষণ করাইলেন, এবং তাহাতে সিদ্ধান্তবোধের সৃজন হইল এবং তিনি নিজেই সেই বোধের আলয় হইলেন।

এই কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। গুরু শিষ্যকে কোন বিষয় শিক্ষা দিলে, তিনি আবার শিষ্যের নিকট হইতে উহা শুনেন, শুনিয়া বুঝেন, শিষ্যের সম্যক্ শিক্ষা হইয়াছে কি না। প্রভুও তাহাই করিলেন। রাম রায়ের মধ্যে স্বভক্তি-সিদ্ধান্ত সঞ্চার করিয়া তাঁহার মুখে উহা শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে, রামানন্দের সম্যক্ শিক্ষা হইয়াছে। এই বোধকেই রত্ন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, রামানন্দের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে সার সিদ্ধান্ত বুঝাইয়াই প্রভু ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহার মুখে উহা আবার শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, রামানন্দের উহাতে বোধ হইয়াছে কি না। যখন প্রভুর বোধ হইল যে, রামানন্দের বোধ হইয়াছে, তখনই প্রভু এই বোধরূপ রত্নের আলয় হইলেন, এবং তখন প্রভু নিশ্চিন্ত হইলেন যে, জীবও এখন এই লীলাসমুদ্র হইতে সারসিদ্ধান্ত-বোধরূপ রত্ন প্রাপ্ত হইব, অর্থাৎ, জীবের এই সিদ্ধান্ত বোধ হইলেই সে তদনুরূপ ভজন করিয়া ধন্য হইবে। এই যে গুরু শিষ্যের কথা বলিলাম, বাস্তবিক কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছে। অষ্টম পরিচ্ছেদটী পড়িয়া দেখুন, দেখিবেন, রাম রায় এক একটী কথা কহিতেছেন, আর প্রভু কোনটী অনুমোদন করিতেছেন না, কোনটী আংশিক অনুমোদন করিতেছেন, কোনটী পূর্ণ, কোনটী পরিপূর্ণ রূপে অনুমোদন করিতেছেন। যাহাহউক, উহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রভু ও রাম রায়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নির্ণয় সম্বন্ধে যে আলাপ হইল, ইহার অবতারণা করিতে যাইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রথমেই ঐ শ্লোকটী বলিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্লোকটীর আশ্রয়ে সিদ্ধান্তনিচয়

বুঝিতে সহজ হইবে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের পূর্ব্বেই তিনি সেই সেই পরিচ্ছেদের বর্ণিত বিষয়ের মোটামুটী ভাবব্যঞ্জক সারমর্ম্ম একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানেও তাই। এই শ্লোকে তিনি বলিলেন 'গৌরাব্ধি'। তিনি 'গৌর' বলিলেন, কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নহে। সুতরাং, এই পরিচ্ছেদে যে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের সারসিদ্ধান্ত বর্ণনা করিতে যাইতেছেন, তাহাও গৌর, অর্থাৎ, এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই 'গৌর'। কেহ কেহ তর্ক করিয়া বলিতে পারেন, কৃষ্ণ বা গৌর বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একই বস্তু, সুতরাং নাম পৃথক্ করিয়া বস্তু পৃথক্ কর কেন? আমরা তর্ক করিতে চাহি না। জ্ঞানের দিক্ দিয়া তত্ত্ব আলোচনা করা এক কথা, রস চর্চ্চা করা আর এক কথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভক্ত। রসশাস্ত্রে তিনি নিপুণ। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যিঁহো কৈলা চৈতন্য চরিত।

ভক্তের মধ্যে তিনি রসিক, এবং তাঁহার গ্রন্থে তিনি রসের বিচার করিয়াছেন। তিনি যেখানে যে শব্দটী দিয়াছেন, তাহা রস-প্রকাশেরই অনুকূল। আর এক কথা। দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধবট নামক স্থানে এক জন বিপ্র নিরন্তর রাম নাম জপ করিতেন, যথা—

সেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়।
রাম নাম বিনু অন্য বচন না কয়॥

কিন্তু প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার কি হইল? তিনিই বলিতেছেন—

তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥

সেই হৈতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে, রাম নাম দূরে গেল॥

সেই বিপ্র নামের মহিমা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে যে শ্লোক পাইতেন, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। প্রভুকে সেই শ্লোক বলিতেছেন—

রাম রামেতি রামেতি রমে! রামে! মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

এইটী পদ্ম পুরাণের কথা। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন যে, সহস্রনামের তুল্য এক রাম নাম। তার পরই তিনি আর একটী শ্লোক প্রভুকে শুনাইলেন, যথা—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ, পবিত্র সহস্রনামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, কৃষ্ণের নাম একবার পাঠে সেই ফল প্রদান করে।

এখন দেখুন, সেই রাম-নাম-জপ-পরায়ণ বিপ্রের মুখেই এই কথা শুনা গেল। ইহা আমার আপনার কথা নহে, শাস্ত্রের কথা, এবং ভক্তের উপলব্ধির কথা। যে যুক্তির বলে এখানে এইরূপ পার্থক্য, সেই যুক্তির বলেই ওখানেও সেইরূপ পার্থক্য। এই ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণের জীবনেই আবার দেখুন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং অবশেষে গৌর ভজন করিলেন। আর এক জন বিপ্র অশুদ্ধ গীতা পাঠ করিতেন। কিন্তু অশুদ্ধ হইলেও তিনি পাঠের সময় কৃষ্ণদর্শন করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ-ভজন ছিল। তিনি অবশেষে গৌর ছাড়া কিছু জানিতেন না। তিনি প্রভুর পায় ধরিয়া বলিলেন—

তোমা দেখি তাহা (কৃষ্ণ) হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি, হেন মোর মনে লয়॥

সেই ভাগ্যবান্ বিপ্রের অবস্থা কি হইল? না—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহা ভক্ত হৈল।

হবে না কেন?

কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে তার মন হইয়াছে নির্ম্মল॥

অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং তর্ক করার প্রয়োজন নাই। রস আস্বাদনের বিষয়, তর্কের গোচর নহে। আপনি যদি কৃষ্ণ বা রাম নামে রস পান, তর্ক না করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া আস্বাদন করুন, দেখিবেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল গৌর আসিবেন এবং এখানে আরো এক অপূর্ব্ব রস পাইবেন। ফল কথা, গৌরলীলায় সকল লীলাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং এখানে সকল রস পাওয়া যাইবে। সে যাহা হউক, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় 'গৌর', ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আসুন, আমরা এই পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি, যাহা রায় রামানন্দ একে একে বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন।

প্রভুর নিকট রাম রায় পাঠ বলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বলিলেন, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, অর্থাৎ, বিষ্ণুভক্তি জীবের সাধ্য, এবং, ইহার প্রাপ্তির উপায় স্বধর্ম্মাচরণ। স্বধর্ম্মাচরণ বলিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বা, জীব যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থার উপযোগী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝায়। প্রভু বলিলেন, "ইহা বাহিরের কথা।" ধর্ম্মের দুইটী দিক্ আছে—বাহির ও অভ্যন্তর। এই 'বিষ্ণুভক্তি' প্রভু বাহিরের কথা বলিলেন। ইহার পর রাম রায় আরো তিনটী স্তরের কথা পর পর ভাবে বলিলেন, যথা—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ; স্বধর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তি। প্রভু ইহাও বাহিরের কথা বলিলেন। প্রভুর উদ্দেশ্য এই, তিনি যখন স্বয়ং আসিয়াছেন, তখন তিনি

আর জীবকে বাহির লইয়া থাকিতে দিবেন কেন ; কৃপা করিয়া হাতে ধরিয়া অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন। শাস্ত্র চিরকালই আছে, মহাজনগণ চিরকালই ত ধর্ম্মের এই বহিরঙ্গ কথা বলিয়া আসিতেছেন। তিনিও যদি তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন, তবে আর তাঁহার স্বয়ং আসায় জীবের লাভ হইল কি! গোলোকের যে গুপ্তসম্পত্তি প্রেম, যাহা প্রভুর নিজস্ব, তাহা তিনি স্বয়ং দিতে আসিয়াছেন। সুতরাং, এই চারিটী স্তরের কথা রাম রায় বলাতে প্রভু বলিলেন, "রাম রায়, এসব বাহিরের কথা বলিয়া আর লাভ কি? ভিতরের কথা বল।" তার পর রাম রায় ক্রমে ক্রমে আর তিনটী স্তরের কথ বলিলেন, যথা (১) জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অর্থাৎ, নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়াস না করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে ভক্তি করা, (২) প্রেমভক্তি, অর্থাৎ, প্রবল ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিলে যেরূপ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে সুখ হয়, তদ্রূপ প্রাণের প্রবল পিপাসা লইয়া বা প্রাণের আবেগে ভক্তি করাই প্রেমভক্তি, এবং, (৩) দাস্যপ্রেম, অর্থাৎ, কিঙ্কর যেরূপ 'কি করিব' বলিয়া করযোড়ে সর্ব্বদা প্রভুর আদেশপালনে রত থাকে, ভগবানের নিকটও ভক্তের এইরূপে দাসভাবে অবস্থান করা ও প্রীতির সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আদেশ পালন করা। এই তিনটী স্তরকে প্রভু বাহিরের কথা বলিলেন না। ইহা তিনি অনুমোদন করিলেন, বলিলেন, "হাঁ, ইহা হয় বটে, কিন্তু আগে আরো বল।" তখন রাম রায় পর পর ভাবে সখ্য ও বাৎসল্য এই দুইটী প্রেমের কথা বলিলেন। প্রভু ইহা কেবলমাত্র অনুমোদন করিলেন, তাহা নহে ; তিনি বলিলেন, "এ উত্তম ; তবে আগে আরো বল।" প্রভু দেখিতেছেন, রাম রায় ক্রমেই সার সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিতেছেন ; প্রভু তাঁহাকে যে পাঠ দিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে সমর্থ হইতেছেন, তখন প্রভু তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "রাম রায়, উত্তম কথা বলিয়াছ। ইহার আগে আরো আছে ; আরো বল।" এই

উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তখন উৎসাহিত হইয়া রাম রায় কান্তা প্রেমের কথা বলিলেন। এই কান্তা প্রেমের মধ্যে তিনি আবার গোপীপ্রেমের বিশেষত্ব বর্ণনা করিলেন। প্রভু ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইলেন ; হইয়া বলিলেন, "ইহা নিশ্চয়ই সাধ্যের সীমা, কেমন হে! নয় কি? কিন্তু, ইহারও আগে নিশ্চয়ই আরো কিছু আছে। তাহাও বল।' শিক্ষক যেমন ছাত্রের নিকট হইতে পাঠ লওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলেন, "ঠিক, ঠিক, তুমি যাহা বলিয়াছ, এই-ই ত সব। তবে—ইহার পর আর কি আছে বল দেখি!" প্রভুও রাম রায়কে ঠিক তদ্রূপ বলিলেন। তাহা না হইলে, এই গোপী প্রেমই যদি ভজনের শেষ সীমা হইবে, তবে প্রভু তাঁহার নিকট আরো শুনিতে চাহিলেন কেন? যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। রাম রায়ও উত্তর করিলেন যে, এই গোপীপ্রেমের মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "বলি হারি!" রাম রায় তখন রাধাপ্রেম বর্ণনা করিলেন—রাসলীলা আস্বাদন করাইলেন। শিষ্যের নিকট হইতে যখন পাঠ লওয়া হয়, তখন গুরুর শিষ্যের মত হইতে হয়। তাই, প্রভু রাম রায়কে কহিলেন, 'রামরায়, তোমার এই সব কথা শুনিয়া আমার রসবস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হইল। কিন্তু, ইহার আগে আরো কিছু আছে ; তাহাও আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে ; যথা—

সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥
এবে জানিল সাধ্য সাধন নির্ণয়।
আগে আরো কিছু শুনিবার মন হয়॥'

প্রভুর কথা শুনিয়া রাম রায় আবার কহিতে লাগিলেন। কহিতে কহিতে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। ভাব, মহাভাব, শ্রীরাধার রূপ, গুণ, প্রণয়মান, প্রচ্ছন্নমান, বাম্য, ধম্মিল্য,

ধীরাধীরাত্ব, রাগ, প্রেম-কৌটিল্য, সুদ্দীপ্ত ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারীভাব, কিলকিঞ্চিত প্রভৃতি ভাব-বিভূষণ, প্রেমবৈচিত্ত্য, ইত্যাদি বলিতে বলিতে নিকুঞ্জ-লীলাবিলাস ও রাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলন পর্য্যন্ত বর্ণনা করিলেন। সব কহিয়া সর্ব্ব শেষে

রায় কহে—কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কাম-ক্রীড়া যাঁহার চরিত॥
রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে॥

অর্থাৎ, ব্রজলীলার প্রেমের ভাণ্ডার রাম রায় একবারে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। প্রভু সব কথা শুনিলেন। শুনিয়া, রাম রায়ের কথা যখন ফুরাইল, নিত্য নিকুঞ্জলীলাবিলাস পর্য্যন্ত বলিয়া রাম রায় যখন থামিলেন, তখন প্রভু কহিলেন, "হাঁ, তুমি যাহা বলিলে, তাহা হয়; কিন্তু, ইহার আগে আরো আছে, তাহা বল।" যথা—

প্রভু কহে—"এহো হয়, আগে কহ আর।"

রাম রায় প্রভুর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। হইবারই কথা। কোথায় অতি পূর্ব্বে যখন তিনি জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি, ও দাস্য প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন, তখন প্রভু ইহাতে বলিয়াছিলেন,

"এহো হয় আগে কহ আর।"

এবং, আবার যখন তিনি ইহার পরে সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের বিষয় বর্ণনা করিয়া আসিতেছিলেন, তখন প্রভু বলিয়াছিলেন, "ইহা উত্তম।" এবং এই কান্তা প্রেমেরও বিভিন্ন স্তরের রসোল্লাসের কথা বর্ণনার সময় প্রভু তাহাতে পরম সন্তোষই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; এবং, এমন কি, প্রভু বলিয়াছিলেন, "রাম রায়, তোমার মুখে অমৃত-নদী প্রবাহিত হইতেছে।" আর, এখন, হঠাৎ প্রভু বলিলেন, "এহো হয়, আগে কহ আর।" সে-ও

আবার কখন? না, রাম রায় যখন নিত্য নিকুঞ্জলীলা-বিলাস বর্ণনা করিলেন, তখন। সুতরাং রাম রায় স্তম্ভিত হইলেন; হইয়া বলিলেন "প্রভু, ইহার পর যে আর বুদ্ধি চলেনা!" যথা -

রায় কহে—"ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর।"

রাম রায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। এ পর্য্যন্ত শুক পাখীর মত সব পাঠ বেশ আবৃত্তি করিতেছিলেন; হঠাৎ প্রভুর এই কথায় থামিয়া গেলেন। কিন্তু, প্রভু তাঁহার মধ্যে যে "স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত" সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাই তিনি চাহিতেছেন। সুতরাং রাম রায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন কেন? তিনি "পহিলহি রাগ" গীতটী গাহিলেন। গাহিবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়া লইলেন, "প্রভু, ইহার পর যে লীলা, তাহা প্রেম-বিলাসবিবর্ত্ত লীলা; তাহা শুনিয়া কি তোমার সুখ হইবে?" রামানন্দ রায়ের এই কথার তাৎপর্য্য এই, এখন রাম রায় এই প্রেম-বিলাসবিবর্ত্ত লীলা যে বর্ণনা করিতে যাইতেছেন, তাহা প্রভুর স্বয়ং লীলা, অর্থাৎ, নদীয়াযুগল-লীলা। আর এ পর্য্যন্ত যে তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রভু ভক্তভাবে আস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। রাধাকৃষ্ণ সেব্য, প্রভু ভক্তভাবে সেবক। সুতরাং রাম রায় যেমন ভক্ত, এবং তিনি ইহা বলিয়া যেমন সুখ পাইতেছেন, প্রভুও সেইরূপ ভক্ত এবং ভক্ত-স্বরূপে তিনি ইহা শুনিয়া সুখ পাইতেছেন। আর এখন যে প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের কথা বলিতে যাইতেছেন, তাহাতে আর প্রভু ভক্ত রহিতেছেন না; তিনি স্বয়ং যে বস্তু, সেই বস্তুই হইয়া যাইতেছেন, সুতরাং, তাঁহার ইহাতে ভক্তোচিত সুখ না হইবারই কথা। আর ইহাও হইতে পারে, এই নদীয়াযুগলের লীলা বিলাসের কথা বলিলে প্রভুর নদীয়ার কথা মনে পড়িবে; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বিরহে কিরূপ কাঙ্গাল ভাবে নিশিদিন অঝোর নয়নে কাঁদিয়া কাটাইতেছেন, এই সব কথা মনে হইলে প্রভু হয় ত বিরহে বিহ্বল হইবেন, এবং, এমন কি, মূর্চ্ছা

যাইবেন। তাই, রাম রায় বলিলেন, "প্রভু, এই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত লীলার কথা শুনিয়া কি তোমার সুখ হইবে?" ফল কথা এই, রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া রাম রায় বলিয়াছিলেন বটে, যে, ইহার পর আর তাঁহার বুদ্ধির গতি চলে না; কিন্তু, প্রভু এই যুগল-লীলার পর তাঁহার হৃদয়ে নদীয়াযুগল প্রকাশ করিলেন, এবং রাম রায় দেখিলেন, ইহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত রস, এবং, প্রভু যে কি বস্তু, তাহা চিনিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে, যদিও বাহ্যতঃ প্রভু সন্ন্যাসী, এবং যদিও বাহিরে তাঁহার হ্লাদিনী নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রেম-বিলাসের অভাব দেখা যায়, তথাপি ইঁহাদের নিত্য লীলাবিলাস চলিতেছে। রাম রায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম জানিতে না পারেন, না জানুন, তিনি দৃশ্যটী দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে নদীয়ার রাজা, এবং নদীয়ার রাণী যে তাঁহার সহিত নিত্য মিলিত, এবং এতদুভয়ের প্রেম-বিলাস-লীলা যে আরো অপূর্ব্ব রসায়ন, তাহা তিনি বুঝিলেন। সে যাহা হউক, রাম রায় ঐ গীতটী গাহিলেন, এবং সত্য সত্যই প্রভু প্রেমে স্বহস্তে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন, আর গাহিতে দিলেন না। ঐ গীতটীতে নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার পূর্ব্বরাগ বা গৌরাঙ্গের সহিত মিলনের পূর্ব্বাবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। মিলনের পর যে লীলা বিলাস হইয়াছে, প্রভু আর তাহা বর্ণনা করিতে দিলেন না। *

রাম রায়ের সহিত প্রভুর যে দিন মিলন হয়, সে দিন সারাটী রজনী ঐরূপ প্রেমালাপে কর্ত্তিত হয়। দ্বিতীয় রজনীতেও আবার কৃষ্ণকথা হইল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে যখন উভয়ে মিলিত হইলেন, তখন

* রায় রামানন্দ কৃত এই গীতটীর ও এই পদের ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ ভাগে (২৬৭—২৭০ পৃঃ) এবং আমাকর্ত্তৃক গ্রন্থিত নদীয়াযুগল গ্রন্থে (১৫ পৃঃ—৭১ পৃঃ) দেওয়া হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া লইলে অর্থ পরিস্ফুট হইবে। পুনরুক্তি ও গ্রন্থ-বিস্তৃতি-ভয়ে এখানে আর ঐ ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

কিয়ৎকাল কৃষ্ণ কথার পর রাম রায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "প্রভু, তুমি কি বস্তু, তাহা হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছ; বাহিরে কিছু বলিতেছ না। বাহির অন্তর যদি এক করিয়া দিতে, অর্থাৎ, অন্তরে যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছ, বাহিরেও এই চক্ষে যদি সেই রূপে দর্শন দাও, এবং শ্রীমুখে যদি ইহা স্বীকার কর, তবে আমি সংশয়-বিহীন হই, এবং নিশ্চিন্ত হইয়া আমার প্রাণের আরাধ্য বস্তুর ভজন করিয়া ধন্য হইতে পারি।" প্রকৃত পক্ষে রায় রামানন্দের কোন সংশয় ছিল না। তবে পরবর্ত্তী জীবের ভজনের সুবিধার নিমিত্ত তিনি এই ভঙ্গী করিয়া প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। রাম রায় যখন একান্ত হইয়া ধরিলেন, তখন প্রভু আর কি করেন! তিনি হাসিয়া "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" অর্থাৎ, নদীয়া-যুগল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ারূপ দেখাইলেন। রসরাজ ও মহাভাব দুইটী বস্তুই দেখাইলেন। রসরাজ বস্তুটী কি? না, শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরবিগ্রহ; এবং মহাভাব বস্তুটী কি? না, গৌরবর্ণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ। রসরাজ অর্থ রসের রাজা; ইনি একমাত্র শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। ইনি যখন সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে, অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তিতে জীবের নিকট প্রকাশিত হন ও জীবকে রসের ভজনে অধিকার দেন, তখন তিনি রসরাজ এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি মহাভাব, কারণ, তাঁহারই আশ্রয়ে জীব রসের ভজনের ভাব প্রাপ্ত হয়, যেহেতু, তিনি সেই রসরাজকে প্রেমের পূর্ণ আদর্শ ভজন করিয়া জীবকে দেখান, কিভাবে রসরাজকে ভজন করিতে হয়। জীব সেই পূর্ণ আদর্শ ভজন করিতে পারে না, তবে হ্লাদিনী শক্তি বা মহাভাবস্বরূপার অনুগত হইলে স্ব স্ব পরিমাণ বা অধিকার অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হয় ও ভজনরস আস্বাদন করে। সুতরাং, রসরাজ বলিতে কেবল মাত্র শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায় না, এবং মহাভাব বলিতেও কেবল মাত্র তাঁহার হ্লাদিনী

শক্তি শ্রীমতী রাধাকে বুঝায় না। এই শ্রীনন্দনন্দন যখন শচী-সুত হইলেন, তখন তিনি রসরাজ, এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশত নামে শ্রীগৌরাঙ্গকেই বলা হইয়াছে "রসরাজমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন।" শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি যেমন দ্বিধা বিভক্ত, যথা—ঐশ্বর্য্যময়ী ও মাধুর্য্যময়ী, তন্মধ্যে পূর্ণ মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধাই মহাভাব, সেই রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হ্লাদিনীও দ্বিধা বিভক্ত, লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, তন্মধ্যে পূর্ণ মাধুর্য্যময়ী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই মহাভাব। রাম রায় যে রসরাজ মহাভাব দুইটী বস্তু দর্শন করিলেন, ইঁহারাই নদীয়াযুগল শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, ইহাই বুঝিতে হইবে; কারণ, এইরূপ দর্শন করিবার পূর্ব্বে রাম রায় বলিয়াছিলেন, প্রভু হে, তুমি

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

আবার প্রভুও রাম রায়কে 'রসরাজ মহাভাব' যুগল মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া শেষে বলিলেন—

গৌর দেহ, নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন।

অর্থাৎ, আমি গৌরাঙ্গ, আমি যে হ্লাদিনীর সহিত লীলা বিলাস করি, তিনি শ্রীরাধা নহেন, যেহেতু

গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্য জন।

অর্থাৎ, শ্রীরাধা শ্রীগোপেন্দ্র-সুত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সহিত লীলাবিলাস করেন না। ইহাকেই বলে প্রেমৈকনিষ্ঠা। এই সকলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রথমখণ্ডে ও নদীয়াযুগলগ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর আবার শ্রীপ্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীরাধার ভাবে নিজকে সম্পূর্ণ ভাবিত করিয়া আছি এবং এই ভাবে নিজমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেছি; যথা—

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ-মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥

শ্রীরাধার ভাব প্রেম। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়; কিন্তু শ্রীরাধা শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী, এবার শ্রীগৌরাঙ্গ শুদ্ধ মাধুর্য্যময় হইলেন, এবং নিজ-মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিলেন ও জীবকে করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে কহিলেন যে, তিনি এবার শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার অর্থই এই যে, তিনি এবার অসুর-সংহারাদি ঐশ্বর্য্যলীলা না করিয়া প্রেম দিয়া জীবের হৃদয় শোধনরূপ মাধুর্য্যলীলাই করিলেন। এই বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে অলোচনা করা হইয়াছে।

আর একটী কথা দেখুন। তাহা হইলে কথাটী আরো পরিস্ফুট হইবে। রায় রামানন্দ মূচ্ছিত হইলে প্রভু তাঁহাকে চেতন করাইয়া আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন—

মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥

এখানে কথাটা বলিতেছেন গৌরাঙ্গ, সুতরাং, 'মোর তত্ত্ব লীলারস' বলিতে গৌরতত্ত্ব, গৌরলীলারস, বুঝাইতেছে। প্রভু আবার কি বলিতে-ছেন শুনুন—

তোমার ঠাঁই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম॥

এখানে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন তাঁহার নিজের কথা, অর্থাৎ, স্বয়ং লীলার কথা, ভক্তভাবের কথা নহে। 'আমার' বলিতে 'গৌরাঙ্গের' বুঝায়।

ঐ যে উপরে 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' বলাতে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝাইল, ইহাতে রূপ অর্থ বর্ণ হয়। ইহাতে কোন এক ব্যক্তি একটু তীব্র আক্রমণ করিয়াই আমাকে বলিলেন, 'রূপ অর্থ বর্ণ হয় না, যেহেতু

ইহা শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধানে নাই! সুতরাং আপনি এই অর্থ পাইলেন কোথায়?' তিনি একজন পণ্ডিত লোক; সুতরাং আমি আর কি বলিব! শব্দকল্পদ্রুম একখানি অভিধান। অভিধানে পণ্ডিতেরা স্ব স্ব অভিজ্ঞতানুসারে যে শব্দের যে প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বাহিরেও অনেক স্থলে অনেক প্রয়োগ আছে। যথা—বাসু ঘোষ বলিতেছেন—

গৌররূপের কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিতবাণ সোণা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥ ইত্যাদি।

এখানে 'রূপ' অর্থ 'বর্ণ'। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের দোহাই দিয়া রূপ অর্থ এখানে কান্তি বা কমনীয়তা বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে বাসু ঘোষের ঐ মধুর পদের অর্থই বিকৃত হইয়া যায়। কালো রূপ বলিতে কেহ কালো কান্তি বুঝে না; সকলে কালো বর্ণই বুঝে।

বাসু ঘোষ কষিত কাঞ্চনের সহিত গৌর 'রূপের' তুলনা দিতে চাহিলেন আর প্রেমদাস বলিলেন

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ-পুঞ্জ গঞ্জি গৌরবরণ।

এখানে প্রেমদাস বলিলেন, গৌরবর্ণ প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ-পুঞ্জকে পরাভব করে। প্রেমদাস গৌরবর্ণের সহিত সুবর্ণের তুলনা করিতে যাইয়া 'বর্ণ' শব্দ প্রয়োগ করিলেন, আর, বাসু ঘোষও এতাদৃশ তুলনা করিতে যাইয়া 'রূপ' শব্দ প্রয়োগ করিলেন। সুতরাং বাসু ঘোষের উপরি উক্ত গৌররূপের বর্ণনায় 'রূপ' অর্থ কি বর্ণ নয়? নরহরি সরকার ঠাকুরও এইরূপ পদ দিতেছেন, যথা—

অপরূপ রূপ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া।

সরকার ঠাকুরের আর একটী পদ দেখুন

মজিলুঁ গৌর পিরীতে সজনি
মজিলুঁ গৌর পিরীতে।
হেরি গৌররূপ জগতে অনুপ
মিশিয়া রৈয়াছে জগতে॥
অতসী কুসুম কিম্বা চাঁপা শোণ
হরিল গৌরাঙ্গ রূপ। ইত্যাদি

অর্থাৎ, এই সকল ফুল—অতসী, চাঁপা, শোণ, গৌরাঙ্গের 'রূপ' হরণ করিয়া লইয়াছে, এখানে 'রূপ' অর্থ যে বর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য; এজন্য শব্দকল্পদ্রুম অভিধান খুঁজিতে হইবে না।

চন্দ্রশেখর বলিতেছেন—

গৌর বরণ হেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি ভেল।

অর্থাৎ, গৌরবর্ণ হেরিয়া বিজুরী লজ্জায় গগনে যাইয়া বাস করিল। আর বাসুঘোষ কহিলেন—মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপমা। একই তুলনায় চন্দ্রশেখর ব্যবহার করিলেন 'বর্ণ', আর বাসুঘোষ ব্যবহার করিলেন 'রূপ'। এই 'রূপ' ও 'বর্ণ' যে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

একজন পদকর্ত্তা (ভুবনমোহন) হরিদ্রা, হরিতাল, হেম-কমলদল, কিম্বা থির বিজুরীর সহিত গৌর 'রূপে'র তুলনা করিয়াছেন, অর্থাৎ, হরিদ্রার সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়া তিনি 'রূপ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, আর ঠাকুর লোচন দাস এইরূপ স্থলে 'বর্ণ' শব্দ প্রয়োগ করিরাছেন; যথা—

হলুদ বাটিতে গৌরী বসিলা যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ প'ড়ে গেল মনে॥

সুতরাং এখানেও যে 'রূপ' ও 'বর্ণ' একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার যে নদীয়াযুগলের স্বরূপ দেখাইতে যাইয়া বলিলেন—রসরাজ মহাভাব দু-ই একরূপ, এখানেও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে 'রূপ' শব্দ 'বর্ণ' অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট রূপে বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গই পরতত্ত্ব। এমন কি, তিনি ইহা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজলীলা করিলেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গেরই একটি বিলাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি প্রথমেই বলিতেছেন—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং।
বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

অর্থাৎ, কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, মূর্খ ব্যক্তিও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদে শাস্ত্র দেখিয়া ব্রজবিলাসি তদ্রূপের বিনির্ণয় করিতেছে। 'তদ্রূপস্য' অর্থ তস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য রূপং স্বরূপং তস্য, অর্থাৎ, এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করা হইতেছে। এই পদের বিশেষণ হইল 'ব্রজবিলাসিনঃ।' ইহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন যে, যে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজধামে কৃষ্ণরূপে লীলাবিলাস করিয়াছেন, সেই পরতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরই স্বরূপ বর্ণনা করা হইতেছে। এইরূপে অশেষ শাস্ত্রদর্শী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশচীনন্দন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকেই কলিযুগে জীবের পরমোপাস্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গম্ভীরা লীলা।

প্রভু নীলাচলে গম্ভীরা লীলায় রাধাপ্রেমের গভীরতা জীবের নিকট প্রকট করিলেন। প্রভু নিজে রাধা হইলেন, এবং কৃষ্ণ-বিরহ-রস নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে আস্বাদন করিতে সুযোগ দিলেন। এই ভাবে তিনি জীবকে ব্রজে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বহুলোকের ইহাতে ব্রজরসই উপভোগ্য হইল। প্রভু ইহা অবশ্য ভক্তভাবে করিয়াছেন, কারণ, শ্রীরাধা পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গে ভগবদ্‌ভাব ও ভক্তভাব এই দুই ভাবের পরিপূর্ণ সমাবেশ দেখিতে পাই। তাই তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণমিলিততনু বলা হয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গে এই ভক্তভাব বা রাধাভাব ধরিয়া ব্রজরস আস্বাদন করিতে লুব্ধ হইলেন, তাঁহাদের নিকট আর গৌরাঙ্গের স্বয়ংলীলা বা নাগরলীলা রহিল না; তাঁহারা প্রভুর কাঙ্গাল ভাব দেখিয়াই সুখী, প্রভুকে তাঁহারা নদীয়ায় ফিরাইয়া আনিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রভুর এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আশ্রয় করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাইবার জন্য সমুৎসুক। কিন্তু, যে গৌর তাঁহাদিগকে এই রাধাকৃষ্ণ দিলেন, ব্রজমাধুরী আস্বাদন করাইলেন, সেই গৌরকেই তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। গৌরাঙ্গ হইলেন সাধন, রাধাকৃষ্ণ হইলেন সাধ্য। গৌরাঙ্গ তাঁহাদের নিকট গুরুর আসনে রহিলেন। ভজনের ও উপভোগের বিষয় হইলেন না। রাধাকৃষ্ণ গৌর হইলেন বটে, কথায়ও তাঁহারা গৌরাঙ্গকে স্বয়ং ভগবান্ বলেন বটে, কিন্তু তিনি সেব্য হইলেন না।

আবার, বহু ভক্ত রহিলেন, তাঁহারা গৌর ছাড়া কিছু জানেন না। মহাপ্রভূর পরিকরের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর ভক্ত। গদাধর ত প্রভুকে স্পষ্টই বলিলেন—

কোটী গোপীনাথ-সেবা ত্বৎপদ দর্শন।

কুলীন গ্রামবাসী বসু রামানন্দেব একার কথা ত দূরে থাক্,

যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে।

ভক্ত-প্রধান শ্রীবাস ও তাঁহার তিন ভাই এবং পরিবারস্থ সকলে গৌর ছাড়া 'নাহি জানে দেবী দেবা।' সেন শিবানন্দের ত কথাই নাই। তিনি গৌরমন্ত্রেই দীক্ষিত। অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুত গৌর ছাড়া কিছু জানিতেন না; এবং, এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।

অদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরালীলার ঐ হৃদয়বিদারক দৃশ্য সহিতে না পারিয়া প্রভুকে বিদায়ই দিলেন, বলিলেন, 'প্রভু, তুমি গোলোকের বস্তু গোলোকে চলিয়া যাও। ব্রজপ্রেমে জগত ভরপুর হইয়া গিয়াছে, আর ধরেনা। এখন তুমি গোলোকের নিত্য যুগল গোলোকে বিরাজ কর।" বাসুদেব সর্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি ভক্তগণের কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইঁহারা গৌরনাগরের উপাসক। আর, নরহরি, বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ, নয়নানন্দ, শেখর রায় প্রভৃতি ভক্তগণের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাঁহারা নাগরীভাবে ভজন করিতেন; এবং নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছ ছাড়া করিতে তাঁহাদের প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে চাহিত। ইঁহাদের বহু নাগরী পদ আছে। নিতাই ত নগরে নগরেই বলিয়া বেড়াইতেন—

যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

এইরূপে দেখা যায়, পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৌরভজন করিতেন, এবং, ইহাতেই তাঁহারা সকল রস আস্বাদন করিতেন—ব্রজরস তাঁহারা এইখানেই পাইতেন। তাই, কোন ভক্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন—

ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধারে।

বলিবেনই বা না কেন? যেমন দেখিলেন, তেমন বলিলেন। তবে যে গোস্বামীগণ বৃন্দাবনলীলারস বিস্তার করিলেন, তাহা কেবল প্রভুর আজ্ঞাক্রমে। তাহার কারণ এই, ভক্তি ও প্রেম তখন জীবের অধিগম্য ছিল না। ব্রজপ্রেম না বুঝাইলে শ্রীগৌরাঙ্গকে জীব ধরিতে পারিবে না। তথাপি গোস্বামীগণ সেই রাধাকৃষ্ণ-কথার মধ্যে গৌরকথা কহিতে ছাড়েন নাই। আর এদিকে শ্রীমদনমোহনও কবিরাজ গোস্বামীকে দিয়া সুবৃহৎ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী গৌরাঙ্গেরই লীলামৃত বর্ণনা করিলেন। এমন কি, তিনি গৌরভজনের কথা এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, পূর্ব্বে যেরূপ জরাসন্ধ আদি রাজগণ বেদধর্ম্ম করিতেন ও বিষ্ণুপূজা করিতেন, তথাপি কৃষ্ণ মানিতেন না বলিয়া তাঁহারা দৈত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, ধর্ম্মবিহিত সকল কর্ম্ম করিলেও যে গৌরভজন না করে, তাহাকে অসুরের মধ্যে গণিতে হইবে; যথা—

পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য করি জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাসীবুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন॥

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, শাস্ত্র বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামীর কিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য। শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি স্থানে স্থানে তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়াছেন। এখানেও তিনি তন্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিলেন—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

অর্থাৎ, জ্ঞানদ্বারা মুক্তি লাভ হয়; যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মদ্বারা ভুক্তি বা পার্থিব ঐশ্বর্য্যভোগ লাভ হয়; কিন্তু, হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও সুদুর্লভ।

ভক্তি ও প্রেম কেবল কৃপাসাপেক্ষ। এই প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নির্ব্বিচারে যারে তারে বিলাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলেন যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত, অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥

এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন॥

এখানে দুইটী কথা লইয়া বিচার করা যাউক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার ঐ যে উপরে তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন, তাহাতে বলিলেন, সহস্র সহস্র সাধনেও ভক্তি ও প্রেম পাওয়া যায় না। ওখানে 'সাধনের' কথা বলা হইয়াছে। আর, তিনি উপদেশ দিলেন কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গকে 'ভজন' করিবার জন্য। এখানে 'সাধন' ও 'ভজন' দুইটী কথা পৃথক্। 'সাধন' বলিতে দূরবর্ত্তী ও দুষ্প্রাপ্য কোন বস্তুকে পাওয়ার নিমিত্ত আত্মশক্তির বিশেষ চেষ্টা বুঝায়। ইহাতে আত্মাভিমান আছে। সুতরাং অভিমানের কাছে সেই সুদুর্ল্লভ বস্তু সুদুর্ল্লভই থাকিয়া যায়। আর, 'ভজন' বলিতে ভগবৎ-সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহাকে ভক্তি সহকারে সেবা করা বুঝায়; ইহাতে আত্মনিবেদন আছে সুতরাং, ভজনে ভগবান্ ধরা দেন ভক্তের নিকট তিনি সুলভ হইয়া পড়েন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'ন সাধয়তি মাং যোগঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ, যোগ, তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, আর, কথায়ও বলে, তিনি মায়াতীত, জ্ঞানাতীত, কিন্তু ভক্তাধীন। এই ভক্তি ও প্রেম কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গই জীবকে অবিচারে দান করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাকেই ভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর কৃপায় আমরাও ইহা সহজে বুঝিতে পারি যে, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহাকে আমার কোন চেষ্টা, কৌশল বা প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা পাওয়া অসম্ভব। তাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা ও অবলম্বন। শ্রীগৌরাঙ্গই এই কৃপাময় অবতার। যাঁহারা কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মবলে তাঁহাকে পাইতে চাহেন, অর্থাৎ, সাধনাসহস্র করিবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহারা অসুর-শ্রেণীভুক্ত। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় দেখিতে পাই, রাবণ, মহীরাবণ সাধন করিয়া রাক্ষস হইলেন, অর্থাৎ, আত্মাভিমানের পোষণ করিতে করিতে আত্মগ্রাসী হইলেন। আর, হনুমান্ শুধু ভক্তিবলে কত দুরুহ কার্য্য সহজে সমাধা করিলেন,

এবং, ঐ রাক্ষসকে নিধন করিলেন। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সকলে এই সুদুর্লভ ভক্তি পায় নাই ; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে রাম ও কৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আর, এই কলিযুগ-পাবনাবতার প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যারে তারে ভক্তি দান করিয়াছেন। সুতরাং, তিনিই আরাধ্য, তিনিই সেব্য, তিনিই একমাত্র ভজনীয়। ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সার সিদ্ধান্ত।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী তদানীন্তন সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ পরম পণ্ডিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রেমের যে গূঢ় রহস্য গোবিন্দ-ভজনকারী ভক্তগণও প্রাপ্ত হয় নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই প্রেম নামের সহিত জীবকে বিলাইয়াছেন ; আমি সেই গৌরচন্দ্রকে ভজনা করি।" যথা—

> যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যান-যোগৈ
> বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
> গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
> ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্॥

অর্থাৎ, যে প্রেমরহস্য কর্ম্মনিষ্ঠগণ প্রাপ্ত হন নাই, তপ, ধ্যান, যোগ দ্বারা যাহা সমধিগত হয় নাই, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তত্ত্ব-জ্ঞান, স্তবস্তুতি দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় নাই, যাহা তর্কশাস্ত্রের কখন গোচর হয় নাই, এবং, এমন কি, গোবিন্দ-প্রেম-ভজন-কারিগণও যাহার আস্বাদন পান নাই, পরম পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অবতীর্ণ হওয়ায় সেই নিগূঢ় প্রেমসম্পত্তি নামের সহিত জীবের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব, আমি সেই শ্রীগৌর-চন্দ্রকে নমস্কার করিতেছি।

এইখানে শ্রীল সরস্বতী মহোদয়ের আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন—

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্‌ যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নবং বয়ঃ শ্রিয়শ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌর-গোপী-পতিঃ ॥

অর্থাৎ, এই ধন্য কলিকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রকট লীলা ভজন না করেন, তিনি উন্নত কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহাতে ধিক্, তাঁহার বাগ্মিতায় ধিক্, তাঁহাদের যশে ধিক্, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যে ধিক্, তিনি যদি দ্বিজ হন, তবে সে দ্বিজত্বেও ধিক্, আর যদি বিমল আশ্রমাবলম্বী হন, তবে তাহাতেও ধিক্।

শ্রীল প্রবোধানন্দের এই কথার বিস্তৃত অর্থ নিস্প্রয়োজন। মোট কথা, প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ—মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং, গৌরলীলা এই প্রেম আস্বাদনের একমাত্র বিষয়, এবং, শ্রীগৌরাঙ্গই প্রেমদাতা, এই প্রেম প্রাপ্তিই যাহার না হইল, তাহার সকলই নিস্ফল। দেহ লইয়াই কুল, বাগ্মিতা, অধ্যয়ন, ধনৈশ্বর্য্য, দ্বিজত্ব,আশ্রমাদির অভিমান, ইত্যাদি। আর, প্রেম বিশুদ্ধ আত্মার ধর্ম্ম। এই প্রেম না পাইলে দুর্লভ মনুষ্য দেহ ধারণ করাই বৃথা।

সরস্বতী প্রবোধানন্দ কৃপা পাইলেন কাশীধামে বসিয়া। সেখান হইতে প্রভুর নিদেশক্রমে চলিয়া গেলেন শ্রীবৃন্দাবন ধামে, এবং সেখানেই শেষ সময় পর্য্যন্ত বসতি করিলেন। স্থূলদেহে তিনি কখন শ্রীনবদ্বীপ ধামে যান নাই। কিন্তু, তথাপি তাঁহার ভজনের বিষয় ছিল শ্রীনবদ্বীপ ধাম ও শ্রীনদীয়া লীলা। থাকিতেন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কিন্তু ভজন করিতেন শ্রীনবদ্বীপের। তিনি কি বলিতেছেন শুনুন—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।

নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎ সবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥

অর্থাৎ, মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপু কষিতকাঞ্চন-কান্তি লীলাময় শ্রীগৌরসুন্দর যে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং যে নবদ্বীপের প্রতিগৃহ ভক্তিপূর্ণ উৎসবময়, বৈকুণ্ঠ হইতেও পরম মধুর সেই নবদ্বীপ ধামে আমার মন রমণ করিতেছে।

এখন দেখুন, সেই অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিকুল-তিলক সরস্বতী প্রবোধানন্দ কি সার সিদ্ধান্ত জীবকে জানাইলেন। স্বীয় ভজনের কথা বলিয়া জীবকেও তিনি এই মধুরাতিমধুর উন্নতোজ্জ্বলরস-পূর্ণ নবদ্বীপ-লীলা ভজন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। যেমন মহাপ্রভু, তেমন তিনি মহাপ্রেমদাতা। তাই, সরস্বতী মহোদয় প্রভুর বিশেষণ দিলেন—'মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ।'

প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌর-প্রেম-রসার্ণবে এতই ডুবিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আর শাস্ত্রের কচ্‌কচি করিতে ভালবাসিতেন না। যুক্তি তর্ক তিনি ভেককোলাহল মনে করিতেন। তাই তিনি বলিতেছেন—

যত্তদ্ বদন্তু শাস্ত্রাণি যত্তদ্ ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ।
জীবনং মম চৈতন্যপাদাম্ভোজ-সুধৈব তু ॥

অর্থাৎ, শাস্ত্র-সমূহ যাহা ইচ্ছা বলুক, তার্কিকগণ যাহা ইচ্ছা ব্যাখ্যা করুক, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম-সুধাই আমার জীবন, ইহাই আমার সার সর্ব্বস্ব।

তিনি জীবগণকে ইঙ্গিতে বলিলেন, "ভাই সব, শাস্ত্র আর কত পড়িবে? পড়িয়াই বা কি জানিবে? আমি ত আর কম পড়ি নাই! যুক্তি তর্কই বা আর কত করিবে? করিয়াই বা লাভ হইবে কি? তাহাতে পাইবে কি? আমি ত আর কম করি নাই! জীবন ভরিয়াই ত

এই করিলাম, এবং এই অসার পাণ্ডিত্যের গুণেই ত আমাকে সকলে সন্ন্যাসীর রাজা বলিয়া মানিত! কিন্তু তাহাতে আমার লাভ হইয়াছিল কি? আমি তাহাতে কেবল মরিয়া ছিলাম! আর, এখন গৌরপাদপদ্মসুধা পাইয়া আমি জীবন পাইয়াছি। তোমরাও যদি সেইরূপ জীবন পাইতে চাও, তবে গৌর ভজন কর, গৌরপাদপদ্মসুধা আস্বাদন কর।"

স্বরূপ দামোদরও গৌর নাগর ভজন করিতেন। নাগররূপই তাঁহার ধ্যানের বিষয় ছিল। প্রভুর সন্ন্যাস তিনি ভাল বাসিতেন না। সেইজন্যই প্রভু যখন সন্ন্যাস লইতে নদীয়ার বাহির হইলেন, তখন, তিনিও রাগ করিয়া কাশী যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ভাবিয়াছিলেন, প্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তি আর দর্শন করিবেন না—কোন এক নির্জ্জনস্থলে বসিয়া প্রভুর নাগররূপ ধ্যান করিতে করিতে ও নদীয়া-লীলা আস্বাদন করিতে করিতে দেহপাত করিবেন। কিন্তু, প্রভু তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। প্রভুর গম্ভীরালীলা করিতে হইবে—রাধাপ্রেমের গভীরতা জীবের গোচর করিতে হইবে, স্বরূপ তাহার সহায় হইবেন। এই জন্য প্রভু তাঁহাকে অকর্ষণ করিয়া আনিলেন। স্বরূপ দামোদর প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া বিরহ-জনিত হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিতেন বটে—না দেখিয়া তিনি পারিতেন না, কারণ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ রক্ষার ভার একমাত্র তাঁহার উপর; কিন্তু, তাঁহার প্রাণের আরাধ্য বস্তু ছিল নদীয়া-নাগর। তিনি সত্য সত্যই গৌরগতপ্রাণ ছিলেন। গৌর ছাড়া তাঁহার আর কোন ভজন পূজন ছিল না। তাই, প্রভু যখন জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে মিশিয়া গেলেন, স্বরূপ দামোদরেরও তখন বুক ফাটিয়া প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল—তিনি ধরাধাম ছাড়িয়া গেলেন। গম্ভীরালীলার আশ্রয়ে ব্রজ-ভজন করাই যদি স্বরূপ দামোদরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি গৌরবিরহে এইরূপ চলিয়া যাইতেন না।

এখানে প্রভুর গম্ভীরালীলার নিগূঢ় রহস্য একটু আস্বাদন করিব। অনন্ত অপার শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাম্বুধি। শ্রীগৌরাঙ্গের এই ভাব-বারিধিতে কখন্ কোন্ ভাবের তরঙ্গ খেলা করিত, একমাত্র স্বরূপ দামোদরই তাহা অবগত ছিলেন। তাই, তিনি ভাবানুরূপ কথা কহিয়া, বা শ্লোক বলিয়া, অথবা কীর্ত্তনের পদ গাহিয়া প্রভুর ভাবের অনুকূলে চলিতেন, ও তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। রথ-যাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইতেন। প্রভু তাঁহার কীর্ত্তন-খেলার সহচরগণকে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেন, আর, ভক্তগণের ত কথাই নাই। বৎসরান্তে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণেশ্বরকে পাইয়া—যাঁহার সহিত মিলনের জন্য, যাঁহার ক্ষণেকের জন্যও দর্শনের নিমিত্ত তাঁহারা তিন সপ্তাহ ধরিয়া পথ বাহিয়া চলিয়া আসিতেন, এবং পথশ্রম-জনিত কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না, সেই প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে পাইয়া ভক্তগণ আনন্দে আর থই পাইতেন না। এই পরমানন্দের ফলে তুমুল কার্ত্তন-তরঙ্গ সমুত্থিত হইত। সেই গৌরাঙ্গ, সেই নদীয়ার ভক্তগণ, সেই মিলনানন্দ, সেই 'হরিবোল' ধ্বনি, কখন বা সেই 'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণায়' কীর্ত্তন, সেই মৃদঙ্গ-শব্দসুধা, সেই বাহুতুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য, সেই প্রেমে টলটলায়মান সকলের দেহ, সেই সকলের মুখে মধুর হাসি, নয়নে আনন্দ-ধারা; তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মনে একটী বিষাদ আসিয়া জাগিত, কার্ত্তন করিতে করিতে তিনি থমকিয়া যাইতেন; তিনি ভাবিতেন—

সেই আমি, সেই প্রিয় ভকত নিচয়,
সেই ত কীর্ত্তন এই বড় মধুময়!
নদীয়া-বিহারে মোর তবু মন ধায়,
কাহার প্রেমেতে মোরে ঐছন নাচায়!

কোথা মোর শচীমাতা, কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া!
কোথা মোর সুরধনী, সাধের নদীয়া!

অন্তরে প্রভু এই ভাবে গড় গড়। বাহিরে তিনি এই ভাব-ব্যঞ্জক একটী শ্লোক পড়িতেন। শ্লোকটী কাব্য প্রকাশের। কাব্যপ্রকাশ কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ নহে। সাহিত্য হিসাবে শ্লোকটীতে রসের বিচার। শ্লোকটী এই

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতঁব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এখানে সাধারণ নায়ক নায়িকার মিলনের কথা বলা হইতেছে। শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই, নায়ক নায়িকা মিলিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু, ইহাতে তেমন সুখ হইতেছেনা; তাহাদের মন চিরাভ্যস্ত নিভৃত রেবানদীর তীরস্থ বেতসী কুঞ্জে মিলনের জন্য ধাবিত হইতেছে।

বাহিরে এই শ্লোকে সাধারণ নায়ক নায়িকার মিলনের কথা বলা হইতেছে বটে, কিন্ত ইহার অন্তর্নিহিত দুইটী ভাব, এবং,সেই দুই ভাবে প্রভু ভক্তগণকে রস বিলাইতেছেন—একটী ভক্ত ভাবে, অপরটি স্বয়ং ভাবে বা ভগবদ্‌ভাবে। ভক্তভাবে প্রভু শ্রীরাধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, এ মিলন-মাধুরীতে রস আছে বটে, কিন্তু, ইহা ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত, সেই জন্য তাঁহার মন যমুনাপুলিনস্থিত নিভৃত নিধুবনে মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এই হইল ভক্তভাবে। আর স্বয়ং ভাবে বা ভগবদ্‌ভাবে তিনি শ্রীরাধা নহেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ—শচীমার স্নেহের পুত্তলী, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ। নদীয়ার সেই প্রিয়ভক্তগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, এবং সেই কীর্ত্তন-রাসের রস আস্বাদন হইতেছে, এবং, সেই প্রাণোপম ভক্তগণের সহিত মিলনে

শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিতও মিলনের রস কথঞ্চিৎ আস্বাদন করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মন সেই সুরধুনীতীরে সাধের নদীয়া ধামে শ্রীশচীমার অঙ্গনে ধাবিত হইতেছে। প্রভু ভাবিতেছেন, যে শচীমার স্নেহে ও শ্রীমতীর প্রেমে তিনি সব কীর্ত্তন-সহচর পাইয়াছেন, সেই শচীমা কোথায়, সেই বিষ্ণুপ্রিয়া কোথায়? নদীয়ার প্রত্যেক লীলাস্থলী, প্রতিগৃহ, প্রত্যেকের স্নেহ ভালবাসা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল। শচীমার স্নেহে ও শ্রীমতীর প্রেমে নদীয়ায় তিনি কি অপার সুখের সাগরে ভাসিতেছিলেন, এবং আপনা হারা হইয়া ভক্তগণকে নিয়া কি পরমানন্দে বিহার করিতেছিলেন, সেই সব সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। ভাবিতে ভাবিতে, শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া যে বিরহ-আগুণে জ্বলিতেছিলেন, তাহা মনে হইত; তাঁহাদের বিরহ-বেদনার বিনিময়ে যে তিনি রাজা প্রতাপরুদ্র বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অথবা রায় রামানন্দ, কিম্বা দাক্ষিণাত্যে অগণিত ভক্ত পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেই দুঃখ প্রশমিত হইত না। এইরূপে তিনি শচীমার স্নেহে ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমে বিকল হইতেন, এবং অন্তরে অন্তরে ভাবিতেন, নদীয়ার ভক্তগণ যেন তাঁহাকে নদীয়ায় ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছেন এবং তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশচীমার কাছে গমন করিতেছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রভু ভক্তগণকে নীলাচল হইতে বিদায় দেওয়ার কালে বলিয়া দিতেন, "আমি নদীয়ায় তোমাদের সহিত নিত্য বিহার করিব, শচীমার কাছে আমি নিত্য বিরাজ করিব; মাকে এই কথা কহিও; ইত্যাদি।"

এই ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর কাব্য প্রকাশের ঐ যে শ্লোক কহিতেন, একমাত্র স্বরূপ দামোদর তাহার গভীরার্থ বুঝিতেন। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে একবৎসর রথ-যাত্রার সময় শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ গোস্বামী আসিলেন। তিনি প্রভুর মুখে ঐ শ্লোক শুনিয়া তদনুরূপ একটী

শ্লোক লিখিলেন। প্রভু ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পাইলেন। শ্লোকটী এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

ঐ যে উপরে কাব্য প্রকাশের শ্লোকে সাধারণ নায়ক নায়িকার ভাব বর্ণিত হইয়াছে, উহার অন্তর্নিহিত দুইটী নিগূঢ় ভাব রহিয়াছে, উপরে তাহা বলা হইল। উহার প্রথম ভাবটী প্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে বৃন্দাবন হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিয়া সেই ভাবানুরূপ একটী শ্লোক করাইয়া জীবের নিকট প্রকাশ করিলেন ; আর, দ্বিতীয় ভাবটী শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের নিকট কথা কহিয়া ও শ্রীমতীর জন্য সাড়ী প্রেরণ করিয়া জীবের গোচর করিলেন।

প্রভুর প্রত্যেক লীলারই বাহ্য ও অন্তর দুইটী দিক্। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কণ্টকনগর হইতে নিতাইচাঁদ যখন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে বৃন্দাবনভ্রমে শান্তিপুর ফিরাইয়া আনিলেন, এবং শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে যখন নদীয়াবিনোদ বিলাস করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র কীর্ত্তন করিলেন—

'কি কহব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর!
চির দিনের মাধব মন্দিরে মোর॥

শ্রীঅদ্বৈত গৌরছাড়া কিছু জানেন না। শ্রীঅদ্বৈতের কৃষ্ণ-বিষ্ণু সবই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। অদ্বৈতের অন্তরের ভাব এই, তিনি চির দিনের গোরাচাঁদ স্বীয় গৃহে পাইয়াছেন। প্রভু যে কণ্টকনগরে গিয়াছিলেন, সেই তিন চার দিনের বিরহ যেন তাঁহার কত যুগ বলিয়া বোধ হইয়াছে।

সেই যুগযুগান্তের বিরহের পর তিনি আজ প্রাণবল্লভকে পাইয়াছেন, সুতরাং, তাঁহার আর আনন্দ ধরেনা। এই কীর্ত্তনের পদে যে 'মাধব' বলা হইয়াছে, ইহাতে কৃষ্ণকে না বুঝাইয়া গৌরাঙ্গকেই বুঝাইতেছে। কারণ, শ্রীঅদ্বৈত গৌরাঙ্গের মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে ভজন করিতেন না। তিনি গৌরাঙ্গসুন্দরকেই ভজন করিতেন। আচার্য্য এই পদ গাহিয়া কি করিলেন? না,

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু, হুঙ্কার, গর্জ্জন॥

আচার্য্যচন্দ্রের আনন্দের আর অবধি নাই। প্রেমে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইলেন। এই প্রেমোন্মাদে তিনি

ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।

আবার পর মুহূর্ত্তেই

আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন॥

বড় ব্যগ্রতাসহকারে, অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীআচার্য্য কহিলেন, 'প্রভু হে! প্রাণের বল্লভ আমার! ও আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব!

অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া।

কিন্তু, আজ বড় ভাগ্যবলে তোমায় আমি গৃহে পাইয়াছি। আমি আর তোমায় ছাড়িয়া দিবনা। যথা পদ

ঘরেতে পাঞাছি এবে, রাখিব বাঁধিয়া॥

প্রেমের বন্ধন বড় বন্ধন। অদ্বৈত প্রভু যে তাঁহার প্রেমাস্পদের উপর এইরূপ জোর করিবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এখন, এখানে প্রশ্ন এই, উপরের ঐ কীর্ত্তনের পদে 'সখি' না বলিয়া 'ভাই' বলিলেই ত হইত, এবং 'মাধব' না বলিয়া 'গৌরাঙ্গ' বলিলেই ত চলিত। তাহা হইলেই ত অদ্বৈত প্রাণে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং কার্য্যতঃ আচরণেও যাহা করিয়াছিলেন, বাক্যেও তাহাই প্রকাশিত হইত।

অন্তরে তিনি ভাবিলেন এক রকম, আর বাহিরে বাক্যে প্রকাশ করিলেন অন্য রকম। ইহার হেতু কি? আমরা সর্ব্বত্রই বলিয়া আসিতেছি, প্রভুর দুইটী ভাব—ভগবদ্‌ভাব ও ভক্তভাব। ভগবদ্‌ভাবে তিনি উপাস্য, ভক্তভাবে তিনি উপাসক। ভগবদ্‌ভাবে অপরে তাঁহাকে ভজন করিয়া আনন্দ পায়। ভক্তভাবে তিনি নিজে ভজন করিয়া আনন্দ পান, ও ভজনপ্রণালী জীবকে প্রদর্শন করেন। উপরে যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অন্তরের ভাব বর্ণনা করা হইল, উহাতে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র প্রভুকে ভগবদ্-ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু, ভক্তভাবে প্রভু তখন কৃষ্ণ-বিরহ-রস আস্বাদন করিতেছেন, এই জন্যই তিনি বিরহ-বিধুরা অবলার ন্যায় যোগিনী হইয়া বাহির হইয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি অপরকে গৌর-বিরহ-রস অস্বাদন করাইয়া মিলন ও সম্ভোগ-জনিত পরমানন্দ অস্বাদন করার সুযোগ দিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উপরিউক্ত ঐ কীর্ত্তনে এমন ভাবে পদ সন্নিবেশিত হইল, যেন অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নিজের ভাবে আস্বাদন করিতে পারেন, এবং যেন উহা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরও ভক্ত-ভাবের অনুকূল হয়। সেই জন্যই 'ভাইরে' না বলিয়া 'সখিরে' এবং 'গৌরাঙ্গ' না বলিয়া 'মাধব' বলা হইয়াছে।

এইরূপ প্রভুর প্রত্যেক লীলাই বিশ্লেষণ করিলে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইটী দিক্ দেখিতে পাই। অনন্ত ভাব-ব্যঞ্জক পরম গম্ভীর প্রভুর গম্ভীরালীলারও বাহ্য ও অন্তর দুইটী দিক্। বাহিরে তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভোর; উহাই শ্রীরূপগোস্বামীর 'সোঽয়ং প্রিয়ঃ' শ্লোকে প্রকাশ, আর, অন্তরে তিনি শ্রীশচীমা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে বিহ্বল, তাহা তাঁহার নিজের শ্রীমুখের কথায় ও কার্য্যে প্রকাশ, যথা, তিনি বলিলেন—শ্রীবাসের অঙ্গনে তিনি প্রত্যহ নৃত্য করেন, শ্রীশচীমার নিয়ড়ে তিনি নিত্য বিরাজ করেন, এবং, এমন কি, তিনি শ্রীমতীর জন্য সাড়ী পর্য্যন্ত প্রেরণ করিলেন।

প্রায় চারি মাস পর্য্যন্ত প্রভু নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দকে লইয়া নীলাচলে বিহার করিতেন বটে, কিন্তু, তাহা যেন শূন্য প্রাণে—শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে সবই যেন শূন্য বোধ হইত। নীলাচলে সমুদ্রটী বড় উপভোগের সামগ্রী। সমুদ্র-তটে বসিলে অপার অনন্ত নীলাম্বুরাশি. বীচিমালার মধুর ক্রীড়া ও গভীর গর্জ্জন, আর উপরে সুবিস্তীর্ণ নীল নভোমণ্ডল, সকলই ভাবহীনের মনেও মধুর ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়; ভাবুকের ত কথাই নাই। আর, সেই ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, যিনি নদীয়ায় সুরধনীতীরে সহচরবৃন্দ লইয়া ক্রীড়া করিতেন, ও তরঙ্গমালা দর্শন করিয়া তাহার মধ্যেই কত শোভা, কত মাধুর্য্য উপভোগ করিতেন, সুরধুনীতে অবতরণ করিয়া ভক্তগণকে লইয়া কত জলক্রীড়া করিতেন, সেই রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর্ নদীয়াবাসী ভক্তগণকে নীলাচলে পাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বড় একটা উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনায় পাইনা। ভক্তগণকে সুখ দেওয়ার জন্য তিনি নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করিয়াছেন বটে, কিন্তু তা-ও ঐ চার মাসের মধ্যে ক'দিন? কেবল গুণ্ডিচা মার্জ্জনের সময়। আর, এই নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া সুরধুনীতে জলক্রীড়ার মত তত আনন্দময় হয় নাই। নবদ্বীপে অনেক সময়ই সুরধনীতীরে বসিয়া ভক্তগণকে লইয়া কৃষ্ণকথা কহিতেন, আর, নীলাচলে কৃষ্ণকথা কহিতেন তাঁহার ঐ নিভৃত,নিঝুম,নিবাত,নিস্পন্দ গম্ভীরা কুঠুরীতে বসিয়া। নবদ্বীপে ছিল গৌরাঙ্গসুন্দরের চটুল চাহনি, প্রফুল্ল আনন, রসব্যঞ্জক কথা; আর, নীলাচলে হইল প্রভুর স্থির নেত্র, কখন উত্তান নয়ন, বিষণ্ণ গম্ভীর বদন, গুরুগম্ভীর উপদেশপূর্ণ বাক্য। মোটকথা, নবদ্বীপে তিনি ছিলেন নাগর বনোয়ারী,আর,নীলাচলে হইলেন তিনি পাপতাপহারী। নবদ্বীপ প্রেমের ধাম, আর, নীলাচল ভক্তির ধাম। যাঁহারা রসের ভজন চাহেন, তাঁহাদের নিকট ঐ নদীয়ানাগরস্বরূপই ধ্যেয়; আর, যাঁহারা

পাপ-ক্লেদে ক্লিন্ন, তাঁহরা ঐ নাগররূপ লৌকিক করিয়া মানিবেন ও তাহাতে সুখ পাইবেন না ; সেই সব কঠিন জীবের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দ্বাদশ-বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে নীলাচলে গম্ভীরা লীলা করিলেন, যেন, ইহা দেখিয়া জীবের অশ্রুজলে পাপমলিনতা বিধৌত হইয়া যায়, ও অবশেষে রসের ভজনে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

যে চারি মাস গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে থাকিতেন, সেই চারি মাস তাঁহাদের সঙ্গ পাইয়া প্রভু শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-জনিত ব্যথা কতক পরিমাণে ভুলিতেন বটে, এবং, ভক্তগণ ব্যথা পাইবেন ভয়ে বিরহ-বেদনা চাপিয়াও রাখিতেন। কিন্তু, যখন ভক্তগণ গৌড়দেশে চলিয়া যাইতেন, তখনই তাঁহার বিরহ-আগুণ দ্বিগুণিত হইত, এবং, তখন হইতেই তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিতেন। স্নান, সেবা, নীলাচলচন্দ্রের দর্শন প্রভৃতি নিয়মিত দৈনন্দিন কার্য্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সব সময়ই তিনি বিরহ-সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। সেই শ্রীনন্দনন্দন, সেই ব্রজ পরিকর, সেই ভাব, সেই প্রেমের বিকাশ। সেই সময় সমুদ্রতটে দ্বারকাপুরে অসুর নিধনান্তে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তিনি রাধাপ্রেম স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেন, রুক্মিণী বা সত্যভামা বা তাদৃশ কোন মহিষীই তাঁহার সেই দুঃখ দূর করিতে পারিতেন না ; অবশেষে, এক দিন রুক্মিণীর অনুরোধে রোহিণীদেবী শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া বর্ণনা করিবার সময় দৈবে কৃষ্ণ উহা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া তিনি রাধা-বিরহে মূর্চ্ছিত হইলেন, তাঁহার চক্ষুঃ, নাক বিস্ফারিত হইল, হাত পা পেটের মধ্যে গেল, এবং অবশেষে রাধা-প্রেমের গভীরতা জীবের গোচর করিবার জন্য নীলাচলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বারা এই মূর্ত্তির প্রকাশ করিলেন। এই হইল জগন্নাথ মূর্ত্তি, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ইঁহাকে জামাতারূপে ভজন করিবার অধিকার পাইলেন। আর, বর্ত্তমান যুগে সমুদ্রতটে, হরিনাম দিয়া

জীবোদ্ধার কার্য্য সমাপনান্তে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলপুরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ স্মরণ করিয়া তিনি অঝোরনয়নে ঝুরিতেন, এবং নদীয়াবাসী ভক্তগণ রথযাত্রার সময় আসিলে বিরহ-দুঃখ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইত বটে, কিন্তু তাঁহারা নবদ্বীপে চলিয়া গেলে পর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে প্রভু মূর্চ্ছিত হইতেন, হাত পা পেটের মধ্যে যাইত, তিনি কুর্ম্মাকৃতি হইয়া যাইতেন, কখন অস্থিসন্ধি এক এক বিতস্তি প্রমাণ ফাঁক হইয়া যাইত, রোমকূপে রক্তোদ্গম হইত, ইত্যাদি, এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমের গভীরতা জীবের গোচর করিবার নিমিত্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে দিয়া এই দৃশ্যটী অঙ্কিত করাইয়া রাখিলেন। ওখানে যেমন বাহিরে লোকে দেখিল হস্তপদ-বিহীন বিস্ফারিত-নয়ন জগন্নাথ, আর, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকেই দেখিলেন—নবীন নাগর,ভুবনমোহন, এবং, এমন কি, তাঁহার জামাতা ; এখানেও তেমন গম্ভীরার মধ্যে যে চিত্রটী কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইল, তাহা বাহিরে কুর্ম্মাকৃতি, কখন বা সন্ধি-বিহীন অদ্ভুত সুদীর্ঘ কলেবর, ইত্যাদি, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই নবীন নাগর রসরাজ নদীয়াবিনোদ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, তিনি সেই সনাতন মিশ্রের চির জামাতাই রহিলেন, সেই শচীনন্দন, বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ, নদীয়ানাগর রহিলেন, এবং, এই গম্ভীরার ফলেই নদীয়ানাগর বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ভজন আজ কাল চতুর্দ্দিকে বহুল প্রকাশিত হইয়াছে। এই গম্ভীরালীলা করিয়াছিলেন বলিয়াই জীব শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিনিল, এবং নদীয়াযুগল ভজন করিতে সুযোগ পাইল, ও, পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম, তাহা পাইয়া দুর্লভ মানবজন্ম সফল করিল।

পঞ্চম অধ্যায়

নদীয়ায় মহাগম্ভীরা

প্রভু তাঁহার স্বীয় তত্ত্ব ও লীলা প্রচার করার জন্য শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতে কাহাকেও আদেশ দিলেন না বটে, কিন্তু, তিনি স্বীয় লীলার স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য এবং নদীয়ার লীলামাধুরী জীবকে আস্বাদন ও উপভোগ করাইবার নিমিত্ত একটী চির জীবন্ত জাগ্রত দৃশ্য রাখিয়া দিলেন। ইনিই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। মহাপ্রভু নীলাচলে গম্ভীরালীলা করিলেন—রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবময়ী শ্রীরাধা হইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-রস আস্বাদন করিলেন ও জীবকে করাইলেন;—ইহা হইল ভাবে, অর্থাৎ, বাহিরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, অন্তরে ভাব-দেহে তিনি শ্রীরাধা। আর, নবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া মহা গম্ভীরালীলা প্রকাশ করিলেন—সত্য সত্যই মহাভাবময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরবিরহে ডুবিলেন, এবং নিজে এই রস আস্বাদন করিয়া জীবগণকে আস্বাদন করিতে সুযোগ দিলেন। এখানে রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ রসরাজই রহিলেন। নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ বহিরঙ্গ ভাবে ভক্ত বা আরাধক হইলেন, আর, নবদ্বীপে তিনি স্বয়ং ভগবান বা আরাধ্য রহিলেন। একই সময় তিনি দুইটী গম্ভীরালীলা করিলেন, অর্থাৎ, বিরহের গভীরতা প্রকাশ করিলেন—একটী নীলাচলে কাশীমিশ্রের আলয়ে, আর একটী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীদেবীর আলয়ে—প্রভুর নিজ অন্তঃপুরে। নীলাচলের গম্ভীরালীলা দ্বারা, শ্রীরাধা যে মহাভাবময়ী, এবং চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যে শ্রীরাধার মহাভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ও শ্রীরূপ গোস্বামী যে তখন উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ভাব, মহাভাব প্রভৃতি বিস্তৃত করিয়া বলিতেছিলেন, তাহার সত্যতা প্রমাণ করিলেন। আর,

শ্রীনবদ্বীপের মহাগম্ভীরালীলাদ্বারা, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যে মহাভাবময়ী, এবং সেই মহাভাবের অনুগত হইয়া রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকেই যে কলিকালে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা দেখাইলেন। নীলাচলের গম্ভীরালীলা প্রধানতঃ শিক্ষার নিমিত্ত, আর নদীয়ার গম্ভীরালীলা ভজনের নিমিত্ত। যেহেতু প্রভুকে একবার গম্ভীরালীলায় দর্শন করিলে পরে তাঁহাকে সেখানে সেই দীন হীন বেশে কাহারও রাখিতে ইচ্ছা হইবে না; আর, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নদীয়ায় বিরহ-বিহ্বলা কাঙ্গালিনী বেশে দেখিলে রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গকে নীলাচলের গম্ভীরা হইতে ঝটিতি আনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলন করাইতে প্রাণের সাধ হইবে; তখনই নদীয়া-যুগল-ভজন আরম্ভ হইবে। নীলাচলের গম্ভীরালীলা দ্বারা ব্রজলীলা, ও নদীয়ার গম্ভীরালীলা দ্বারা নদীয়ার যুগল-লীলা-মাধুরী জীবকে ধরাইলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শাস্ত্রগ্রন্থে ও ভজনে যে রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা প্রকাশ করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নালাচলে গম্ভীরালীলা দ্বারা তাহা মূর্ত্তিমান্ করিলেন; আর, গৌড়ীয় ভক্তগণ যে নদীয়ায় নিত্য মধুর লীলার ভজন করিতেন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়ায় গম্ভীরালীলা দ্বারা তাহা মূর্ত্তিমান্ করিলেন। এখন কথা হইল এই, যাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করিবেন, তাঁহারা শ্রীরাধার বিরহ বা কৃষ্ণের মাথুর লীলা আস্বাদন করিয়া রাধাকৃষ্ণ যুগলসেবায় সুখ পাইবেন; প্রভুকে আর দ্বিতীয়বার গম্ভীরায় রাখার প্রয়োজন হইবে না। এবং যাঁহারা নদীয়ার মধুর ভজন করিবেন, তাঁহারা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-রস আস্বাদন করিয়া স্বতঃই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলসেবা করিয়া ধন্য হইবেন; প্রভু ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর গম্ভীরালীলায় দ্বিতীয়বার দেখিতে হইবে না। অতএব, হে কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণ! চলুন আমরা এখন একবার গৌড়ীয় ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে লইয়া নদীয়ার গম্ভীরালীলায় প্রবেশ করি, এবং দেখি, নদীয়ার রাজরাণী, শ্রীগৌরাঙ্গের

বক্ষোবিলাসিনী, শচীমায়ের স্নেহের পুত্তলী, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কি ভাবে নিশিদিন কাটাইতেছেন।

মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে প্রভু সন্ন্যাস লইলেন। বিরহের দাবদাহে শ্রীমতীকে দহিয়া দহিয়া মাঘ মাস অতীত হইল। প্রথম কয়েকদিন বিরহের জ্বালা অতি তীব্র হইলেও * শেষের কয়দিন শ্রীমতী মনকে প্রবোধ দিতে পারিয়াছিলেন। যিনি প্রেমের আস্পদ, তাঁহার সুখবাঞ্ছা করাই প্রেমের ধর্ম্ম। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন জানিলেন যে, তাঁহার প্রাণের পরম প্রিয় বস্তুটী এখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে রহিয়াছেন, এবং যখন দেখিলেন, শ্রীশচীমা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সেখানে যাইতেছেন, তখন তিনি এই ভাবিয়া প্রবোধ পাইলেন যে, প্রভু এখানে ইঁহাদের স্নেহ-প্রীতিতে আর সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিবেন না। সকলেই তাঁহার শয়ন, ভোজন ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। সকলেই প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিবেন। বিশেষতঃ শচীমার কাছে আর তাঁহার স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। তবে তিনি নিজে সেবা করার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, তাহার জন্য তিনি বড় একটা ভাবিলেন না। ভগবান্ ব্যতীত সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু আত্মসুখ-বাঞ্ছা আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শান্তিপুর আসিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিলেন, কেহ বা ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, কেহ বা দর্শনসুখ আশায়, কেহ বা পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত। এই যে সকলে গেলেন, শ্রীমতীর দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিলেন না। শ্রীমতী সকলের দিকে চাহিলেন, চাহিলেন বলিয়াই আপনার বুকের ধন সকলকে দিলেন, শ্রীমতীই সকলকে ভবপারের উপায় করিয়া দিলেন, কিন্তু,

* প্রভুর সন্ন্যাস লীলা পাঠকগণ কৃপা করিয়া শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থ হইতে পড়িয়া লইবেন।

শ্রীমতীর কথা কেহ বড় একটা ভাবিলেন না, কেহ বা ভাবিলেন, সে-ও ক্ষণেকের তরে। শ্রীমতী একাকিনী কাঙ্গালিনী বেশে নদীয়ায় শূন্য গৃহে পড়িয়া রহিলেন। তিনি জীবের এই অকৃতজ্ঞতা লইলেন না, এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া যে একটু আত্মসুখ অনুভব করিবেন, সে বাঞ্ছা তাঁহার হইল না। বরং ভাবিলেন, তবু জীব উদ্ধার হউক। প্রভু বলিয়া গিয়াছেন, আমার নয়নজলে জীবের কল্যাণ হইবে, জীব উদ্ধার হইবে। সুতরাং, আমি তাহা লইয়াই থাকি। এইরূপ আত্মসুখের লেশমাত্র না থাকা একমাত্র ভগবান্ ও তাঁহার পূর্ণ হ্লাদিনী শক্তিতেই সম্ভব। এখন ভাবুন, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বস্তুটী কি !

মাঘ মাস অতীত হইল। শচীমা নিমাইকে নীলাচলে বিদায় দিয়া শান্তিপুর হইতে বাড়ী ফিরিলেন। আসিতে আসিতে পথে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি বলিয়া তিনি বউমাকে প্রবোধ দিবেন। তিনি নিজেই তাঁহার নিমাইকে নীলাচলপুরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন, অনুমতি দেওয়ার সময় যদিও মনে কতক প্রবোধ পাইয়াছিলেন, কিন্তু, বিদায় দেওয়ার পর ত আর তিনি নিজেই এখন তেমন প্রবোধ পাইতেছেন না, আর, বউমাকে কি বলিয়া বুঝাইবেন ! তাঁহার বউমা ত প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করিয়া গণিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে কাঞ্চনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি ঈশানকে দিয়া সংবাদ লইতেছেন, দোলা আসিতে দেখা যায় কি না। এ অবস্থায় শ্রীমতীকে নীলাচলে যাওয়ার সংবাদ দিলে কি জানি কি এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া বসে, ইহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি শূন্য নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন।

শচীমা এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অনেক দুঃখভার সহিয়াছেন। এই যে তাঁহার অন্ধের যষ্টি নিমাইচাঁদ তাঁহার বুকে শেল মারিয়া চলিয়া গেলেন, শেলের উপরে শেল—গৃহে নব-যৌবনা পুত্রবধূ রাখিয়া—ইহাও তিনি

সহিলেন। তিনি ভাবিতেছেন, "যদি আমি ধৈর্য্যহারা হই, বউমা আমার প্রাণে মরিবে। আমি অনেক সহিয়াছি, না হয় এটীও সহিলাম, কিন্তু বউমার আমার কাঁচা বয়স, এই বয়সে তাহার ইহা অসহনীয় হইবে। এখন ইহার রক্ষার ভার ত আমার উপর।" এই ভাবিয়া শচীমা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অতি ধীরে দোলা হইতে নামিলেন। নামিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—কাঞ্চনা! ও কাঞ্চনা!

কাঞ্চনা—মা! এই যে! কি সংবাদ!
শচীমা—বউমা কোথায়?
কাঞ্চনা—এই যে এখানেই আছে।

শ্রীমতীর, ব্যপার কি, বুঝিতে আর বাকী রহিল না। প্রভু যে আসেন নাই, শচীমার কণ্ঠেই তাহা তিনি বুঝিয়াছেন। শচীমা অগ্রসর হইয়া প্রভুর প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখেন, বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া অধোবদনে রহিয়াছেন, আর অবিরল ধারে কান্দিতেছেন। পরিধানে মলিন বসন। এই যে প্রভু ছাড়িয়া যাওয়ার রজনীতে তিনি যে কাপড়খানি পরিয়াছিলেন, এবং যাহা পরিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্কে বসিয়াছিলেন, সে কাপড়খানি আর তিনি ছাড়েন নাই। উহারই অঞ্চল পাতিয়া কখন তিনি মাটিতে শয়ন করিয়াছেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছেন, অশ্রুজলে ভূমি কর্দ্দমাক্ত হওয়ায়, বস্ত্রখানিও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, আবার শ্রীঅঙ্গে থাকিয়াই উহা আপনা আপনি শুকাইয়াছে। প্রভু গিয়াছেন পর হইতে এই প্রায় পনর দিন পর্য্যন্ত আর তাঁহার স্নান আহার নাই। কাজেই অতিশয় মলিন বস্ত্রে তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি আবৃত। শ্রীমতা ভাবিলেন, প্রভুই যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি আর কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিবেন না, বা এ মুখ কাহাকেও দেখাইবেন না; তাই, তিনি

অধোবদনে অবগুণ্ঠনাবৃত রহিয়াছেন ; আর তাঁহার পৃষ্ঠে বেণী দুলিতেছে, সে-ও ধূলি-ধূসরিত, এই সেই বেণী,যাহা প্রভু যাইবার রাত্রিতে তিনি নিজে শ্রীহস্তে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই বেণী এখন ধূলায় ধূসর, অর্দ্ধ খোলা। ভূষণাদি প্রভু যেখানে যেটী বিন্যস্ত করিয়া সাজাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা সেই ভাবেই রহিয়াছে। একবার ভাবিয়াছেন, "প্রভু যখন ছিন্নবস্ত্র ও কন্থা ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি আর কোন্ সাধে এই বসন ভূষণ পরিয়া রহিব! আমিও তাঁহারই মত যোগিনীর বেশ লইব।" আবার ভাবিলেন, 'না, এ-ত প্রভু দিয়া গিয়াছেন! ইহার উদ্দেশ্য এই, প্রভু আবার আসিবেন! তিনি আসিয়া যদি আমাকে এই ভাবে না দেখেন, তবে তিনি প্রাণে বড় ব্যথা পাইবেন।' ইহাই ভাবিয়া তিনি সেই বসন, সেই ভূষণ, সবই রাখিয়াছেন। অথবা, ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য বসন ভূষণ শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে আপনা হইতেই রহিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহা কেহ কল্পনা মনে করিবেন না! শাস্ত্রে বলে, ছত্র, চামর, পাদুকা, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি প্রভুর সেবার যাবতীয় সামগ্রীই নিত্যানন্দের অংশ বা শক্তি-বিশেষ। এই যে শ্রীমতার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ, ইহা প্রভুরই সেবার সামগ্রী। প্রভু শ্রীমতীর অঙ্গে ইহা দেখিয়া প্রীত হন ; তাই, তিনি নিজে তাঁহাকে সাজাইয়া দিয়াছেন। নিত্যানন্দের প্রাণ নদীয়াযুগল, তিনি এই যুগল মিলন ভালবাসেন। তিনি শান্তিপুর পর্যান্ত প্রভুকে আনিয়া শচীমার সহিত মিলন করাইয়াছেন, এবং, তাঁহার মনের সাধ, প্রভুকে শ্রীনবদ্বীপে আনিয়া যুগলমিলনও করাইবেন। তাই, তাঁহারই শক্তি বসন ভূষণাদিও সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শচীমা বউমাকে দেখিয়া অতি কষ্টে নয়নজল সম্বরণ করিলেন। যিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নন্দিনী, ত্রিলোকের মধ্যে যাঁহার ভাগ্যের অবধি নাই, যিনি নদীয়ার রাজ-রাজেশ্বরী, যিনি ভক্তগণের নিত্য বন্দিতা,

তাঁহার এ হেন মলিন কাঙ্গাল বেশ দেখিয়া শচীমার প্রাণ বাহিরিয়া যাওয়ার কথা ; কিন্তু, অতি কষ্টে তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিলেন, সে কেবল বউমার জন্যই।

বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; করিয়া মনে মনে নিবেদন করিলেন, "মা, ত্রিজগতে এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই।' শ্রীমতী আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না ; কেবল নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শচীমাও তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন, লইয়া স্বীয় অঞ্চল দ্বারা তাঁহার নয়নজল মুছাইয়া শ্রীমতীকে বুকে করিলেন, এবং, তিনিও কান্দিতে কান্দিতে মনে মনে শ্রীমতীকে এই কথা বলিলেন, 'আমারও মা, তুমি ছাড়া ত্রিজগতে এখন আর কেহ নাই।' এখন উভয়ে উভয়ের অবলম্বন হইলেন। শচীমার নয়নমণি বিষ্ণুপ্রিয়াই এখন তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে অন্ধের যষ্টি হইলেন। আবার, এই বিরহ-ব্যথিতা নবীনা বালাকে শচীমা-ই বিরহ-সমুদ্র হইতে রক্ষা করিয়া রাখিতেন। শচীমার প্রাণের সাধ, বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া নিমাইচাঁদ নিত্য ঘরকন্না করুন। আর, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণের সাধ, প্রভু শচীমার কাছে নিত্য বিরাজ করুন ; তিনি যদি ইহাতে অন্তরায়স্বরূপও হন, তবে তিনি তজ্জন্য সরিয়া যাইতে প্রস্তুত। কৃপাময় ভক্তগণ! আপনাদের কি ইচ্ছা নয় যে, প্রভু, শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া এই দুইটী দেবীর বিশুদ্ধ আত্মসুখবিবর্জ্জিত বাসনা পূর্ণ করেন ; এবং এই বাসনা পূর্ণ করার জন্যই কি তিনি নিত্য শচীর আলয়ে বিরাজ করিতেছেন না!

প্রভুর নীলাচলে যাওয়ার কথা শুনিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার আর বাকী রহিল না।

ফাল্গুন মাস আসিল। এই সময় শ্রীমতীর বিরহ-আগুণ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। শ্রীমতী সখীর নিকট বলিতেছেন।

সজনি, সুন্দর গৌর-কিশোর।
রসময় সময় জানি করুণাময়
এবে ভেল নিরদয় মোর ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত কানন মধুকর গাওন
পিককুল ঘন ঘন রোল।
গৌর-বিরহ-দাব- দাহে দগধ হাম,
মরি মরি, করি উতরোল ॥
মৃদু মৃদু পবন বহই চিত্ত-মাদন
পরশে গরলসম লাগি।
যা কর অন্তরে বিরহ বিথারল,
সো জগমাঝে দুঃখভাগী ॥

শ্রীমতী বলিতেছেন, 'সখি হে, বসন্ত সময় উপস্থিত। ঐ দেখ বিহগকুল যুগল হইয়া বিচরণ করিতেছে। ঐ শোন, ভ্রমরনিকর মধুর ঝঙ্কারে গান করিতেছে। আমার কাণে যেন ইহা বজ্রের ন্যায় লাগিতেছে। মৃদু মন্দ পবন আমার গায়ে বিষ বর্ষণ করিতেছে। সখিরে, আমি ত নাথ-বিহনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতেছি। প্রাণ-বল্লভ আমার নবীন কিশোর, চির-সুন্দর, রসময় নাগর। তাঁহার ত সবই সুন্দর, সবই রসের কার্য্য। তবে কেন, সখি, এই রসের সময় বসন্তকাল আসিতেছে জানিয়াও তিনি আমার প্রতি এমন নির্দ্দয় হইলেন ! ইহাতে তাঁহার কি রসের নিদর্শন হইল !'

ইহা বলিতে বলিতে শ্রীমতীর মনে হইল, তিনি একাই ত এই বিরহ-দাবদাহে দগ্ধ হইতেছেন না ! তিনি যেমন বল্লভের সহিত মিলন আশা করিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভও সেইরূপ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। উভয়েই বিরহে তুল্য কাতর। তবে এই বিরহ

বিস্তার করিয়া রসময় গৌর-কিশোর তাঁহার রসময় নামের সার্থকতাই করিয়াছেন। কারণ, এই বিরহ একদিকে যেমন উভয়ের মিলনসুখ আরো রসাল করিয়া দিতেছে, অপর দিকে আবার জীবে ভগবানে মিলন করাইয়া গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ের রস বৃদ্ধি করিতেছে।

জগতে সুখ ও দুঃখ দুইটী বস্তু রহিয়াছে। জীব নিরন্তর দুঃখ-সমুদ্রে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। সুখের আশায়ও জীববুদ্ধিতে সে যাহা করে, পরিণামে তাহাতে দুঃখই পায়। কারণ, জীব সত্য বস্তু ধরিতে পারে না, প্রকৃত সুখের সন্ধান জানেনা। জীবের এই দুঃখ দৈন্য দূর করার জন্য প্রভু ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখের ভাগ লইলেন, জীবকে সুখের ভাগ দিলেন। একদিকে যেমন সন্ন্যাসে করুণরসের সৃজন করিয়া জীবের কঠিন চিত্ত দ্রব করিলেন, এবং জীবের একমাত্র আশ্রয় জগতের সারভূতা ভূস্বরূপিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে জীবকে আকর্ষণ করিলেন, তেমনই আবার অন্যদিকে এই সন্ন্যাসের কঠোরতা দ্বারা তিনি জীবকে জানাইলেন, "হে জীব, তোমাদের জন্যই আমি তোমাদের সমাজে মায়ামানুষ রূপে আসিয়াছি, এবং জগতের যাবতীয় দুঃখ আমি শিরে বহন কারয়া লইতেছি। তোমরা সুখে হরিনাম কর। তোমাদের কোন চিন্তা ভাবনা নাই। আমাব দায় দিয়া, আমারই দোহাই দিয়া তোমরা সুখে 'হরিবোল' বলিয়া নাচিয়া বেড়াও। তোমাদের যাহা কিছু কৃচ্ছ্র সাধন, তাহা আমি করিয়া যাইতেছি, সুধু তাই নয়; পরিবারে যদি পাপ প্রবেশ করে, তবে সেই পরিবারের কর্ত্তা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সকলের পাপ ক্ষালন হয়। এই ঘোর কলিকালে বিশ্বপরিবারে ভীষণ পাপ প্রবেশ করিয়াছে; তাই, আমি তোদের কল্যাণের নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তোদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম—আমি এই কাঙ্গাল বেশ লইলাম। এখন তোরা সুখে হরি ব'লে নাচিয়া বেড়া।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া এইরূপে সুখের ভাগ জীবকে দিয়া দুঃখের ভাগ নিজেরা লইলেন। তাঁহারা "দুঃখভাগী"! তাই পদ কর্ত্তা শ্রীমতীর ভাব বুঝিতে পারিয়া "দুঃখভাগী" পদটী দিয়াছেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহ-কাতরা। তাঁহার বিরহ-লীলা পাঠ ও ধ্যান করিয়া আপনি কাঁদেন কেন! আপনার সহিত শ্রীমতীর নিশ্চয়ই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি আপনার অতি নিজজন, আপন হইতেও আপন। তিনি জীবভূতা পরা প্রকৃতি, জীবের একমাত্র গতি ও আশ্রয়। তাই, শ্রীমতীর বিরহে আপনি বিহ্বল। শ্রীমতীই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা আমরা অপরা প্রকৃতির প্রভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাই দুঃখে পড়িয়াছিলাম; শ্রীমতীর বিরহ-লীলা সৃজন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের সেই স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া আমাদিগকে দুঃখ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইলেন।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া দুর্ব্বিষহ বিরহ-ব্যথার মধ্যে যখন জীবের কথা স্মরণ করিতেন, এবং ভাবিতেন, তিনি একা দুঃখ-ভাগী নহেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ বিরহ-ব্যথায় তুল্য ব্যথিত, এবং ইহা কেবল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত, তখন তিনি জীবের সুখের দিকে চাহিয়াই এই বিরহের দাব-দাহ সহিয়া থাকিতেন। তথাপি এই আগুণ সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকিত।

এই বিরহের মধ্যে আবার মিলন-সুখও রহিয়াছে, এই কিয়ৎ পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছি। শ্রীমতী মধ্যে মধ্যে গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইতেন। এইরূপে শচীমাও মধ্যে মধ্যে নিমাইয়ের দর্শন পাইতেন। আর, তাহা না হইলে এই জ্বলন্ত আগুণে দগ্ধ হইবার কথা।

ফাল্গুন মাস; শুক্ল পক্ষ আসিল। দিনের পর দিন যতই অতীত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে চন্দ্রমাও কলা কলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; একে ত

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জোছনা বিরহিণী নারীর পক্ষে বিষম জ্বালাময়, শ্রীমতী চন্দ্রের দিকে চাহিতে পারেন না, চাহিলেই উহু উহু করিয়া উঠেন; চন্দ্র ত দূরের কথা, জোছনার দিকেও তাকাইতে পারেন না। এমন কি, জানালার মধ্য দিয়া যে তাঁহার গৃহে রশ্মি পড়ে, তাহা দেখিয়াই তিনি নীরবে ক্রন্দন করেন, আর ভাবেন, এহেন মধু যামিনীতে আমার মধুময় প্রাণবল্লভ কই? কাহাকে লইয়া আমি এই মাধুর্য্য আস্বাদন করি!' এই রশ্মি তিনি সহিতে পারিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিয়া থাকেন। কখন বা হঠাৎ আঁখি মেলিয়া কিরণ চোখে পড়িলে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তদুপরি আবার যতই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই প্রভুর জন্মোৎসবের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এ বৎসর শ্রীমতীর জন্মোৎসব শ্রীপঞ্চমী তিথিতে প্রভু মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়ায় ধ্বনি উঠিল, প্রভু সন্ন্যাস করিবেন। শচীমা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সকলেই শুনিলেন। শ্রীমতী তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন। শচীমার সহিত নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা আলাপ হইলে মা শেষে বলিলেন, "তুই, বাছা, বউমাকে লইয়া একটু সংসার কর্, আমি দেখিয়া নয়ন জুড়াই।" শচীমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য নিমাইচাঁদ আর শ্রীবাসের অঙ্গনেও কীর্ত্তনে যান না। ভক্তগণই শ্রীশচীর অঙ্গনে আসিয়া কীর্ত্তন করেন। দেড় মাস কি দুই মাস পর্য্যন্ত প্রভু আর শ্রীবাসের কীর্ত্তন-কুঞ্জে নিশি যাপন করেন না। শ্রীমতীর বিলাস-কুঞ্জেই রজনী অতিবাহিত করেন। প্রভু এমন ভাবে শ্রীমার বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন, যে, শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসের কথা এক রকম ভুলিয়াই গেলেন। এইরূপে অগ্রহায়ণ পৌষ অতিবাহিত হইল। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি আসিতে না আসিতেই প্রভু এবার শ্রীমাকে বলিলেন, "মা, তোমার বউমার

জন্মোৎসব তাঁহার পিত্রালয়েই হইয়া থাকে ; এবার তুমি এখানে কর না !” ইহাতে মা সন্তুষ্ট হইয়া সব আয়োজন করিলেন। প্রভুরই বাঞ্ছা, শ্রীমতীর জন্মোৎসব তিনি নিজে করেন, তবে শচীমাকে সুখ দেওয়ার জন্য তিনি মায়ের অনুমতি লইয়া লইলেন। অতিশয় সমারোহের সহিত প্রভু উৎসব করিলেন। এ আনন্দ-প্রবাহ সুরধনীর ধারার ন্যায় সমগ্র নদীয়া বহিয়া চলিল। নদীয়ার রাণী বিষ্ণুপ্রিয়ার জয় ধ্বনিতে সমগ্র নদীয়া মুখরিত হইল। গলিতে গলিতে, রাস্তায় রাস্তায়, সুরধুনীর কুলে কুলে, ঘাটে মাঠে, গৃহে গৃহে, সকলের মুখেই বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মোৎসবের কথা শুনা যাইতে লাগিল। প্রভু নদীয়ার নরনারীর হৃদয়ে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু, ইহার এক সপ্তাহ পরেই যে প্রভু এ হেন ডাকাতি করিবেন, তাহা কে জানে ! প্রভু যে সন্ন্যাস করিবার কথা কহিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, শচীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। হে পাঠকপাঠিকাগণ ! এখন, একবার ভাবুন দেখি, ব্যাপার খানা কি ! প্রভু জানেন, সাত দিন পরে, অর্থাৎ, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে তাঁহার সন্ন্যাস করিতে হইবে, তাঁহার সাধের নদীয়া, তাঁহার প্রিয় সুরধুনী-কূল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ভক্তগণকে কাঁদাইতে হইবে, শচীমা ও শ্রীমতীকে বিরহসমুদ্রে ফেলিয়া যাইতে হইবে, কঠিন জীবকে উদ্ধার করার জন্য ইঁহাদের স্নেহ ও প্রীতির সেবা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু, এই আনন্দ উৎসবে ঘুণাক্ষরেও ইহা কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। তিনি পরমানন্দে শ্রীমতীর জন্মোৎসব কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। ইহা আপনি আমি পারিনা। জীবে অসম্ভব। একমাত্র লীলাময় শ্রীভগবানেই ইহা সম্ভবপর। এখন দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী কি ! সে যাহা হউক, শ্রীমতী প্রভুর প্রেমে ও তাহার এতাদৃশ স্বাভাবিক বহির্নিদর্শনে এত মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে, উৎসবের দিনই তিনি মনে মনে

আঁটিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, এইবার তাঁহার পালা। তিনিও এবার তাঁহার প্রাণবল্লভের জন্মোৎসব তুল্য বা ততোধিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিবেন। সেই শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিরও আর বেশী বাকী নাই। এক মাস ক'দিন পরেই সেই উৎসব আসিতেছে, তিনি ইহাতে তাঁহার সর্ব্ব শক্তি নিয়োজিত করিয়া উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক করিয়া সম্পন্ন করিবেন। সুতরাং, শ্রীপঞ্চমীর উৎসব হইতেই তিনি সেই চিত্রটী অঙ্কন করিতেছিলেন। কিন্তু, প্রভু এখন তাঁহার সে সাধে বাদ ঘটাইলেন। উৎসব ত দূরের কথা, প্রভু তাঁহার মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন। তাই, যতই পূর্ণিমা তিথি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তিনি প্রভুর জন্মোৎসবের কথা মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং, এই শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রমা তাঁহাকে নানাবিধ ভাবে বিকল করিয়া তুলিল।

শুধু প্রভুর জন্মোৎসব নহে। এই সময় গোবিন্দের দোল। ফাগু লইয়া ভক্তগণের সহিত রসময় প্রভু কতনা ক্রীড়া করিয়াছেন। আবীরে সমস্ত নদীয়া আবীরময় হইয়াছে। নারীগণ যূথে যূথে আসিয়া শ্রীমতীর সহিত আবীর লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন। বহিঃ-প্রাঙ্গণে প্রভু ভক্তগণকে লইয়া, আর, অন্তঃপুরে শ্রীমতী নাগরীগণকে লইয়া কত রসরঙ্গ করিয়াছেন, আবার, নাগরীগণ শ্রীমতীকে ফাগুমণ্ডিত করিয়া প্রভুর বামে বসাইয়া নিজেরাও কত রস আস্বাদন করিয়াছেন। সেই সব রসময় দোল-লীলার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমতী বিরহে আরও কাতরা হইলেন। যথা পদ—

ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল।
বিহি ন'হ কাহে লই গেল॥
তঁহি আওয়ে পূর্ণমিক রাতি।
দিন সোঙরি ফুরত ছাতি॥

এইরূপে শ্রীমতী বিরহ-সমুদ্রে পড়িয়া আর থই পাইতেছেন না। এক এক সময় এক এক ভাবতরঙ্গে পড়িয়া তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছেন! বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই। মুখে কথাটী নাই। স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না। তাহাতে আবার অবলার পরিপূর্ণ ভাবমূর্ত্তি শ্রীমতীর ভাবগভীরতার আর ত কথাই নাই! বাক্যস্ফূর্ত্তি না হইলে ভাবের তরঙ্গ আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই তরঙ্গে পড়িয়া শ্রীমতী কখনও মূর্চ্ছিত হন, কখন উত্তান নয়নে চাহিয়া রহেন, যেন, কাহাকেও তিনি স্থির নয়নে দর্শন করিতেছেন, কখনও প্রলাপ বকিতে থাকেন, সে-ও বেশী কথা নয়— যেন প্রাণবল্লভ নিকটে আসিয়াছেন, আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,'বল্লভ হে,এস হে! এত দিন পরে কি মনে পড়েছে!'এই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত, কিংবা,তাঁহার আদর সোহাগ পাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন,আর, সেই মুহূর্ত্তেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কখন বা প্রাণনাথ আসিয়াছেন দেখিয়া মান করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন, আর মানভরে অঝোর নয়নে ঝুরিতে থাকেন। আবার ক্ষণ পরে দেখেন, প্রাণনাথ নিকটে নাই, তখন নিজকে ধিক্কার দিতে থাকেন; ভাবেন, 'আমি কেন মানভরে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম, তাই বুঝি প্রাণবল্লভ আমার চলিয়া গিয়াছেন।' তাই ভাবিয়া "হা নাথ" বলিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সখীগণ অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন অনুকূল ভাবে, কখন প্রতিকূল ভাবে থাকিয়া তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাই-তেছেন। শচীমা এই সব দেখিয়া শুনিয়া মরণে মরিয়া আছেন। কখন 'হা নিমাই' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কখন বা 'নিমাই এসেছে' মনে করিয়া পাগলের মত বলিতেছেন, 'নিমাই, এসেছ! বিদেশে, বাছা, তোর কে যত্ন করে! ক্ষুধায় তোকে কে এক মুটো অন্ন দেয়! আয়, বাছা, কোলে আয়! আর বিদেশে যা'সনে, এই ভাবে বিরহের মধ্যে বিরহ, মিলন

ও বিরহ—নানাবিধ তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া এই দুইটী দেবী দিবা নিশি কাটাইতেছেন।

প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া যান তখন তিনি বলিয়া যান 'তোমরা কীর্ত্তন করিও', তাই শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীবাসের অঙ্গনে মিলিত হইয়া গৌরকথা আস্বাদন করেন এবং শূন্যপ্রাণ হইলেও প্রভুর আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ও তাঁহার প্রীতি সাধনের জন্য সংকীর্ত্তন করেন।

শচীদেবীর নিশিতে নিদ্রা নাই। শ্রীমতীও সারা নিশি জাগিয়া থাকেন। কখন বা কদাচিৎ সখিদের কথায় বা ধমকে নয়ন মুদিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিরহের মধ্যে মিলনের রসও আস্বাদন হয়। প্রিয়বস্তুতে যদি একনিষ্ঠতা হয়, তবে তাহার বিরহে বিরহ ও মিলন উভয় রসই যুগপৎ আস্বাদন হয়। এই মিলনে বিশুদ্ধ সম্ভোগও হয়। কিন্তু, এইরূপ একনিষ্ঠা শ্রীভগবানে ব্যতিরেকে অন্যত্র সম্ভবপর হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গে ঐ দেবীদ্বয় এইরূপ একনিষ্ঠ ছিলেন। এখন দেখুন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী কি!

কাঞ্চনা ও অমিতা সখী সর্ব্বদা শ্রীমতীর নিকটে থাকিতেন। অন্যান্য সখী ও নাগরাবৃন্দও প্রায়শঃই আসিতেন। কাঞ্চনা শ্রীমতাকে বলিতেছেন, 'সখি, তুই অমন করিয়া দুঃখ পাইস্ না, আমাকেও দুঃখ দিস্‌না। প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া আমাদের কখনও মনে স্থান পায় না, যে, তিনি নিঠুর। যিনি রস জানেন, তিনি কি নিঠুরালী করিতে পারেন? আর জীবের দুঃখ যিনি সহিতে পারেন না, জীবের সমস্ত দুঃখ নিজে লইয়া যিনি তাহাদিগকে সুখ দেওয়ার জন্য সতত ব্যস্ত, তিনি কি নিঠুর হইতে পারেন। কার্য্য ব্যপদেশে তিনি ক'দিনের তরে একটু দূরে গিয়াছেন, তা বই ত নয়! আবার তিনি আসিবেন, আবার নদীয়া হাসিবে। ইহার উত্তরে শ্রীমতী বলিতেন, "তা কি হয় সখি! তিনি যে সন্ন্যাস

করিয়াছেন, আর কি তাঁহার ফিরিয়া আসা সম্ভবপর!" কাঞ্চনা বলিতেন, 'তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি কাহারও অধীন নহেন। তিনি বিধিরও বিধি, একটু ধৈর্য্য ধর! তিনি আবার আসিবেন।'

শ্রীমতী জানেন, কাঞ্চনা মিথ্যা কথা বলার লোক নয়। তাই তিনি এই কথায় কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নয়ন মুদিতেন। একটু তন্দ্রাও আসিত। তখন প্রভু আসিয়া শ্রীমতীর নিকট উদিত হইতেন। শ্রীমতী ইহা স্বপ্ন বলিয়া মানিতেন না। ভাব নিত্য, ভাব সত্য। শ্রীমতী তখন ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিতেন, 'সখি, প্রভু আসিয়াছেন। মাকে সংবাদ দেও। নদীয়ায় উৎসবের আয়োজন কর। পূর্ণিমা তিথি সন্নিকট। মহাসমারোহের সহিত প্রভুর জন্মতিথির পূজা করিতে হইবে। আমরা সকলে মিলিয়া পরমানন্দে প্রভুকে উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করাব। ধূপ দীপ গন্ধে ও পিষ্টক পায়সাদি দ্বারা প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিব। আর, সংকীর্ত্তন তাঁহার বড় প্রিয়। ভক্তগণকে সংবাদ দেও, এই জন্মতিথির উৎসবে নগরময় মহাসংকীর্ত্তন হইবে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নর নারী, সমগ্র নদীয়াবাসীর ভোজনের আয়োজন করিতে হইবে। সখি রে! এই উৎসবের রোল শুনিয়া দূর দূরান্ত হইতে যে যেখান হইতে আগমন করে, সকলেরই ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক উৎসবে আমার দুই উৎসব। জন্মতিথির উৎসব ত আগেই আমরা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাতে আবার প্রভুর নদীয়ায় পুনরাগমন। নদীয়া আনন্দশূন্য শ্রীহীন হইয়া উঠিয়াছিল। আবার নদীয়া পূর্ণানন্দময় হইয়া উঠুক। সখি! সুরধুনীর তীর প্রভুর বড় প্রিয় স্থান। ভক্তগণ লইয়া তিনি তথায় বিহার করিয়া বড় সুখ পান। সেই সুরধুনীর কুল বিবিধ তোরণে পত্রে পুষ্পে পতাকায় সুসজ্জিত করিতে হইবে। নদীয়া নগরের প্রতি রাস্তায় বিবিধ সাজ সজ্জা করিতে হইবে। যত প্রকারের বাদ্যভাণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভবপর,

তাহা সংগ্রহ করিয়া নানাতালে নানাবিধ বাদ্যে মধুর ধ্বনিতে প্রভুর নদীয়া-আগমন-বার্ত্তা এবং জন্মতিথির উৎসব ঘোষণা করিতে হইবে। শত সহস্র মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হইবে। মুক্ত হস্তে অন্নবস্ত্র সকলকে দিতে হইবে। আমার পিতার ভাণ্ডার, জানই ত, অক্ষয় অব্যয়!”

শ্রীমতী আনন্দাতিশয্যে এইরূপ কত কথা বলিতেছেন, আর সখীগণ এক একটী করিয়া কথা শুনিতেছেন। কোন দ্বিরুক্তি করিতে পারিতেছেন না, পাছে শ্রীমতীর রসভঙ্গ হয়। বহুদিন পরে তাঁহারা শ্রীমতীকে প্রফুল্ল দেখিতেছেন। যে প্রফুল্ল শ্রীমুখখানি দেখিবার তরে তাঁহারা এত দিন বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শ্রীমতীকে কত সন্তর্পণে, কত যত্নে, রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই মুখে আজ তাঁহারা হাসি দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহারা নির্ব্বাক্ হইয়া শ্রীমতীর এক একটী কথা অতিশয় আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন।

ওদিকে শ্রীশচীমাও নিমাইয়ের বিরহে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া আছেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তন হইতেছে। এ দিনের কীর্ত্তন শুনিয়া শচীমা ভাবিতেছেন, ‘তাঁহার নিমাই কীর্ত্তনে। তাহা না হইলে কীর্ত্তনে এত তরঙ্গ উঠিবে কেন!’ বহু রাত্র পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইতেছে; আর শচীমা কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, এই বুঝি কীর্ত্তন থামে। কীর্ত্তন থামিলেই শ্রীনিমাই বাড়ী আসিবে। বহুক্ষণ পরে সত্য সত্যই কীর্ত্তন থামিল; তখন শচীমা মনে করিলেন, এখন তাঁহার নিমাই নিশ্চয়ই আসিবে। ক্ষণ পরেই তিনি শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বউমা, নিমাই এসেছে? বহু ক্ষণ হইল কীর্ত্তন থামিয়াছে। নিমাই কীর্ত্তন হইতে আসিয়া ত আমাকে প্রণাম করে! কিন্তু আজ বুঝি আমার সাড়া শব্দ না পাইয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভয়ে আর আমার এখানে আসে নাই। তা হউক, রাত্র বেশী নাই। নিমাইকে এখন শয়ন করিতে

বল। বাছা আমার প্রায় সারাটী নিশি জাগরণ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে। এখন একটু নিদ্রা যাইয়া সুস্থ হউক।”

শচীমার কথা শুনিয়া শ্রীমতী কহিলেন, ‘এইমাত্র তিনি এসেছিলেন, ক্ষণ পরেই আবার কোথায় চলিয়া গেলেন! তবে কীর্ত্তনে যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বোধ হয় তিনি আমাকে দর্শন দিয়া গেলেন,হয়ত সেথানেই আছেন’। শচীমা বলিলেন, “কীর্ত্তন সাঙ্গ হয়েছে ত অনেকক্ষণ হ'ল, তবে বোধ হয় মালিনী দেবীর অত্যধিক স্নেহে আজ সেখানেই রয়েছে। আচ্ছা, তা হউক, বাছা আমার সেখানেই বিশ্রাম করুক। তারা সকলেই ত আমাদের নিজজন। আমার নিমাইকে সকলেই ত প্রাণের মত ভালবাসে! বউমা, এখন তুমি নিদ্রা যাও।’

শ্রীমতীর প্রাণবল্লভ যে আসিয়াছেন, ইহাতে আর তাঁহার দ্বিধা রহিলনা। তিনি আবার সখীগণকে প্রভুর জন্মতিথিতে মহামহোৎসব করার কথা বিবরিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে কৃপাময় পাঠকপাঠিকাগণ! এখন একবার ভাবুন দেখি, যে শ্রীমতী অকুল বিরহসাগরে পড়িয়া বলিয়াছিলেন—

গেল গৌর, না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকুলে ভাসাইয়া॥

যে শ্রীমতী বজ্রাহত হইয়া মরমে বড় ব্যথা পাইয়া বিধির উপর রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—

হায়রে দারুণ বিধি, নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু, ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায়রে দারুণ বিধি, কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥

যে শ্রীমতী আর সহিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন—

আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছাড়খার॥

যে শ্রীমতী গৌর-বিরহে কি বুদ্ধি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষীণতনু হইয়া গিয়াছেন, আর গণিয়া গণিয়া মৃত্যুর দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কোথায় ছুটিয়া গেলে তাঁহার দর্শন পাইবেন, এই ভাবনায় নিরন্তর আকুল ছিলেন, আর কত দিন তিনি বাঁচিবেন, আর কত দিন তাঁহার কপালে দুঃখ আছে, এই ভাবিয়া উহা জানিবার জন্য কপাল চিরিয়া দেখিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন,যথা, পদ—

কহ, সখি, কি করি উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন।
কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে।
চিরি দেখি কি আছে কপালে॥

যে শ্রীমতী বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন—

হিয়া জর জর অনুরাগে।
এ দুঃখ কহিব কার আগে॥

যে শ্রীমতীর—

গোরা বিনু না রহে পরাণ।

সেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া আজ প্রাণবল্লভের দর্শন পাইলেন। পাইয়া তিনি পরমানন্দে মহা মহোৎসবের আয়োজন করিতেছেন। হে জীবগণ, আপনারা কি শ্রীমতীর অনুগত হইয়া এই মহা মহোৎসবে যোগদান

করিবেন না! আপনারা কি শ্রীমতীর কাছে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে বসাইয়া এই জন্মতিথির পূজা করিবেন না! এবং, এই নিত্য নবীন যুগল দর্শন করিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইবেন না! কোন্ সাহসে আপনারা বলিবেন, "ঠাকরুণ, উৎসবের আয়োজন করিবেন না, প্রভু নীলাচলেই আছেন, তিনি শ্রীনবদ্বীপে আসেন নাই।" প্রাণ থাকিতে আপনি ইহা বলিতে পারিবেন না। সখীরা ইহা বলিতে সাহস করেন নাই। শ্রীমতীর এই ভাব দর্শন করিয়া তাঁহারা আর্ত্তিসহকারে প্রভুকে নদীয়ায় আহ্বান করিয়াছেন, এবং, প্রভু আসিয়া সত্য সত্যই মিলিত হইয়াছেন। আপনাদেরও যদি হৃদয় থাকে, তবে শ্রীমতীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আপনারাও প্রভুর এই জন্মোৎসব তিথির পূজা করিবেন, এবং যুগল মিলন করাইয়া শীতল হইবেন। বড় দুঃখেই শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

এ দুঃখ কহিব কার আগে।

শ্রীমতী অপার বিরহবেদনা সহিয়া কঠিন জীব উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণবল্লভকে জীবের নিকট দিয়া দিলেন। আমরাও হরিনাম পাইয়া উদ্ধার হইলাম। যাহা শত সহস্র বৎসর সাধনা করিয়া হয় না, শ্রীমতী তাহা ইঙ্গিতে করিয়া দিয়াছেন। এখন উদ্ধার হইয়াও যদি আমরা শ্রীমতীর বিরহদুঃখ বাসনা করি, আমরা এই গোলোকসুধা হরিনাম-সংকীর্ত্তন পাইয়াও যদি এই নিত্যযুগলের ভজন না করিয়া শ্রীমতীকে বিচ্ছেদের মধ্যে রাখিয়া দেই, তবে আমরাও শ্রীভগবানের বিরহ-দুঃখ-সাগরে চিরকাল ভাসিতে থাকিব। আমাদের এ দুঃখ আর ফুরাইবে না। অতএব, হে আমার বিশ্ববাসী জীবগণ! আসুন আমরা এই যুগল বিগ্রহকে হৃদয়ের রাজা করি, এবং, এই পতিতপাবন কলিকলুষনাশন গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার জয়ধ্বনি দিয়া পরমানন্দে দিনাতিপাত করি।

প্রভু নিজেও ত শ্রীশচীমাতাকে এই কথা বুঝাইয়াছেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ভবন হইতে প্রভু যখন বিদায় লয়েন, তখন শচী মা বিকল হইয়া পড়েন। প্রভু তখন শ্রীমাকে বুঝাইলেন, "মা, যুগে যুগেই ত এই লীলা প্রকট হইয়াছে। এখনো তাহাই হইতেছে। জীবের কল্যাণের নিমিত্তই এই লীলার অবতারণা। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যাকে ছাড়িয়া গেলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নন্দরাণীকে ঘরে রাখিয়া মধুপুরে চলিয়া গেলেন। আর সর্ব্বশেষে এই লীলা হইতেছে। মিথ্যা শোক করিও না, মা। যথা পদ :—

শুনিয়া মায়ের বাণী কহে প্রভু গুণমণি,
শুন, মাতা, আমার বচন।
জন্মে জন্মে মাতা তুমি, তোমার বালক আমি,
এই সব বিধির লিখন ॥

* * * *

রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে, বনে বনে ফিরে লোকে,
ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী ॥
তবে শেষে দ্বাপরে, কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে,
ঘরে নন্দরাণী, নন্দ পিতা।
সর্ব্ব পরে এই হয়ে, একথা অন্যথা নহে,
মিথ্যা শোক কর শচী মাতা ॥

তার পর প্রভু কি বলিলেন শুনুন :—

রোদন করিলে তুমি ডাকিলে আসিব আমি,
এই দেহ তোমার পালিত।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে— যাই নীলাচল পুরে,
তুমি চিত্তে কর সন্নিহিত ॥

প্রভুর এই কথায় আমরা কি বুঝিলাম, ইহা এক বার ভাবিবার বিষয়। প্রভু বলিতেছেন, "মাগো, তুমি যদি রোদন কর, তবে আমি আসিব।" এই কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে, শচী মা রোদন করিলেই তিনি আসিবেন, আর রোদন না করিলে তিনি আসিবেন না। শচী মা যে রোদন করিবেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কারণ, অত স্নেহ ত্রিজগতে আর হয় না। সেই স্নেহের পুত্তলী চলিয়া যাইতেছেন, তাহাতে সেই বাৎসল্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি শ্রীশচীমার কি অবস্থা হইবে, তাহা ত সহজেই অনুমেয়! তথাপি প্রভু পুনরপি বলিলেন, "মাগো! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি নীলাচলে যাই। বহির্দৃষ্টিতে নীলাচল দূরে বটে, কিন্তু, তুমি আমাকে তোমার চিত্তে সতত সন্নিহিত করিয়া রাখিও।" প্রভুর এই কথা শুনিয়া শচী মা আর কথা কহিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন বাহিয়া অবিরলধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। যথা—

প্রভু স্তুতিবাণী কহে, শচী নির্ব্বাচনে রহে,
পড়ে জল নয়ন বাহিয়া।

বাসু ঘোষ নিকটে ছিলেন। থাকিয়া মায়ে পুত্রে কি কথা হইতেছিল, তাহা এক চিত্তে শুনিতেছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং অবশেষে মায়ের দশা দেখিয়া তিনি প্রভুকে পুনরায় নদীয়ায় আসিতে নিবেদন করিলেন, যথা—

বাসু কহে—গৌরহরি, এই নিবেদন করি,
পুনরপি চলহ নদীয়া ॥

বাসুঘোষ প্রভুকে নদীয়ায় আনিলেন, আনিয়া শচী মা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মিলন করাইলেন। হে ভক্তগণ! আপনারাও যদি এইরূপ শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহদশা দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারাও

প্রভুকে নদীয়ায় ফিরাইয়া আনিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিত্য যুগল দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এখন প্রভুর কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। প্রভু বলিলেন, যুগে যুগেই এই লীলা প্রকটিত হইয়াছে, কৌশল্যা দেবী শ্রীরামচন্দ্রের জন্য এবং নন্দ মহারাজ ও মা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদিয়াছেন। তাহাতে কি হইয়াছে? না, জীবগণ কৌশল্যাগৃহে রামচন্দ্রকে পাইল। শুধু কৌশল্যা-গৃহে একা রামচন্দ্রকে নহে, সীতারাম যুগল ভজন প্রাপ্ত হইল। আর, এদিকে নন্দরাণীর কোলে বালগোপাল দর্শন করার সৌভাগ্য জীবগণ পাইল, এবং রাধাকৃষ্ণ যুগল ভজন করার অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রভু এই কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন—

সর্ব্বপরে এই হয়ে, এ কথা অন্যথা নহে,
মিথ্যা শোক কর শচী মাতা॥

ইহাদ্বারা প্রভু বুঝাইলেন, সর্ব্বশেষে এই অবতার। ইহা এই লীলায়ই প্রকাশ হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাহা হইয়াছে, এযুগেও তাহাই হইবে, তাহাতে আর অন্যথা হইবার নহে। সেটী কি? না—শচীমার স্নেহের মহিমায় জীব শচীর কোলে নিমাই দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইবে, এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমের গরিমায় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।

এই যে প্রভু উপরে বলিলেন, শচীমা রোদন করিলেই তিনি তাঁহার নিকটে আসিবেন, এবং তিনি আরও বলিলেন, যে, শচীমা যেন তাঁহাকে সতত চিত্তে সন্নিহিত করিয়া রাখেন, ইহা দ্বারা প্রভু ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে, শচীমার এই বিরহ-রস দ্বারাই শচীর আলয়ে জীবগণ নিত্য গৌর দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ভগবানের এইরূপ লীলা করার অভিপ্রায় কি? প্রবল আকাঙ্ক্ষাই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। জীবের সহিত ভগবানের চির

বিরহ। মায়াধীন জীব সেই বিরহ বুঝিতে পারে না। যাহার বিরহের উন্মেষ নাই, তাহার মিলনের আকাঙ্ক্ষা কোথায়? তাই, জীব মায়ার মধ্যে পড়িয়া 'হা হতোঽস্মি'করিতেছে; এই জীবকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাই ভগবানের এইরূপ বিরহ-লীলার অবতারণা। পূর্ণের মধ্যে অংশ আছে, পূর্ণের বিরহ দর্শনে, জীব যে অংশ, তাহারও বিরহের উদ্রেক হয়। তাঁহার অতি নিজ জন লইয়াই তিনি বিরহলীলা করেন। শচীমা স্নেহের অম্বুধি, তাঁহার গভীর অতলস্পর্শী স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইলে জীবগণ তাহাতে কৃতার্থ হইবে। শচীমায়ের বিরহদশা দর্শনে, তাঁহার বিরহ-লীলা পাঠে, জীবের ভগবৎ-বিরহ স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে, তখন শচীমার নিকটে থাকিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াই জীব ভগবানের সহিত মিলনের শুভ সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। হে কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণ! আপনি আমি শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মত বিরহে কাতর নই। ভগবান বলিয়া যে একটী প্রেমময় বস্তু আছেন, তাহার সন্ধানও জানিনা; মায়ার মধ্যে পড়িয়া, মায়িক বস্তু সুখের নিদান মনে করিয়া, তাহারই জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি; করিয়া আরও মায়াতে লিপ্ত হই; দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পতিত হই, চিরসুখময় শ্রীভগবানকে চির বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। আমাদের এই চির দুঃখ অপনোদনের জন্যই প্রেমময় প্রভু শচীমাকে কাঁদাইলেন; বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনাথিনী করিলেন, তাঁহার প্রাণের প্রিয় ভক্তগণকে সঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন, সাধের নদীয়া শূন্য করিয়া তিনি কাঙ্গাল সাজিলেন; জীবের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া প্রেম ভিক্ষা করিলেন। আসুন আমরা নদীয়ায় যাই; যাইয়া শচীমায়ের দশা দর্শন করি, কাঙ্গালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহ-ব্যথায় শত বৃশ্চিক-দংশনে দংষ্টের ন্যায় কিরূপ ছট্ ফট্ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে 'উহু' 'উহু' বলিয়া 'গেলাম' 'মলাম রে' বলিয়া কিরূপ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছেন, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া

মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন, এই সব হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য দর্শন করি; তাহা হইলে আমরাও বিরহব্যথায় ব্যথিত হইয়া শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার হইয়া কাঁদিয়া উঠিব। এই ক্রন্দনের বোলে প্রভু আমার, প্রেমের ঠাকুর গৌর আমার, নদীয়ার চাঁদ নিমাই আমার, আর স্থির থাকিতে পারিবেন না; ঝাট করিয়া নদীয়ায় চলিয়া আসিবেন; আসিয়া শ্রীশচীমায়ের আলয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তিকে সখীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিবেন; আর, শ্রীবাস, নরহরি, বাসুঘোষ, মাধব, মুরারি, মুকুন্দ, শিবানন্দ, গদাধর প্রভৃতি বিরহ-বিধুর ভক্তবৃন্দ শ্রীশচীর অঙ্গনে বাহু তুলিয়া প্রাণের ঠাকুর পাইল বলিয়া প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিবেন; আর, শান্তিপুরের বুড়ো গোসাঞী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু নৃত্য করিবেন, নদীয়ায় আবার প্রেমের প্রবল তরঙ্গ উঠিবে, জগৎ ধন্য হইয়া যাইবে, আমরাও ধন্য হইব।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং তনুমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

আমাদের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়াই প্রভু এই মানুষ-লীলা করিলেন। শ্রীপ্রভু সন্ন্যাসের পর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে দশ দিন থাকিয়া নীলাচল যাইবার জন্য বিদায় লইলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রাবণের ধারা-সম তাঁহার চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল, অদ্বৈত আচার্য্যকে তিনি কহিলেন—"আচার্য্য, সাধে কি আমি নদীয়া ছাড়িয়া যাইতেছি! সাধে কি তোমাদের সঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছি! তোমাদের দুর্ল্লভ সঙ্গ ভববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত; তাহা ছাড়িয়া আমি এখন নীলাচলে যাইতেছি; না গেলে লীলা পণ্ড হবে। তুমিই তো আমার লীলাক্রম স্থির করিয়াছ, করিয়া গোলোক হইতে আমাকে ভূলোকে আনিয়াছ। তুমি যাহা চাহিলে, নীলাচলে না গেলে সব বিফল হইবে;

জীব হরিনাম পাইবেনা, জীব উদ্ধার হবে না; প্রাকৃত লোকের মত শোক করিওনা। আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই আছি। ইহা বিশ্বাস কর।” যথা পদ—

অদ্বৈত-বিলাপে প্রভু হইল বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্যে “এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লালা ক্রম॥
নালাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা’ চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক কেন কর।
‘তব সঙ্গে সদা আমি’ এ বিশ্বাস কর”॥
প্রভু বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয়—কহে বাসু ঘোষ॥

শ্রীপ্রভু ও অদ্বৈত আচার্য্যে এইরূপ কথা হইতেছিল, এই সময় বাসুঘোষ ঠাকুর নিকটে ছিলেন। তিনি স্বকর্ণে ইহা শুনিলেন। শুনিয়া ইহা লিখিয়া রাখিলেন; এবং, বাসুঘোষেরও এই বিরহে প্রাণ বাহিরিয়া যাইতেছিল; কিন্তু, তিনি যখন প্রভুর শ্রীমুখে এই আশ্বাস-বাণী শুনিলেন, যে, তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আছেন ও থাকিবেন, তখন তিনি আহ্লাদিত হইয়া পদের শেষে গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিলেন। হে জীবগণ! জীব উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর এই মানুষ লীলা। আসুন, আমরা ইহা পাঠ করি; করিয়া ধন্য হই। অচিরে আমরা নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গকে নদীয়ায় দর্শন করিতে পারিব; শ্রীল শিশিরবাবু সত্য সত্যই লিখিয়াছেন, সন্ন্যাস

লীলা একবার বই দুইবার হয় না। আর, যিনি নারায়ণ, তিনি নদীয়ার বাহিরে গেলেন ; যিনি শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, ভক্তগণের প্রাণধন, তিনি নিত্য নবদ্বীপে রহিলেন।

বস্তুতঃ এই সময় হইতেই শ্রীগৌর-ভজন আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে কি মধুময় বস্তু, জীবগণ এবং বিশেষতঃ ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিতে অধিকার পাইলেন। স্বভাবের নিয়ম এই, অভাব বোধ না হইলে, ভাবে রস হয় না। একটী বস্তু শত উপাদেয় হউক, উহার জন্য প্রবল বাসনা না জন্মিলে বস্তুটী রসাল হয় না। এই জন্যই ভগবান কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তিকর পদার্থ সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; উহা আরোও রসাল করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার সৃজন করিয়াছেন ; সুশীতল জল দিয়াই আবার সেই সঙ্গেই তৃষ্ণা দিয়াছেন, যেন জল আস্বাদন করিয়া জীব তৃপ্ত হয় ও সুখ অনুভব করে। শ্রীভগবান্ যে অনন্ত রূপ ও অনন্ত রসের অপার নিধি, তাহা তিনি নদীয়া-লীলায় প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে আস্বাদন করিয়া উহা ভক্তগণকে আস্বাদন করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সঙ্গ করিয়া ভক্তগণ উহা নিত্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন ; করিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন! জীব আর কত সহ্য করিতে পারে! তাই, আমাদের রসিকশেখর নাগর-রায় শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর স্বীয় রূপ রস আরো উপভোগ করার নিমিত্ত একটু অন্তরালে লুকাইলেন। তাঁহার সন্ন্যাস অর্থ আড়ালে লুকান। বহিরঙ্গ লোক দেখিল, প্রভু সন্ন্যাস করিয়া নদীয়ার বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি নদীয়ায়ই লুকাইয়া রহিলেন। তাই, ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার দর্শন পাইতেন। ভক্তগণের সহিত লুকোচুরি করা ভগবানের স্বভাব। ইহার হেতু আনন্দ বৃদ্ধি করা। ব্রজধামে যেরূপ কৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান করিয়া গোপীগণকে বিরহরস আস্বাদন করাইলেন, কিয়ৎপরে আবার আসিয়া

তিনি তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইতেন, শ্রীনবদ্বীপেও সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কীর্ত্তন-রাস হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া •ন্দন আচার্য্যের বাড়ী যাইয়া লুকাইয়া রহিতেন। ভক্তগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাকে না পাইয়া যখন "হা হতোস্মি" করিতেন, তখন আবার কিয়ৎপরেই তিনি আসিয়া তাঁহাদের চিদাকাশে উদিত হইতেন, আবার তাঁহাদিগকে লইয়া কীর্ত্তন-রাস করিতেন; এবং অন্তঃপুরে যাইয়া শ্রীমতী ও নাগরীগণকে লইয়া লীলা-বিলাস করিতেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মথুরায় যাইয়া গোপিকাকুলকে আরো বিরহ-সাগরে ডুবাইলেন, আবার বৃন্দাবনে মধ্যে মধ্যে উদ্দিত হইয়া তদনুরূপই অপার আনন্দরস আস্বাদন করাইতেন, শ্রীনবদ্বীপেও শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাই করিলেন। এ বিরহের মাত্রাও অধিক; মিলনে আস্বাদনও সেই পরিমাণে অত্যন্ত অধিক। অদ্যাপি আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা কখন কখন গৌরকথা-রসে বা কীর্ত্তনানন্দে এতই ডুবিয়া থাকেন যে, কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন না যে, ইহার পর আবার বিষাদ আসিতে পারে। ভক্তগণও ভাবেন, এই আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতেই বুঝি তাঁহাদের চির দিন যাইবে। কিন্তু তাহা আর হয় না। কিয়ৎ পরেই দেখা যায়, কোথা হইতে বিষাদ আসিয়া তাঁহাদিগকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। আবার ক্ষণ পরেই মেঘের মত সেই বিষাদ কোথায় বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়, বা, উহা আকাশে লীন হইয়া যায়। আবার নির্ঝরের মত আনন্দধারা অবিরল ধারে ক্ষরিত হইতে থাকে। ভগবানের সহিত ভক্তগণের এইরূপ খেলা হইয়া আসি-তেছে। শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া উহা পূর্ণ প্রকট ও আরো অধিক রসায়ন করিলেন। এই সন্ন্যাস লীলা দ্বারা প্রভু এবার ভক্ত অভক্ত সকলকেই আকর্ষণ করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ ধরিতে গেলে সকলেই ভক্ত। কারণ,

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণের দাস।

আবার প্রভুও বলিয়াছেন –

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সবই মোর দাস।

তবে কাহারো এই দাস-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে, কাহারো হয় নাই। সে ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আত্মাভিমান করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোককে আমরা ভক্ত বলি, আর শেষোক্ত শ্রেণীর লোক অভক্ত বলিয়া খ্যাত। প্রভু এবার এই উভয় শ্রেণীর জীবকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যখন এই করুণ লীলার অবতারণা করিলেন, তখন নদীয়ায়, নদীয়ায় কেন, নদীয়ার বাহিরেও সর্ব্বত্র হাহাকার রব উঠিল। বহিরঙ্গ লোকও আত্ম-ধিক্‌কার দিয়া 'গৌর' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিশেষতঃ, তাঁহারা যখন শ্রীশচী দেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-দশা দর্শন করিতেন, বা সেই কথা ভাবিতেন, তখন তাঁহারা আরো বিকল হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইত, নদীয়ার চাঁদ আবার নদীয়ায় উদিত হউন, এবং তাঁহাকে এবার পাইলে তাঁহারা প্রাণের সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিবেন। যথা, পদ—

নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক কুজন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাঁদিয়া বিকলে।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥
যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার।
পতিত পাবনে কেনে কৈনু অস্বীকার॥

এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণে পড়িব কহে বৃন্দাবন দাসে॥

প্রভুর আর একটী রঙ্গ দেখুন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যাঁহারা শক্রতাচরণ করিয়াছেন, যথা,—রাবণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি, তাঁহাদিগকে তিনি নিধন করিলেন, অর্থাৎ, দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধার করা এক কথা, আর প্রেম দান করা আর এক কথা। এই বার এই দেহ রাখিয়াই তাহাদিগকে উদ্ধার ত করিয়াছেনই, শুধু তাহা নহে, প্রেমদানও করিয়াছেন। কারণ, এবার শ্রীগৌরাঙ্গ পরিপূর্ণ প্রেমাবতার। এই যে প্রভু প্রেমাবেশে একদিন "গোপী" "গোপী" * জপ করিতেছিলেন, আর আগমবাগীশ আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেওয়ায় প্রভু ভাবের প্রাবল্যে লাঠি লইয়া সেই পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সেই পণ্ডিত একটী দল পাকাইয়া প্রভুর শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি, প্রভুকে প্রহার পর্য্যন্ত করার জন্য তাঁহারা যোগাড় যন্ত্র করিলেন, প্রভু তাহাতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শক্রভাব পোষণ করিলেন না। প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, পণ্ডিতদিগকে তাহার বিরোধী মনে করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন না। ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহা করিতে পারিতেন। তিনি যে চক্রধারী, তাহা বহুবার তিনি দেখাইয়াছেন। জগাইমাধাইকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বসমক্ষেই চক্র আনয়ন করিয়াছিলেন। এই চক্র দ্বারা তিনি ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তিগণকে অনায়াসেই নিধন করিতে পারিতেন। কিন্তু, তিনি তাহা করিলেন না। কারণ, তিনি প্রেমাবতার, প্রেম দিতে আসিয়াছেন! তবে তিনি কি করিলেন? না,

* পাঠকগণ কৃপা করিয়া এই লীলাটী শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত হইতে পড়িয়া লইবেন।

সেই শত্রুদিগকেও প্রেমময় প্রভু আমার প্রেম দিলেন। সে কিরূপে! না—নিজে সন্ন্যাস করিয়া। যাঁহারা প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অবশেষে গৌর বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। যথা—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
একবার নৈদে এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এইবার লাগাইল পাইলে হইব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ॥

এখন দেখুন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী কি! জীবকে তিনি কিরূপে প্রেম দিলেন!

এখন নদীয়াবাসী সকলেরই ভজনের বিষয় হইলেন শ্রীগৌরচন্দ্র। নিমাইয়ের বাল্য-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া পৌগণ্ড-লীলা, কিশোর-লীলা সকলই তাঁহাদের ভজনের বিষয়ীভূত হইল। শিশু নিমাই ক্রন্দনচ্ছলে কিরূপে সকলকে হরিনাম লওয়াইত, নদীয়ার বালককে লইয়া নিমাইচাঁদ কিরূপ বাহু তুলিয়া 'হরিবোল' বলিয়া নদীয়ার পথে নাচিয়া যাইতেন, গঙ্গার ঘাটে তিনি কিরূপ চাঞ্চল্য করিতেন, নিমাই পণ্ডিত কিরূপ নদীয়ার মান রক্ষা করিলেন, তিনি কিরূপ সকরুণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিতেন, কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইয়া সমগ্র নদীয়া তিনি কিরূপ আনন্দময় করিয়াছিলেন, একে একে প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্ত্তের সকল লীলা নদীয়া-বাসী সকলে স্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-মাধুরী সকলের স্মরণ, মনন ও ধ্যানের বিষয় হইল। সুরধুনীর তীরে, নদীয়ার পথে, স্ব স্ব গৃহে, বহিঃপ্রাঙ্গণে, অন্তঃপুরে, সর্ব্বত্রই দশে পাঁচে মিলিত হইয়া গৌর-কথা

আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিমাইচাঁদ সকলের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। ইহাতে কি হইল? না, সকলে পবিত্র হইলেন এবং নিমাইয়ের দর্শন পাইতে লাগিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, নিমাইকে হারাইয়া সকলে নিমাইকে পাইলেন। নিমাইয়ের সন্ন্যাসে প্রকৃত গৌর-ভজন আরম্ভ হইল। এখন দেখুন, নিমাইয়ের সন্ন্যাসে জীবগণ কিরূপে উপকৃত হইল!

এই যে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দর্শন পাইলেন, তাহা কখন স্বপ্নে, কখন বা জাগ্রতাবস্থায়। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন, যে, শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাবানুরূপ কখন সুরধুনীতীরে, কখন বা নদীয়ার পথে, কখন শ্রীশচীমাব শ্রীঅঙ্গনে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন, এবং, অনিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতেন। আবার কিছুকাল পরেই তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিত। প্রভুর আর দর্শন পাইতেন না। এমন কি, অনেকে প্রভুর মধুর কণ্ঠস্বরও শুনিতেন। ইহা আবার একে অন্যকে শুনাইতেন ও দেখাইতেন, তিনিও ভাবের প্রাবল্যে এইরূপ শুনিতেন ও দেখিতেন। কেহ বা ভাবের আতিশয্যে বহু দিন পরে প্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিতেন। অপর লোকে হয় ত দেখিত বা বুঝিত, যে, ইহা বুঝি বিক্ষেপে হইতেছে, কিন্তু, তিনি নিজে কখন তাহা বুঝিতেন না। তিনি সত্য সত্যই গৌরাঙ্গচন্দ্রকে দর্শন করিতেন, ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। আবার, যাঁহারা স্বপ্নে দর্শন করিতেন, তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়াই মানিতেন। আর, বাস্তবপক্ষে সত্য বস্তুর স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয়ই সত্য। মিথ্যার সবই মিথ্যা। এই যে নদীয়ায় ভজন আরম্ভ হইল, আজ্যাপি সেই ভজন চলিতেছে। আজ্যাপি ভজন-পরায়ণ ভক্তগণ কখন দর্শন, কখন অদর্শন, অর্থাৎ, কখন বিরহ, কখন মিলন-রস আস্বাদন করিতেছেন। চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া আমরাও

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, অদ্যাপি শ্রীগৌররায় সেই লীলা করিতেছেন, এবং, ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন।

আর এক কথা। প্রভুর সন্ন্যাসে গৌর-ভজনের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ভগবদ্-ভজন অর্থ ভগবানের লীলা স্মরণ। ভগবানের নরলীলা অবশ্য সর্ব্বোত্তম। ভজন অর্থ এই নর-লীলাই স্মরণ ও আস্বাদন করা। আর ভজন অর্থে কি বুঝায়? না, ভগবানকে স্ব স্ব ভাবানুরূপ অতি নিজ-জন বোধে সেবা করা। ইহাই রাগের ভজন। স্ব স্ব ভাবানুরূপ নিজ-জন কি? না, তিনি প্রভু, বা সখা, বা পুত্র, বা পতি। যিনি যে ভাবের ভজন করিবেন, তাঁহাকে সেই ভাবাপন্ন ভক্তের অনুগামী হইতে হইবে। এইরূপ অনুগত হইয়া ভজন করার সুবিধার জন্যই ভগবান যখন নরলীলা করেন, তখন সেই সেই ভাবের একটী প্রধান ভক্ত বা পার্ষদ লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন ভাবে লীলা করেন। নদীয়া-লীলায় এই দাস্য ভাবের প্রধান ভক্ত ঠাকুর ঈশান দাস, সখ্যভাবে নিত্যানন্দ প্রভু, বাৎসল্যে শ্রীশচীমা, এবং মধুরভাবে নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। এখন স্ব স্ব ভাবানুরূপ ইঁহাদের কাহারও অনুগত হইতে হইবে। আবার সর্ব্বোপরি কথা এই, ইহার প্রত্যেক ভাবের ভজনেই 'শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া'ই ভজনের বিষয় হইবেন। কেন না, শ্রীগৌরাঙ্গ 'প্রভু' হইলে প্রভুপত্নীও ভজনীয় হইবেন। তিনি সখা হইলে পত্নীটিকেও তাঁহার কাছে রাখা বাঞ্ছনীয় ও প্রীতির পরিচায়ক, তিনি পুত্র হইলে পুত্রবধূটীও পরম আদরের বস্তু; আর মধুর ভাবের ভজন করিলে ত কথাই নাই; তখন নিত্যযুগলকিশোরই চির আস্বাদ্য। প্রভুর সন্ন্যাসে—ভজন-মাধুর্য্য কিরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। ভগবানের কোন বস্তুর অভাব নাই। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন

করিয়াছেন, যিনি বিবিধ প্রকারে জীবের চিত্ত রঞ্জন করিতেছেন, কি দিয়া আমরা তাঁহার প্রীতিসাধন করিতে পারি? যদি বল, তিনি বাহিরের কোন বস্তু চাহেন না, তিনি চাহেন মন—মন দিয়া তাঁহার ভজন করিতে হইবে। আমরা বলি, মনেরই কি তাঁহার অভাব আছে? মনের চালক বুদ্ধি, বুদ্ধির চালক অহঙ্কার, এবং সকল অহংতত্ত্বের একমাত্র পরিচালক তিনি, সুতরাং তাঁহার অভাব কিসের? তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়া এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে আর তাঁহার ভজন হয় না, ভজনের যে অপ্রাকৃত আস্বাদন, তাহাও হয় না। ভগবদ্-ভজনে যে সুখ-সিন্ধু, কোটী ব্রহ্মানন্দ তাহার কাছে একবিন্দুও নয়। এ হেন ভজন-সুখ আর ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। কিন্তু, লীলার দিক্ দিয়া দেখিবার কালে আমরা তাঁহার অভাব দেখিতে পাই। যিনি গোলোক-বিহারী, তিনি নদীয়ায় মানুষ-লীলা করিয়া গার্হস্থ্য-সুখ আস্বাদন করিলেন, করিয়া অবশেষে কাঙ্গাল সাজিলেন, বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যিনি ভক্তগণ-প্রদত্ত চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বহুবিধ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে কত সুখ দিতেন, তিনি দিনান্তে এক বার আহার করিতেন কিনা সন্দেহ, ইত্যাদি। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া ভক্তগণ হাহাকার করেন, ও প্রেমাশ্রুপাত করেন। এই দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত ভক্তগণ সুরম্য হর্ম্ম্য করিয়া প্রভুর মন্দির করিয়া দেন, প্রভুকে রাজবেশে সজ্জিত করেন, নানাবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করেন; এবং প্রভুও সময় সময় এতাদৃশ প্রেমিক ভক্তের নিকট নানাবিধ সামগ্রী চাহিয়া লয়েন, ইহাতে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই সুখ। ইহাই হইল ভজনানন্দ। ভগবান্ ভক্তের প্রেমে বিহ্বল, এবং, ভক্ত ভগবানের প্রেম পাইয়া বিহ্বল। এই প্রেম-সেবাই জীব-সৌভাগ্যের চরম সীমা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া জীবগণকে এই মধুর প্রীতির ভজনের সৌভাগ্য দান করিলেন।

শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ ভাবময় হইয়াও নরলীলায় তাঁহার নিজের বহু অভাব সৃজন করেন, করিয়া ভক্তগণকে ভাব-মাধুর্য্য দান করেন, ও, ভগবৎসেবার সহায়তা করেন; তন্মধ্যে ভগবানের সহিত তদীয়া হ্লাদিনী শক্তির বিচ্ছেদ-জনিত অভাবই সর্ব্বপ্রধান। যুগে যুগে এই লীলা প্রকটিত হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারাই জীবগণকে আকর্ষণ ও ভক্তগণের প্রীতির ভজনে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। একটী রামভক্ত সীতার বিরহ-বেদনা সহিতে না পারিয়া কিরূপে সীতা-রাম যুগলরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মৎকৃত নদীয়াযুগল গ্রন্থে * এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। আর একটী রামভক্তের কথা বলিতেছি। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ, রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে তিনি যখন পড়িলেন, সীতাকে দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তখন, তিনি আর পাঠ করিতে পারিলেন না, তিনি কেবল দিবানিশি অঝোর-নয়নে কাঁদিতেন, তাঁহার দুঃখ এই, দুষ্ট রাবণ মা লক্ষ্মী সীতা দেবীকে স্পর্শ করিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার মরণই শ্রেয়ঃ। তাই তিনি স্থির করিলেন, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত উপবাসী রহিয়াছেন। ভক্তের এতাদৃশ প্রেমে ভগবান্ মুগ্ধ হন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ঐ ব্রাহ্মণের বাড়ী উপস্থিত হইলেন, হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। প্রভু ওখান হইতে কিয়দ্দূর চলিয়া গেলেন, সেখানে রামায়ণ পাঠ হইতেছিল; তাহাতে শুনিলেন, রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সত্যই যিনি শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী, তাঁহাকে রাবণ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

---

* পাঠকগণ কৃপা করিয়া এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অনুগৃহীত হইব। বহু পণ্ডিত ও ভক্ত মহাজন ইহা পাঠে আনন্দ পাইয়াছেন।

প্রভু এই কথা শুনিয়া এই রাম-ভক্তের দুঃখ অপনোদনের জন্য আর একখানি পত্র লেখাইয়া উহা পাঠককে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ গ্রন্থের পুরাতন পত্রখানি চাহিয়া লইলেন, এবং পুনরায় সেই ভক্তের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে উহা দেখাইলেন, ভক্তটী আশ্বস্ত হইলেন, এবং, তিনি যে অন্ন জল ছাড়িয়াছিলেন, এখন তাহা গ্রহণ করিলেন, রন্ধন করিয়া বিবিধ উপচারে সীতারামের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইলেন। এখন দেখুন, ভগবান্ বিরহলীলা দ্বারা ভক্তগণের মাধুর্য্য-ভজনের কিরূপ পোষণ করেন! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন।

গৌর-লীলায় এই প্রীতির ভজনের পরাকাষ্ঠার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঠাকুর নরোত্তম গৌর-প্রেম-রসে ডুবিয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের অভীষ্ট বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীবের লাগিয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন, প্রভু তাঁহার প্রাণ-বল্লভা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছেন, ইহা তাঁহার সহিল না; তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জীব যখন উদ্ধার হয়, তখন সে ভগবানকে ভজন করিতে আরম্ভ করে, এবং, নিজে উদ্ধার হইলে সকলেই উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া মনে করে। ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন, প্রভুর এই পাষাণ-গলান সন্ন্যাসলীলা দ্বারা সব জীব উদ্ধার হইয়াছে। তখন তিনি একান্তে বসিয়া প্রভুর ভজন করিতে চাহিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভজন অর্থ ইষ্ট বস্তুর প্রীতিসাধন বা প্রীতির সেবা। ভগবানকে পাইলে ভক্ত আর কি করেন? সর্ব্বস্ব দিয়া ভগবানের সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন। ঠাকুর মহাশয় ভাবিলেন, 'আমি প্রভুকে কি দিব! আমার আছেই বা কি? প্রভুর প্রীতিসাধন করা যায়, এইরূপ বস্তু জগতে কোথায়?' তিনি দেখিলেন, 'এই বস্তুটি একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া; তত্ত্বতঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া একই বস্তু—যেমন, ফুল ও ফুলের গন্ধ, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, তথাপি, লীলা-মাধুর্য্যের জন্য ও ভক্তগণকে ভজনানন্দ দেওয়ার জন্য ইঁহারা পৃথক্।' ঠাকুর মহাশয় ভাবিলেন বটে যে, শ্রীমহাপ্রভুকে সন্ন্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াস্তিকে বসাইবেন, কিন্তু, তাহার পরই তাঁহার মনে হইল, এই বিষ্ণুপ্রিয়া ত তিনিই; তাই তিনি বলিলেন—

কি দিব, কি দিব, বঁধু, মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি॥

তাহা হইলেও ভক্তের একটা কর্ত্তব্য আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তিনি আত্মকৃতার্থতা বোধ করেন; তাই ঠাকুর মহাশয় আবার বলিলেন—

তুমি ত আমার বন্ধু, সকলি তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব, কি আছে আমার॥

ঠাকুর নরোত্তম বলিলেন, "প্রভু, তুমি পতিতের বন্ধু, আমি ভবকূপে পড়িয়াছিলাম, আমাকে উদ্ধার করিয়া তুমি ত বন্ধুর কার্য্য করিলে! আমারও তো কিছু করা প্রয়োজন! বন্ধুর প্রতি বন্ধুর একটা কর্ত্তব্য আছে। বঁধু হে! আমি তোমায় কি দিব! কি দিয়া তোমার প্রীতি সাধন করি! 'আমার' বলিতে ত্রিজগতে কিছুই নাই, যে দিকে তাকাই, সকলই ত তোমার! তোমার বহু প্রীতির সামগ্রী রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রিয় বস্তু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু হে, বন্ধু হে, বল্লভ হে, তোমার কঠোর সন্ন্যাসের নিয়ম দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ বাহিরিয়া যাইত; তাই তুমি তাহাদের নিকট স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিতে পারিতে না। তাই তাঁহারা উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি দ্বারা নানাবিধ উপচারে তোমার সেবা করাইতেন। শাল্যন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, নবনীত, পিষ্টকাদি তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতেন; তুমি,

ভক্তগণ ব্যথা পাইবেন ভয়ে, তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতে না। কিন্তু প্রভু,প্রাণবল্লভ আমার,তোমার পরম প্রিয় বস্তু নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমাকে তাঁহারা দিয়া যাইতে পারেন নাই। আমার সাধ হয়, এখন সেই বস্তুটী তোমাকে দেই। দিয়া আত্মকৃতার্থতা বোধ করি ; তুমি যুগল হইয়া থাক, আমি দর্শন করিয়া ধন্য হই। প্রভু হে! গৌর আমার! ইহাতে আমার কিছুই কৃতিত্ব নাই। তোমার ধনই, বন্ধু, তোমায় দিতেছি। প্রভু, প্রাণ-বঁধুয়া আমার, তুমি আমার লাগিয়া সন্ন্যাস করিলে, কত দুঃখ সহিলে. নিজে কাঁদিলে, শ্রীমতাকে কাঁদাইলে, নদীয়া শূন্য করিলে, এ সব দুঃখের কথা আমি কাহারে কই! ইহা যে আমি আর সহিতে পারি না! নদীয়ার চাঁদ তুমি নদীয়ায় আসিয়া উদিত হও! যুগল হইয়া বিরাজ কর! আর সাধ হয়, এই অযোগ্যকে ঐ যুগল-চরণে চিরদাসী করিয়া রাখ!

যথা পদ—এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব।
তোমার ধন তোমায় দিয়া দাসী হ'য়ে রব॥

"প্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়া ত তোমারই ধন। আমি তোমায় নূতন কি দিতেছি! চির মিলিত তোমরা। শুধু জীবের লাগিয়া এই বিরহ। জীব হরিনাম পাইয়াছে—উদ্ধার হইয়াছে। আর কেন? এখন আবার নিত্য মিলিত হও। আমায় তোমার সেবার অধিকার দেও"। ইহার পরই আবার ঠাকুর মহাশয় * বলিতেছেন, "প্রভু, তোমাদের ঐ যুগল-চরণ-সেবা ছাড়া আমার আর গতি নাই। আর কিছুতেই আমার প্রীতি হয়না ; যথা—

নরোত্তম দাস কহে—শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি॥

---

* শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী আপনারা কৃপা করিয়া নরোত্তমচরিত (শ্রীল শিশির বাবুকৃত) ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে পাঠ করিবা লইবেন।

ভক্তের এই প্রেমের নিবেদন প্রভু শুনিলেন। প্রভু তখন অপ্রকট, তিনি ঠাকুর মহাশয়কে আদেশ দিলেন, "নরোত্তম, আমি শ্রীমতীকে লইয়া গোপালপুরে বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় লুকাইয়া রহিয়াছি। তুমি আমাদিগকে অচিরে প্রকাশ কর।" ঠাকুর মহাশয় আদেশ অনুযায়ী সেখানে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ অপ্রাকৃত ভাবে পাইলেন। তখন গৌর-নিত্যানন্দ সেবা স্থানে স্থানে হইত বটে, সে-ও অতি বিরল। কিন্তু নদীয়া-যুগল-বিগ্রহ-সেবা বড় একটা হইত না। যে সেবা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে, তাহার পুরাতন শ্রীবিগ্রহ স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতে পারে বটে; কিন্তু, এই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-বিগ্রহ-সেবা পূর্ব্বে প্রকাশিত না থাকায় অপ্রাকৃত ভাবেই তাঁহাদের প্রকাশ হইল। * এখন দেখুন, এই যুগল-সেবা প্রভুর কিরূপ অভিপ্রেত, এবং কলির জীবের কিরূপ কল্যাণদায়ক।

ঐ যে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান্ স্বীয় অভাব সৃজন করিয়া প্রীতির ভজনে আনন্দ বর্দ্ধন করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঠাকুর মহাশয়কে দিয়া তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ দিলেন। অদ্যাপি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণে ভক্তগণ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌরবামে বসাইয়া ভজন করেন, ও অপার আনন্দ অনুভব করেন। আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন প্রেমিক ভক্ত নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া শ্রীমতীর কাছে রাখিয়া বলেন, "ঠাক্‌রুণ, তখন তুমি প্রাণের সাধ মিটাইয়া প্রভুর সেবা করিতে পার নাই, এখন আমি সাধ্যানুরূপ সব সামগ্রী আনিয়া দিতেছি; তুমি প্রাণ ভরিয়া সেবা কর; আমরা দেখিয়া ধন্য হই।" এই বলিয়া ভক্ত প্রেমাশ্রুপাত করিয়া থাকেন। প্রভু-প্রিয়াজীও এই প্রেমের সেবা

---

* এই সেবা প্রকাশ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দশমতরঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ পড়িলে সকলে সুখ পাইবেন।

পাইয়া ভক্তদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন। ভক্তকে সুখ দেওয়ার জন্য তাহার নিদর্শন রাখিয়া দেন। ইহা দেখিয়া ভক্ত আনন্দে আরো আপ্লুত হন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত অদ্যাপি আমরা দেখিতেছি। তাই বলিতেছিলাম, প্রভুর এই সন্ন্যাসে ভক্তগণের ভজনানন্দ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

বিরহও একটী রস। ইহাতেও আনন্দ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রভুর অবতারের মূল উদ্দেশ্য প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করা ও রাগমার্গ-ভক্তি জীবের নিকট প্রচার করা। এই প্রেম-রসনির্য্যাস সম্বন্ধে এখানে আর একটু আলোচনা করা যাউক। প্রেম-রস-নির্য্যাস কি? না, ছাঁকা প্রেমরস, অর্থাৎ, ইহাতে ঐশ্বর্য্যের গন্ধলেশও নাই। রস চতুর্ব্বিধ—দাস্য প্রেম, সখ্য প্রেম, বাৎসল্য প্রেম, মধুর প্রেম। এই চারিবিধ প্রেমরসেরই নির্য্যাস প্রভু আস্বাদন করিতে আসিলেন। যিনি যে ভাবের বা যে রসের ভক্তই হউন, তিনি যেমন স্ব স্ব ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া রস আস্বাদন করেন, ভগবানও সেই সেই ভাবের ভক্তকে তদনুরূপ ভালবাসিয়া সুখ পান ও আস্বাদন করেন। দাস যেমন প্রভুকে ভক্তিমিশ্রিত ভালবাসা দিয়া সুখ পান, প্রভুও তদ্রূপ দাসকে স্নেহ করিয়া সুখ অনুভব করেন। সখ্য ভাবে ভক্ত ভগবান্‌কে সখা বলিয়া ও সখ্য-ভাবোচিত রসরঙ্গ করিয়া যেরূপ সুখ পান, ভগবানও সেই ভাবের ভক্তকে সখা বলিয়া ও তাঁহার সহিত রসালাপ করিয়া প্রীতি পান। বাৎসল্য ও মধুর রসেও এইরূপ উভয়ের তুল্য প্রীতি। প্রত্যেক ভাবের ভক্তের নিকটই ভগবান্ সেই সেই রসের পূর্ণ মূর্ত্তি। ভক্তগণকে তিনি যেরূপ রস আস্বাদন করান, তিনি নিজেও সেইরূপ রস আস্বাদন করেন। এই রস আস্বাদন ব্রজধামে পূর্ণরূপে হয় নাই। ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। নিতাই গৌরকে ভালবাসেন। তিনি দাস্য ও সখ্য এই উভয় রসই আস্বাদন করেন; কারণ, সখ্যের মধ্যে দাস্য রস ত আছেই। পর পর

রসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস রহিয়াছে, যথা—দাস্য প্রেমে কেবলমাত্র দাস্যরস আস্বাদন করা যায়, আর, সখ্যপ্রেমে দাস্য ও সখ্য উভয় রসই আস্বাদন করা যায়। এইরূপ বাৎসল্যপ্রেমে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনটী রস আছে; আর, মধুর প্রেমে চারিটী রসই আছে। যাহা হউক, নিতাইয়ের গৌর-প্রেম কত গভীর দেখুন! নিতাই কহিলেন, 'যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ, সে হয় আমার প্রাণ রে!' যিনিই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে ভজন করিবেন, তিনিই শ্রীনিতাইচাঁদের প্রাণ হইবেন। এখন, নিতাইচাঁদের গৌর-প্রেম যে কি গভীর অতলস্পর্শী, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! এইরূপ একটী কথা ব্রজধামে উঠে নাই। সেখানে সখ্য প্রেমের কোন ভক্ত একথা বলেন নাই যে, 'যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে'। নিতাই সখ্যপ্রেমে এতই ডুবিয়া গিয়াছেন,যে, তিনি এ রস-সমুদ্রের আর কুল কিনারা পাইতেছেন না,তিনি দেখিতেছেন,- এ যে অফুরন্ত অনন্ত রসবারিধি, একলা তিনি কত আস্বাদন করিবেন! একলা আস্বাদন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না; তাই তিনি জনে জনে ডাকিয়া ডাকিয়া, কাতর আহ্বান করিয়া, কখন বা আলিঙ্গন দিয়া, আর কখন বা পায়ে ধরিয়া কহিতেছেন, 'ভাইরে, আমি একলা কত আস্বাদন করিব! গৌর যে অনন্ত রসনিধি! আয়রে! তোরাও একটু আস্বাদন কর্! করিয়া তোরাও তৃপ্ত হ, আমাকেও তৃপ্ত কর্। তোরা এই গৌর-রস আস্বাদন করিয়া হৃদয় জুড়া।' আর, নিতাই সখ্যপ্রেমে এতই বিভোর যে, জীবমাত্রকেই ভাই বলিয়া ডাকিতেছেন, আর ভাই বলিয়া ভালবাসিতেছেন। যাঁহারা জগতকে ভাই বলিতে চাহেন—সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহারা নিতাইয়ের মত গৌরকে ভাই বলিয়া ডাকুন, ভাই বলিয়া ভালবাসুন, গৌরাঙ্গের সহিত সখ্য-প্রেম-রস আস্বাদন করুন, দেখিবেন, জগতের যাবতীয় জীব—তরু লতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত

অতি সহজে স্বাভাবিক-অবস্থায়ই আপনাদের ভাই হইয়া যাইবে। এখন দেখুন, নিতাই সখ্যরস কিরূপ পূর্ণভাবে আস্বাদন করিয়াছেন! এখানে শুধু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কথাই বা বলি কেন, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিত্যানন্দ প্রভুর পরবর্ত্তী লোক। তিনি বলিলেন—

গৃহে বা বনেতে থাকে 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।

তিনি বলিলেন, গৃহীই হউন, বা যে কোন আশ্রমের লোকই হউন, যিনিই 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকিবেন, তিনি তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। এখন, ঠাকুর মহাশয়ের গৌর-প্রেম কত গভীর, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ঠাকুর মহাশয় নিত্যানন্দ প্রভুর শক্ত্যাবেশ অবতার। নিতাই সখ্য রসের রসিক, তিনি সখ্যরস পূর্ণ আস্বাদন করিলেন বটে; কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম এই যে, যিনি প্রেমের আস্পদ, তাঁহাকে সুখ দিতে হইবে। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে নবদ্বীপে রাখিয়া সন্ন্যাস-বেশ লইয়া নীলাচলে যাইয়া একাকী বাস করিলেন। ইহা নিতাইয়ের প্রাণে অবশ্য অসহনীয় হইয়াছিল। একদিন তিনি শ্রীনবদ্বীপে নদীয়াযুগল দর্শন করিয়া আনন্দে এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, আত্মহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, এবং নৃত্য করিতে করিতে পরিধানের বসন পর্য্যন্ত রহিল না। এইরূপ বিবশ অবস্থায় তিনি বহু ক্ষণ ছিলেন। প্রাণের ভাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া সুখে বাস করিতেছেন, নিতাই এ আনন্দে ভরপুর। ব্রজধামে সখাগণ তাঁহাদের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে এরূপ সুখ-বিলাসে সর্ব্বদা দেখিতে সুযোগ পাইতেন না। সুতরাং, সেখানে পূর্ণ আস্বাদন হইল না, শ্রী নবদ্বীপে তাহা হইয়াছে। তার পর, যখন প্রভু নীলাচলে যাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন, এবং অশেষ কঠোরতা আরম্ভ করিয়া দিলেন, নিতাইয়ের ইহা সহিলনা;

অথচ,স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতেও পারেন না। এই যে নিতাই গৌরাঙ্গের জন্য কাঁদিলেন, গৌরাঙ্গও তদ্রূপ নিতাইয়ের জন্য কাঁদিলেন। রস উভয়েই তুল্য আস্বাদন করে। নিতাই বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসী, বহু কঠোরতা করিয়াছেন, পদব্রজে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। অবশেষে নদীয়ায় গৌরকে পাইয়া তিনি সব দুঃখ ভুলিলেন। প্রেমের স্বভাব এই, প্রেমাস্পদের সুখেই সুখ হয়, নিজের সুখানুসন্ধান থাকে না। নিতাইয়ের এখন সে সুখ হইয়াছে। কিন্তু, প্রভুর সন্ন্যাসে নিতাইয়ের সে সুখের অবসান হইল। প্রভুর কঠোরতায় নিতাইয়ের হৃদয়ে যে বিষম শেল লাগিয়াছে, প্রভু ইহা জানেন। তবে তিনি কি করিবেন? জীবোদ্ধারের লাগিয়া তাঁহার এইরূপ কঠোরতা করিতেই হইবে। অথচ, নিতাই দুঃখ পান, ইহা প্রভু সহিত পারিতেছেন না। তাই তিনি নিতাইকে কাছে রাখিলেন না। নিতাইকে প্রভুর কঠোরতা আর দেখিতে দিলেন না। তাঁহাকে তিনি গৌড় দেশে পাঠাইয়া দিলেন। পরন্তু, নিতাই সুখে থাকুন, এই বাঞ্ছা করিয়া প্রভু নিতাইকে বিবাহ করাইলেন। সে-ও কিরূপ? না, নিতাইয়ের সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট করিয়া। একবার ভাবুন, নিতাই প্রভুর সুখের জন্য কিরূপ ব্যস্ত! তিনি বাল্যকাল হইতে কঠোর সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। সেই নিতাইকে প্রভু এখন গৃহী করিতে চাহিলেন। প্রভুর প্রত্যেক কার্য্যেরই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করা, বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার করা। নিতাইকে যে প্রভু বিবাহ করাইতে চাহিলেন, তাহারও অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য এখানে সখ্য-প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করা, অর্থাৎ নিতাই যেমন তাঁহার প্রাণের ভাই গৌরাঙ্গসুন্দরের সুখ বাঞ্ছা করেন, গৌরাঙ্গসুন্দরও তাঁহার প্রাণের ভাই নিতাইয়ের সুখ বাঞ্ছা করিলেন, আর, বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য এই যে, নিতাইকে বিবাহ করাইয়া প্রভু জীবকে

বুঝাইলেন ও দেখাইলেন যে,তিনি যে প্রেম-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেই প্রেম-চর্চ্চা করার অন্তরায় নহে। যাহা হউক, প্রভু চাহিলেন শ্রীনিতাইয়ের সুখ, কিন্তু নিতাই তাহাতে তাঁহার সন্ন্যাসব্রত ভাঙ্গিবেন কেন? তার পর, প্রভু যখন বলিলেন, 'নিতাই, তুমি বিবাহ কর, আমার তাহাতে সুখ হইবে।' যেই প্রভু বলিলেন যে, নিতাই বিবাহ করিলে প্রভুর সুখ হইবে, তখন আর তিনি দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। নিতাই চাহেন প্রভুর সুখ, সে জন্য তিনি সব করিতে পারেন। নিতাই বলিলেন, 'তা প্রভু, আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় হউক, আমার সব ব্রত ভঙ্গ হয় হউক, আমাকে লোকে এজন্য গালি দেয় দিউক, তুচ্ছ করে করুক, তবু তুমি সুখে থাক।' নিতাই প্রভুরই সুখের নিমিত্ত গৌড়দেশে আসিলেন, আসিয়া লোকের কাছে যাচিয়া যাচিয়া উপস্থিত হন। লোকে তাহাতে নিতাইকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহাতে নিতাইয়ের কি! তিনি চাহেন প্রভুর সুখ, প্রভুকে সুখ দিতে হইবে; এখন তাহাতে নিজের যা-ই হউক। নিতাইকে সকলে জানেন, নিতাই কি বস্তু, কিরূপ কঠোরতা করিয়া আসিতেছেন; সেই নিতাই এখন প্রাকৃত লোকের ন্যায় বিবাহ করার জন্য লোকের কাছে উপযাচক হইয়া প্রস্তাব করিতেছেন। সুতরং শ্রীনিতাইয়ের এই কার্য্য বাতুলতা বলিয়াই সকলে মনে করিল। কিন্তু, নিতাইয়ের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, তাহা শুনিবার বা ভাবিবার তাঁহার অবসর নাই। যে নিতাই বালক-ভাবে বিহার করিতেন, স্ত্রী-লোক মাত্রকেই মা বলিয়া ডাকিতেন, সেই নিতাইকে এখন বিবাহ করিতে হইবে। না করিয়া করেন কি? তিনি চাহিতেছেন একমাত্র তাঁহার প্রাণের ভাই শ্রীগৌরচন্দ্রের সুখ। অবশেষে তিনি সত্য সত্যই সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়া গৃহী হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করা যত সহজ, উহা ভঙ্গ করিয়া আবার গৃহী হওয়া তত সহজ নহে। এক দিকে যেমন লোক-নিন্দা-ভয়, অন্যদিকে

আবার তেমনই ততোধিক ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পতনের ভয়। কিন্তু, নিতাই সে ভয় করিলন না; তিনি গৌরাঙ্গের সুখের জন্য আপনাকে একবারে বিলাইয়া দিলেন। তিনি বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রাম্য-রসে ডুবিলেন না। তিনি দ্বারে দ্বারে জীবকে গৌর-ভজন করিতে, গৌরনাম লইতে, উপদেশ দিতে লাগিলেন, শুধু উপদেশ নয়, জীবের নিকট এই জন্য কাতর-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন দেখুন, নিতাই যেমন গৌরাঙ্গের সুখে সুখী, গৌরাঙ্গও তেমন নিতাইয়ের সুখে সুখী। উভয়েই সখ্যরস পরস্পর পূর্ণ মাত্রায় আস্বাদন করিয়াছেন। প্রভুকে সুখ দেওয়ার জন্য নিতাই এরূপ করিলেন বটে, কিন্তু, তাঁহার বড় দুঃখ রহিয়া গেল, সে দুঃখ তিনি চাপিয়া রাখিলেন। সে দুঃখ এই, প্রভু তাঁহার সুখের ব্যবস্থা করিলেন, নিতাই ত প্রভুর সুখের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে তাঁহার প্রাণের পরম প্রেষ্ঠ নদীয়াযুগলের বিরহ দর্শন করিতে হইল। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনবাস করিয়া যে দুঃখ পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রকে বনে রাখিয়া নিজে রাজ্যভোগ করিয়া তদপেক্ষা কোটী গুণে অধিক দুঃখ পাইলেন। কিন্তু, শ্রীরামচন্দ্রের সুখের জন্য তাঁহারই আজ্ঞায় সে দুঃখ চাপিয়া রাজ্য শাসন করিলেন। শ্রীনিতাইও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু, এ দুঃখ তাঁহার আগুণের মত হৃদয়ে সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিত। এই দুঃখ দূর করার জন্যই তিনি অবশেষে নরোত্তম ঠাকুর রূপে আবির্ভূত হইয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মিলন করাইলেন—নদীয়া-যুগল-সেবা প্রকাশ করিলেন। কিরূপে, কি ভাব লইয়া ইহা করিলেন, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। ইহাই হইল সখ্য-প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন। নবদ্বীপ লীলায় ইহা হইয়াছে। ব্রজধামে ইহা অপূর্ণ ছিল। এই পূর্ণতার জন্যই গৌর-অবতার।

এখন, মধুর প্রেমের রস-নির্য্যাস আস্বাদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মধুর রসের রসিক। তিনি কান্তভাবে ভজন করিতেন। তিনি বলিলেন—

আমার সাধন হ'ল সারা, আমার ভজন হ'ল সারা।
গৌরাঙ্গের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা।

এই নরহরি সরকার ঠাকুরের একটী পদ দেখুন, তিনি বলিতেছেন—

গৌর শবদ গৌর সম্পদ
যাহার হৃদয়ে জাগে।
নরহরি দাস অনুগত তার
চরণে শরণ মাগে॥

গৌর-প্রেমে তিনি এতই বিভোর, গৌরনাম তাঁহার নিকট এতই মিষ্ট, যে, তিনি বলিতেছেন—যাঁহার হৃদয়ে 'গৌর' এই শব্দটী জাগে, তিনি তাঁহার চরণে শরণ মাগিতেছেন। এখন একবার ভাবুন দেখি, সরকার ঠাকুরের গৌরপ্রেমের গভীরতা কত অসীম, কত অপরিমেয়! আচ্ছা, এই যে তিনি কান্তভাবে ভজন করিতেন, ইহার মূল কোথায়? কাঁহার আদর্শে তিনি এই ভজন পাইলেন! অবশ্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই এই মধুর প্রেমের পূর্ণ আদর্শ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ারই পরিপূর্ণ কান্ত। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াই নবদ্বীপের এই মধুর রসের পরিপূর্ণ আদর্শ। এখন একবার ভাবুন, নরহরি সরকার ঠাকুরের মধুর প্রেমের গভীরতাই যদি নির্ণয় করিতে না পারেন, তবে তিনি যাঁহার নিকট হইতে এই প্রেম-রসের কণা পাইয়াছেন, যে মহাভাবের অংশমাত্র পাইয়া গৌরপ্রেমে এতই বিভোর হইয়া ঐরূপ কথা কহিতে পারিয়াছেন, সেই মহাভাবময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুর-প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদনের পরিমাণ কে করিবে! সে যে পরিপূর্ণতম! যেমন শ্রীমতী প্রভুকে লইয়া এই প্রেম-রস-নির্য্যাস পরিপূর্ণরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, প্রভুও আবার

তেমনই তুল্যভাবে শ্রীমতীকে লইয়া এই মধুর-প্রেম-রস-নির্য্যাস পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়াছেন। ব্রজধামে এই রস আস্বাদনে বহু অন্তরায় ছিল; প্রথম কারণ, সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলনা, আর, নবদ্বীপে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, কারণ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া আর পরনারী নহেন। এই প্রেমের এখানে পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই, ইহার কণা পাইয়াছেন যে নরহরি, তাঁহার মুখে ঐ কথা শুনা গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে এইরূপে বিভিন্ন ভাবানুরূপ ভক্তের সহিত চতুর্ব্বিধ প্রেমরসেরই নির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন, ইহাকেই বলে প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন, ইহাই তাঁহার অবতারের মূল প্রয়োজন।

জগতের বহুসংখ্যক জীবই ভগবান্কে ঈশ্বর জ্ঞানে বড় মনে করিয়া ভক্তি করে, অর্থাৎ, ঐশ্বর্য্যের ভজন করে ও ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে, ইহাতে জীবও সুখ পায়না, ভগবান্ও সুখ পাননা; কারণ, এতাদৃশ ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে জীবের কোন সম্বন্ধ হয় না, কেবলমাত্র ভগবানের দান ঐহিক দ্রব্যের সহিত জীবের সম্বন্ধ হয়, ইহাতে ভোগবাসনা তৃপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দুঃখ আনয়ন করে। ইহার সকলই কৈতব। ইহার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা সর্ব্বপ্রধান কৈতব, ইহাতে বিশুদ্ধ ভক্তি একবারে অন্তর্ধান করে, এবং, ভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধস্থাপনে যে অপার আনন্দ, যাহা অনন্ত কাল আস্বাদন করিলেও কখন পুরাতন হয়না, নিত্যই নবনবায়মান থাকে, তাহা হইতে জীব বঞ্চিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রধান কৈতব বলার তাৎপর্য্য কি? সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিও কৈতব বটে, তবে সাযুজ্য মুক্তিকে প্রধান কৈতব বলা হয়। এই কৈতব হইলে কৃষ্ণপ্রেম একবারে অন্তর্ধান করে। তাহার হেতু এই—প্রেম আস্বাদন করিতে দুইটী বস্তুর পৃথক্ সত্বার প্রয়োজন।

সেব্য ও সেবক এই দুইটী বস্তু। ব্রহ্মসাযুজ্য অর্থ ব্রহ্মে লীন হওয়া বা মিশিয়া যাওয়া; ইহাতে আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা, সুতরাং, ভক্তি বা প্রেম আস্বাদন হইবে কিরূপে? অন্য প্রকারের মুক্তিতে বা বাঞ্ছাতে তবু ভক্তি পাওয়ার আশা আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, মজে কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

কৈতব বলিতে আত্মসুখ বুঝায়। মোক্ষবাঞ্ছা আত্মসুখ-বাঞ্ছার পূরাকাষ্ঠা, আত্মসুখের নিমিত্ত জীব জগতের যাবতীয় বস্তু ভোগ করিতে যায়, কিন্তু ভোগে সুখ হয়না, যেহেতু ভোগ করিতে জানেনা, পরন্তু সর্ব্ববস্তুতেই জ্বালা বোধ করে, তখন একবারে সকল নির্ব্বাণ করিতে, অথাৎ, নিভাইয়া ফেলিতে চায়, এবং, ব্রহ্মে লীন হইতে বাঞ্ছা করিয়া সকল জ্বালা একবারে জুড়াইতে চায়। বহুসংখ্যক জীবই এই শ্রেণীর। ভগবান্ রসময়, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন, তিনি স্বয়ং প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবেন; এবং তিনি করুণাময়, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন, জীবকে তিনি তাঁহার প্রেমসম্পত্তি দান করিবেন, অর্থাৎ, রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিবেন। এই প্রচারকার্য্য তিনি বলিয়া কহিয়া বক্তৃতা দিয়া করেন নাই; নিজে যে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাতেই জীব, রাগ-ধর্ম্ম কি, তাহা পাইয়াছে। সমুদ্র যদি উদ্বেলিত হয়, তবে তীরও প্লাবিত হয়; এই প্লাবনে স্বভাবতঃ সকলেই ডুবিয়া যায়। ভগবান্ ইচ্ছা করিলেন, এই প্রেম-রস-নির্য্যাস এরূপভাবে আস্বাদন করিতে হইবে যে, রস-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়, এবং তাহাতে সকলেই স্বভাবে আপ্লাবিত হয়। এই হেতুই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অবতার। অন্য কোন অবতারে এরূপ রস-নির্য্যাস পূর্ণরূপে আস্বাদন হয় নাই বলিয়াই রাগমার্গ-ভক্তি জীবের

নিকট এইরূপ বহুল প্রচারিত হয় নাই। গৌর-অবতারের ইহাই বিশেষত্ব।

এখন এই সঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকটীর উন্নতোজ্জ্বল রস কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সাধককণ্ঠহার গ্রন্থে নামসংকীর্ত্তনের মধ্যে পদকর্ত্তা কৃষ্ণদাস কহিতেছেন—

জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্ব্ব-রস-সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥

অর্থাৎ, তিনি বলিতেছেন, যে, ব্রজে পরকীয়া ভাবে যে রস প্রচার হইয়াছে, ইহাই উজ্জ্বল রস। তিনি ব্রজরসকেই উজ্জ্বল রস বলিয়াছেন, এবং ইহা ব্রজে প্রচার হইয়াছে, তাহাও তিনি বলিলেন। সুতরাং, যে রসটী এত দিন অনর্পিত রহিয়াছে, এবং যাহা দিতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর করুণা করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, সে রসটি কি? না,—উন্নতোজ্জ্বল রস, ইহাই নবদ্বীপলীলা-রস। ভগবান রসময়—রসিকশেখর। তাঁহার পরিপূর্ণ রসময় ক্রীড়াস্থল শ্রীগোলোক। এই গোলোক হইতেই উজ্জ্বল রস ব্রজে প্রচার হইয়াছে, এবং উন্নতোজ্জ্বল রস শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ হইয়াছে। রস বস্তুটী কি, ইহা বুঝিলে উজ্জ্বল রস ও উন্নতোজ্জ্বল রস আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। ভগবান্ এক—রসো বৈ সঃ। তিনি রসস্বরূপ। তাই তিনি এক হইয়াও বহু হইলেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃজন করিয়া এক অপূর্ব্ব খেলা পাতাইলেন, ইহা রসের খেলা, এই সৃষ্টিই তাঁহার রসের বিকাশ। ইহার মধ্যে আবার তিনি যে জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রেমের লীলা করিলেন, তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও যে প্রেম-পরতন্ত্র হইলেন—সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রেমের অধীন হইলেন, ইহাই রসের সার বা নির্য্যাস। রাম-লীলায় তিনি এইরূপ প্রেম-পরতন্ত্র হইলেন বটে, কিন্তু, ব্রজলীলায় এই রসের বিকাশ —রসের খেলা আরো উজ্জ্বল ও মধুর হইয়াছে বলিয়া ব্রজরসকে উজ্জ্বল

রস বলা হয়। এবং সর্ব্বশেষে গৌর-অবতারে এই প্রেমের সম্বন্ধ ও প্রেম আস্বাদন ব্রজ অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল, সুমধুর ও সমুন্নত হইয়াছে বলিয়া নদীয়ার লীলা-রসকে উন্নতোজ্জ্বল রস বলিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায়, ব্রজের বাহিরে ত দূরের কথা, ব্রজধামেই শ্রীকৃষ্ণ অসুরাদি বিনাশ করিয়াছেন, যদিও তিনি ইহা মধুর ভাবেই করিয়াছেন বটে, তথাপি বিনাশ কথাটী থাকায় ও কার্য্যতঃ বিনাশ দেখায় কৃষ্ণের সঙ্গে নিজ-জনবোধে সম্বন্ধ স্থাপনে বহু লোকেরই ভীতি হয়। কারণ, বিনাশ অর্থই দোষ-দর্শন করিয়া সেই দোষযুক্ত ব্যক্তিকে শাসন করা, বা তাহাকে পৃথিবী হইতে একবারে সরাইয়া দেওয়া, যেন, সেই দোষ অপরকে কলুষিত করিতে না পারে। জীবমাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে দোষযুক্ত, কারণ সে মায়াধীন। কৃষ্ণের ঐ অসুর-বিনাশ-লীলা দর্শন করিয়া কোন্ সাহসে সে কৃষ্ণের সম্মুখীন হইবে? সম্বন্ধ স্থাপন করা ত দূরের কথা! আর, গৌরলীলায় আমরা কি দেখিতে পাই! দেখি, তিনি কাহারো দোষ দর্শন করিলেন না। নির্বিচারে, পাত্র অপাত্র ভেদ না করিয়া সকলকেই ভালবাসিলেন— সকলকেই কোল দিলেন। তিনি যারে তারে প্রেম দিলেন—

মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি, জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মালাকার। তিনি মালাকার হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেমফল বিলাইলেন। অতিশয় যে দরিদ্র—অর্থাৎ—যিনি সাধন-ভজন-হীন, প্রেম পাওয়ার যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আশা নাই, তিনিও

এই প্রেমফল কুড়াইয়া লইলেন—সকলেই গৌরকে ভালবাসার অবসর পাইলেন। শুধু তিনি একা বিলাইলেন না। তিনি বলিলেন—

* * আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

জীব এহেন অদোষদর্শী বস্তুটী পাইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিল—তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল, এমন কি, এহেন প্রাণের বান্ধব পাইয়া তাঁহাকে লইয়াই দু-বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে পতিতের বন্ধু, তাহার সাক্ষী জগাই মাধাই। যথা—

মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিত পাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥

জগাই মাধাই পর্য্যন্ত প্রভুর আলিঙ্গন পাইলেন দেখিয়া জীবের আর শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ও তাঁহাকে প্রাণের পরম বান্ধব —অতি নিজ জন বলিতে ভয় বা সঙ্কোচ রহিল না। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাড়ীতে লক্ষ্মীভাবে নৃত্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন, 'যাহার কাম আছে; সে আমার নৃত্য দর্শন করিতে অধিকারী হইবে না।' শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সরলভাবে স্পষ্টই বলিলেন, 'তবে, প্রভু, আমার ভাগ্যে আর তোমার নৃত্য দর্শন করা হইবে না।' শ্রীবাসাদি অপরাপর ভক্তবৃন্দও এই কথাই বলিলেন। শ্রীভগবান্ দেখিলেন, তাহা হইলে, তিনি যে এক, সেই এক-ই থাকিয়া যান। আর তাঁহার রসাস্বাদন হয় না। তখন প্রভু বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি কাহাকে লইয়া রসাস্বাদন করি, আর, কাহাকেই বা রসাস্বাদন করাই! আচ্ছা, আমার বরে তোমাদের কাহারও কাম থাকিবে না।' তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং অন্যান্য সকল ভক্তবৃন্দই

বলিলেন, 'তাহা হইলে আমরা পারি।' এই বলিয়া তাঁহারা প্রভুর লক্ষ্মীভাবে নৃত্য দর্শন করিতে চলিলেন ও দেখিলেন। এইরূপে প্রভু মায়াকে দয়া করিয়াছেন, এবং ইহার প্রভাবেই সকলে প্রভুর সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতে অধিকার পাইয়াছে। এই যে সকলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লীলা-রস সুখ আস্বাদন করিতে অধিকার পাইয়াছে, ইহাই উন্নতোজ্জ্বলরস। ইহার কেন্দ্র শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। যে জিনিষ যত উজ্জ্বল হয়, তাহার দীপ্তি ততই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন, ইহার উজ্জ্বলতা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ,তেমনই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি ত স্বীয় প্রাণবল্লভকে জীব-বল্লভ করিয়া দিলেন, এবং, জগতের যাবতীয় জীবই যাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালবাসিতে পারে, তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন। প্রভু, সারাটা দেশ ভ্রমণ করিয়া, কভু বা নীলাচলে থাকিয়া, জীবগণকে তাঁহার আপন করিয়া লইলেন, এবং, সকলেই যে প্রভুকে প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, এ সংবাদ অবশ্য শ্রীনবদ্বীপে আসিত, এবং, শ্রীমতী যখন এই কথা শুনিতেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। যে লাগিয়া তিনি ও শচী মা তাঁহাদের বুক-জুড়ান ধনকে জগতের কাছে বিলাইয়া দিয়া অসহনীয় বিরহ-বেদনা সহিতেছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহারা সকল বেদনা ভুলিয়া যাইতেন—তাঁহাদের মুখশ্রী প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইত! এই বিরহের মধ্যেও তাঁহারা সুখ অনুভব করিতেন। এখন দেখুন, এই দেবীদ্বয় বস্তু দুইটী কি! তাই বলিতেছি, যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ, তেমনই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। এই শচী দেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপায়ই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে পাইলাম, তাঁহাকে:অতি আপনার জন বলিয়া ভালবাসিতে সুযোগ পাইলাম, তাঁহার সুশীতল চরণে স্থান পাইলাম। সুতরাং শ্রীনবদ্বীপ-লীলা-রসই

উন্নতোজ্জ্বল রস। অতএব, হে আমার বিশ্ববাসী ভাই-ভগ্নীগণ! আসুন, আমরা এহেন প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে ভালবাসিয়া কৃতকৃতার্থ হই। তিনি আমাদের দোষ লইবেন না। আসুন, আমরা তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, এবং তাঁহাকে প্রাণের পরম বান্ধব করিয়া হৃদয়ে বসাই, ও তাঁহার উন্নতোজ্জ্বল-রস-সুধা আস্বাদন করিয়া জীবন ধন্য করি।

চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রভু শ্রীনবদ্বীপে বসিয়া এই প্রেম-রস নির্য্যাস আস্বাদন করিলেন ও জীবকে করাইলেন, তথাপি তাঁহার আস্বাদনের তৃপ্তি হইল না; তাই তিনি বিরহলীলার অবতারণা করিলেন। এই বিরহেও প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন পূর্ণ মাত্রায় হইয়াছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচী দেবী যেমন গৌরাঙ্গ-সুন্দরের বিরহে বিহ্বল, শ্রীগৌরাঙ্গও সেইরূপ তাঁহাদের বিরহে বিহ্বল। তিনি শচী মা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য নয়ন-জল ফেলিয়াছেন। ফেলিয়াছেন বলিয়াই তিনি দক্ষিণ দেশ হইতে পরমানন্দ পুরীকে শ্রীমতীর সংবাদ নেওয়ার জন্য শ্রীনবদ্বীপ পাঠাইয়া দিলেন। পরমানন্দ পুরীকে তিনি বলিলেন, 'তোমার সহিত নীলাচলে এক সঙ্গে বাস করিলে আমি সুখ পাইব। তুমি নীলাচল যাও। আমার যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, তুমি ইতিমধ্যে শ্রীনবদ্বীপ হইয়া শ্রীমা ও আমার প্রাণবল্লভা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সংবাদ লইয়া যাইও, এবং তাঁহাদিগকে আমার সংবাদ দিয়া সান্ত্বনা করিও।' পরমানন্দ পুরীকে উদ্ধব বলা হয়। বৈষ্ণব বন্দনারও বলা হয়

'পরমানন্দ পুরী বন্দ উদ্ধব-স্বভাব।'

উদ্ধবকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, পরমানন্দ পুরীকেও প্রভু সেইরূপ শ্রীনবদ্বীপের সংবাদ লওয়ার জন্য পাঠাইলেন। ইহার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশচীদেবীকে নিমায়ের সংবাদ জানাইয়া তাঁহাদিগকে সুখ দেওয়া ও তাঁহাদের সংবাদ নীলাচলে লইয়া

যাওয়া ; আর বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য এই—পরমানন্দ পুরীকে বিশুদ্ধ প্রেমদান করা, কারণ, নবদ্বীপ গেলে সকলের, বিশেষতঃ ঐ দুইটী দেবীর মহাভাব দর্শন করিলে তিনি প্রেম প্রাপ্ত হইবেন ;— শচীমা'র অনুগত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেম পাওয়া যায় না। ঘটনাটী একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

পরমানন্দ পুরী পদব্রজে শ্রীনবদ্বীপ আসিলেন। আসিয়া প্রভুর কথানুযায়ী প্রথমতঃ শ্রীবাস পণ্ডিতের সংবাদ লইলেন। শ্রীবাস যখন পরিচয় লইয়া জানিলেন, ইনি দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীনিমাইয়ের নিকট হইতে আসিয়াছেন, নিমাই-ই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন;— তখন নিমাইয়ের সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন ; পুরীও কহিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু, শ্রীবাস কহিলেন, "না, না, এখন কাজ নাই। শচীমার বাড়ীতে চলুন। কাল-বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। আমি আর প্রভুকে কত ভালবাসি! আমি তাঁর কথা শুনিয়াই বা আর কত সুখ পাইব! যিনি পাইবেন, তাঁর কাছে চলুন। আর, তাঁর কাছে বসিয়া শুনিলে আমরাও সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সুখানুভব করিব।" এই বলিয়া তিনি পরমানন্দ পুরীকে শ্রীশচীদেবীর বাড়ীর অভিমুখে লইয়া চলিলেন। শ্রীশচীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শচীমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'মা, তোমার নিমাই দক্ষিণ দেশ হইতে লোক পাঠাইয়াছেন। নিমাই ভাল আছেন।' শচী মা একটু উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "এ্যাঁ! শ্রীবাস নাকি! শ্রীবাস! কি বল্লে? নিমাই আমার লোক পাঠিয়েছে। কই! সে কই! তাঁকে এখানে নিয়ে এস! কই! সে কই!' ইহা বলিতেই শ্রীবাস পণ্ডিত পরমানন্দ পুরীকে লইয়া শ্রীশচীমার কাছে গেলেন। শচীমা আসন দিলেন। বড় আগ্রহ করিয়া আসন দিলেন, কারণ, সে নিমাইয়ের সংবাদ নিয়া আসিয়াছে। শচীমা তখন বউ মাকে ডাকিলেন ; কহিলেন,

'বউ মা, বউ মা, এদিকে এস! নিমাই আমাদের ভুলে নি! বিদেশে গিয়েছে ব'লে কি সে আমাদের একবারে ভু'লে যাবে! নিমাই আমার তেমন ছেলে নয়! কত লোকে কত বলে, নিমাই নাকি কি করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; সংসার নাকি একবারে ছাড়িয়া দিয়াছে· আমাদের নাকি একবারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! না, না, তা'কি হয়! তা' হ'লে সে লোক পাঠাবে কেন? আর, তার সংবাদই বা আমাদের দেবে কেন? শুনেছি সন্ন্যাস কল্লে নাকি পূর্ব্বাশ্রমের কথা একবারে ভুলে যেতে হয়, কারণ, সে নাকি মায়ার সংসার। আমার নিমাইকে ভালবাস্‌ব, তাকে নিয়ে সংসার কর্‌ব, সে আমাদের নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে সংসার কর্‌বে, এ টা যে মায়ার সংসার, একথা মুখে আন্‌তেও আমার প্রাণ কাঁপে। তবে লোকে যা' বলে, সে কেবল আমার হতভাগ্য দোষে। সব সহিয়া আছি। বউ মা এস, এসে শোন, এই সন্ন্যাসী ঠাকুর কি বলেন।'

বস্তুতঃই শ্রীনিমাইচাঁদ শচীমাকে ভালবাসিবেন এবং শ্রীশচী মা নিমাইকে ভালবাসিবেন, ইহা যদি কেহ মায়া বলে, শচীমা'র সংসারকে যদি কেহ মায়ার সংসার মনে করে, তবে তাহাতে শচীমার কেন,—শচীমা ত স্নেহের অম্বুধি—প্রত্যেকেরই বুক কাঁপিবার কথা। কামকে প্রেমে পরিণত করার জন্য, মায়াকে দয়া করিবার নিমিত্ত, মায়ার সংসারকে প্রেমের সংসারে পর্য্যবসিত করিবার জন্যই অশেষ বাৎসল্যের অনন্তনিধি শ্রীভগবান্ মায়ামানুষরূপে শ্রীনিমাইচাঁদ হইয়া শচীদেবীর গৃহে প্রকাশিত হইলেন। কোথায় জীবগণ এই শচীমার সংসারে প্রবেশ করিয়া, প্রত্যেকের সংসারই শচীমার সংসারে পরিণত করিয়া ভূলোকে থাকিয়াই গোলোকের অপ্রাকৃত সুধা-রস আস্বাদন করিবে, আর তাহা না করিয়া কোথায় তাহারা বিপরীত মনে করিয়া আরো মায়ায় জড়ীভূত হইয়া পড়িবে! প্রভু বহিরঙ্গ ভাবে সন্ন্যাস করিয়া সকলকে শচীমার সংসারে প্রবেশ করিতে সুযোগ

দিলেন, জগত সংসারই শচীমার সোণার সংসারে পরিণত করার সহজ কৌশল করিলেন। প্রভুর আর একটী রঙ্গ দেখুন. প্রভু সন্ন্যাস করিয়া নিজে ত পূর্ব্বাশ্রম—অর্থাৎ—শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুলিলেনই না, পরন্তু, অপরাপর সন্ন্যাসীকেও তাঁহাদের সংসারে প্রবেশ করাইলেন—সন্ন্যাসাগণ তিক্ত জ্ঞান-নিম্বফল আস্বাদন করিতেছিলেন, প্রভু তাঁহাদিগকে প্রেমাম্রমুকুল আস্বাদন করাইলেন। প্রথম করাইলেন শ্রীপাদ কেশব ভারতাকে, আর, এখন দক্ষিণ দেশ হইতে পাঠাইলেন শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীকে। এখন, প্রভুকে যে সরস্বতী প্রবোধানন্দ সন্ন্যাস-কপট বলিয়াছেন,* অর্থাৎ, প্রভুর সন্ন্যাস যে একটী বহিরাচ্ছাদন, যে হেতু, তিনি ছন্নাবতার, তাহার অর্থ সকলের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। এবং, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যে, তিনি বিদেশে অর্জ্জনের নিমিত্ত বাহির হইতেছেন, এবং যেখানে যাহা তিনি অর্জ্জন করিবেন, তাহা তিনি শচীমার নিকট প্রেরণ করিবেন, এই কথারও ভাব পরিগ্রহ করুন। দক্ষিণ দেশ হইতে তিনি পরমানন্দ পুরীকে শচীমার নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রভুর অর্জ্জিত এই রত্নটী শ্রীশচীমা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হাতে পড়িয়া আরো উজ্জ্বল হইলেন, অর্থাৎ, পরমানন্দ পুরী আরো প্রেম পাইলেন। কিরূপে. বলিতেছি।

শচীমা পরামানন্দ পুরীর কথা শুনিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকিলেন। শ্রীমতী সখীগণসহ একটু অন্তরালে আসিয়া সব কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। কখন পুরী একটী কথা বলেন, তজ্জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরী মহারাজ প্রথমতঃ কিছুক্ষণ কথা কহিতেই পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, বিরহ-বিষাদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাড়ীতে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করা মাত্র তিনি দেখিলেন, অঙ্গনস্থিত প্রতি ধূলি-কণা শ্রীনিমাইয়ের পাদস্পর্শ হইতে

বঞ্চিত বলিয়া বিষণ্ণ, মলিন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি ধূলিকণাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং, সেই পবিত্র ধূলি তাঁহার অঙ্গে মাখিলেন। তার পর উঠিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া দেখিলেন. বায়ুমণ্ডল প্রভুর বিরহে স্থির হইয়া রহিয়াছে, তিনি দেখিতেছেন, বায়ুর প্রধান দুঃখ, এখন সে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবা হইতে বঞ্চিত, তাই সে ভাবিতেছে 'প্রভু যখন কীর্ত্তনে ক্লান্ত হইয়া বসিতেন, আমি সেবা করিয়া ধন্য হইতাম; এখন আমি কাহার সেবা করিব? আর আমি বহিব না।' এই ভাবিয়া বায়ু স্থির, স্পন্দনহীন। যে পুরী জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি করিতেন, তিনি এখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সর্ব্বত্র শুদ্ধ চৈতন্য দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিলেন, সকলেই সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দাস, এবং এই ধূলি-কণা, বায়ু-কণা সকলেই তাহাদের প্রভুর বিরহে বিকল। এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইতে না হইতেই তিনি দেখিলেন, প্রভুর শ্রীমন্দিরের বারেন্দায় ঈশান নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার দুনয়নে অবিরল ধারা পড়িতেছে। পুরী আর কথা কহিতে পারেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে ঈশানের পরিচয় দিলেন—বলিলেন, "ইনি সেই ঈশান, যিনি এক দিন প্রভুকে প্রণাম করিতে গেলে, প্রভু বলিয়াছিলেন, 'কর কি! তুমি যে ব্রাহ্মণ!' ইহাতে ঈশান বলিলেন, 'যে যজ্ঞোপবীত প্রভুর পাদপদ্ম-প্রাপ্তির অন্তরায়, সেই বন্ধন রাখিয়া কি করিব!' এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রভুর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।" শ্রীবাস পণ্ডিত এইরূপে ঈশানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে দিতে এবং ঈশানের ঐ ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি নিজেও বিকল হইলেন, পুরী গোসাঞিও বিচলিত হইলেন। তার পর, যখন শ্রীবাস শচীমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'মা, তোমার নিমাই দক্ষিণ দেশ হইতে

লোক পাঠাইয়াছেন।' এবং, এই কথা শুনিয়া যখন শ্রীশচীদেবী পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিলেন, তখন শচীমায়ের অবস্থা দর্শন করিয়া পরমানন্দ পুরীও ধৈর্য্য হারাইলেন। এ দিকে শচীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। পুরী গোসাঞী একটু প্রকৃতিস্থ হইলে শচীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আগে বল দেখি, আমার নিমাই সুস্থ আছে ত?' পুরী বলিলেন, "নিমাই সম্পূর্ণ সুস্থই আছেন।" "আচ্ছা, ভাল, ভাল।" এই পর্য্যন্ত কহিয়া শচীমা আর কিছু কহিতে পারিলেন না। নিমাই সুখে থাকিলেই তাঁহার সুখ, এই ভাবিয়া তিনি নিজকে প্রবোধ দিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকেও প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, "বউ মা, আমরা ত নিমাইয়ের সুখই চাই। আচ্ছা, সে সুখে থাকুক, তাহাতেই আমাদের সুখ।" এই পর্য্যন্ত কহিয়া তিনি পরমানন্দ পুরীকে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না; কেবল চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইল, পাছে কোন্ কথা বলিতে কোন্ কথা শুনিতে হয়; পাছে বা পরমানন্দ পুরীর মুখে নিমাইয়ের কঠোরতার কথা শুনিতে হয়। নিমাই গিয়াছেন অবধি শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায়ই নবদ্বীপ-লীলার ভাবে থাকেন— সেই লীলাই দর্শন করেন। সন্ন্যাসের কথা যখন মনে আসে, তখন আর তিষ্ঠিতে পারেন না। এখন এই সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ইনি পাছে বা সেই সব কথা বলেন, এই জন্য শচীমা কেবল নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, কোন প্রশ্ন করিতে আর সাহস করিলেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত শচীমার ভাব বুঝিলেন। বুঝিয়া পুরী গোসাঞীকেও ইহা বুঝাইলেন। প্রভুর কৃপায় পুরীরও অবশ্য ইহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। যদিও তিনি মায়াবদী সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি প্রভুর সঙ্গ পাইয়া, ভক্তি ও প্রেম বস্তুটী কি, তাহার আস্বাদন তিনি পাইয়াছেন।

তিনি অতি ধীরে শচীমাকে বলিলেন—এমন ভাবে বলিলেন, যেন শ্রীমতী অন্তঃপুর হইতে ইহা শুনিতে পান। পরমানন্দ পুরী কহিলেন—"মা, তোমার নিমাইকে সকলেই ভালবাসে। যেখানে যান, সেই খানেই কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠে। নিমাই সকলকে আপন করিয়া লয়েন, এবং, সকলেই নিমাইকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার সুখসাধনের চেষ্টা করে। এই নবদ্বীপের কীর্ত্তনের কথা, সুরধুনীতে ক্রীড়া-কৌতুকের কথা তোমার নিমাইয়ের মুখেই শুনিয়াছি। মা, আর কি বলিব, তিনি তোমার গভীর স্নেহের কথা কহিয়া অশ্রুপাত করেন। কিন্তু, মা, তোমার নিমাই সর্ব্বত্রই ভাই পাইয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে কীর্ত্তন-রঙ্গে দিন যামিনী কাটিতেছেন।" এই কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া শচীমা পাছে ভাবেন যে, সেই দূরদেশে নিমাই বিহ্বল হইয়া পড়িলে কে তাঁহার যত্ন করে, কে তাঁহার সেবা করে, কীর্ত্তনান্তে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে কে তাঁকে খেতে দেয়, কাকেই বা সে মা ব'লে ডাকে, এই সব কথা ভাবিয়া পাছে শচীমা'র শোকাবেগ আরো উচ্ছ্বসিত হয়, সেই জন্য শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশচীদেবীর ভাব বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেন। তাহাতে পরমানন্দ পুরীর শ্রীনিমাইয়ের কথা কহিতে আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত। এই ভাবে শচীমায়ের ভাবের অনুকূল কথা কহিয়া পুরী গোসাঞী শচীমাকে সুখ দিতেন। তিনি কিয়দ্দিন শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া প্রত্যহ শচীমায়ের কাছে নিমায়ের কথা কহিতেন। পুরী গোসাঞী শচীমার বাড়ীতেই প্রসাদ পাইতেন।

পরমানন্দ পুরীর নিকট প্রভুর সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও সুস্থ হইলেন বটে ; কিন্তু, কিয়ৎকাল পরে তিনি আর একটী ভাবের তরঙ্গে পড়িলেন। পরমানন্দ পুরীর নিকট তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণ দেশে কত পতিত জীব প্রভুর শ্রীচরণে স্থান পাইয়াছে। এই কথা শুনিয়াছেন

অবধি "পতিত" কথাটী তাঁহার কাণে বড় বাজিল। ভাবিতে ভাবিতে কথাটী মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল। যিনি পূর্ণ, তিনি সব ভাবেই পূর্ণ। যখন যে ভাবটী গ্রহণ করেন, তখন সেই ভাবটী মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার মধ্যে বিকাশ পায়। যতই তিনি এই কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৈন্য, আর্ত্তি বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তিনি শ্রীকাঞ্চনা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি, পতিত অর্থ কি? পতিত কারে বলে?" কাঞ্চনা শ্রীমতীর দৈন্য দেখিয়া, মুখশ্রী অতিশয় কাতর দর্শন করিয়া আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না—নীরব হইয়া শ্রীমতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমতী আবার কহিলেন, "সখি! 'পতিত' অর্থ বুঝি প'ড়ে থাকা। যে নিঃসহায় প'ড়ে থাকে, তাকেই বুঝি 'পতিত' বলে! কেমন রে, না?" কাঞ্চনা আর কি বলিবেন! তিনি অপ্রতিভ হইলেন; পরে একটু স্থির হইয়া ধীরে বলিলেন, 'হাঁ, তা—বটে; কিন্তু—'কাঞ্চনা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয়, শ্রীমতী আবার এই কথা হইতে কোন্ বিপদ ঘটায়। কাঞ্চনা কি বলিতে যাইয়া আর বলিলেন না। ইহাতে শ্রীমতীর ভাবের আবেগ আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কাঞ্চনা শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যই 'কিন্তু' বলিয়াই কথার অবতারণা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ইহাতে শ্রীমতী তাঁহার নিজের ভাবে আরো বুঝিলেন যে, কাঞ্চনা ত সত্যই বলিয়াছে, তবে বুঝি তার মনে আরো কিছু আছে, তিনি ব্যথা পাইবেন ভয়ে সে তাহা কহিতেছেনা। শ্রীমতী ইহাতে আরো অধীর হইলেন—নিজকে আরো দীনাতিদীন মনে করিতে লাগিলেন, করিয়া ক্ষণ পরে কহিলেন, "তা হ'লে সখি, আমার মত পতিত ত আর ত্রিজগতে নাই। আমি যে একলা শূন্য ঘরে নিঃসহায় প'ড়ে আছি! ঐ ত পুরী-গোসাঞের কাছে শুনলাম্, প্রভু পতিত ধ'রে ধ'রে কোল দিচ্ছেন। কই,

সখি, আমি ত তাঁর কোল হ'তে বঞ্চিত হ'লাম। শুধু তা-ও ত নয়, সখি! আমায় কোলে তুলে নিয়ে, কোল হ'তে ফেলে দিয়ে চ'লে গেলেন। তবে ত আমি আরো পতিত! আমি যে নিজে প ড়ে আছি, তা নয়, আমায় ফেলে চ'লে গেলেন! তা' হ'লে, সখি, আমার আর বুঝি ভরসা নাই! আমায় বুঝি আর কোলে তু'লে নেবেন না! তাই যদি হ'ল, তিনিই যদি আমায় ফেলে দিলেন, তা' হ'লে তোরা আর কেন এ পতিতের সঙ্গ করিস্! তোরাও যা! এ শূন্য প্রাণ আর কত শূন্য হবে!" শ্রীমতী এই বলিতেছেন, আর তিনি সমস্ত জগত শূন্য হইতে আরো শূন্য দেখিতেছেন। তিনি হাত পা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার অস্থি-সন্ধি শ্লথ হইয়া পড়িল—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইল। হাত পায়ের জোড়া ছাড়িয়া দিল। নয়ন নিমীলিত অবস্থায় স্থির হইয়া রহিল। দেহের আর স্পন্দন মাত্র রহিলনা। সখীগণ প্রমাদ গণিলেন। কোন সখী দৌড়িয়া শচীমার কাছে যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সব বিবরণ কহিলেন। কেহ বা শ্রীমতীর কর্ণে 'গৌর' নাম শুনাইতে লাগিলেন। কোন সখী হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেহ বা বিষম বিপদ আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শচীমা শ্রীমতীর কথা শুনিয়া কোন কথা কহিলেন না। নয়ন মুদিয়াই রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহিয়াছি। এখন ত আমি পাষাণ হইয়া রহিয়াছি। আরো যত সহাইবে, ততই সহিতে হইবে। বউ মা যদি চলিয়া যায়, তবে সে এই বিষম অসহ্য যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে। সে ত সুখে থাকিবে! আমি না হয় আরো সহিব! তা' সহিলামই বা! বউমা'র ত সুখ হইবে!" এই ভাবিয়া তিনি নীরব রহিলেন, কেবল শুষ্ক নয়ন দিয়া দুই একটী ধারা পড়িতে লাগিল। শচীমা'র গম্ভীর ভাব দেখিয়া সখী আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। পাছে আবার শচীমা-ই অচেতন হইয়া পড়েন, এই ভয়ে শচীমাকে ছাড়িয়াও

শ্রীমতীর কাছে গেলেন না। এদিকে শ্রীমতীর ঐ অবস্থা দর্শনে সখীদের মধ্যে কেহ বা গৌরকে মনে মনে আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, 'প্রভু, শ্রীমতীর দশা স্বচক্ষে একবার দর্শন করিয়া যাও। তুমি নিজে আসিয়া তাঁকে না বাঁচাইলে কার সাধ্য তাঁহাকে এ অবস্থায় প্রাণে বাঁচায়! প্রভু, আমরা শ্রীমতীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছি। আমরা তোমাকে পাইব এ স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। আমাদের সে প্রেম নাই। তবে শ্রীমতীকে তুমি ছাড়িতে পারিবে না, তাঁকে দিয়াই আমরা তোমায় পাইব। আর, আমরা যদি তোমায় না-ও পাই, প্রভু, তাহাতে আমাদের কিছু হইবে না। তুমি শ্রীমতীকে রক্ষা কর। শ্রীমতী প্রাণে মরিলে আমরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব। আর কাহাকে লইয়া, কাহার ভরসায় এ পোড়া প্রাণ রাখিব!' সখী এইরূপ মনে মনে কহিতেছেন, আর ক্রমে তাঁহার অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে। ওদিকে দুই সখী দুই কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে 'গৌর' নাম শুনাইতেছেন। কাঞ্চনা অস্ফুট স্বরে কহিলেন, 'সত্য সত্যই ত, প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে বাহির হইলে! এখন আমরা এই অবলাকুল যে পড়িয়া রহিয়াছি, আমাদের কে ধরিয়া উঠায়।' এই বলিতে বলিতে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, এবং, রোদন করিতে করিতে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কদলিকা সখী এই অবস্থা দেখিয়া আর সহিতে পারিলেন না। তিনি কাঞ্চনাকে ধরিয়া বলিলেন, "দিদি, তোমার ভরসায় আমরা শ্রীমতীকে লইয়া আছি। আমরা শ্রীমতীর মরম কি জানি! দিদি, তুমিও গেলে! এখন শ্রীমতীকে কে সান্ত্বনা করে, কে রক্ষা করে, কে তাহাকে চেতন করায়"! কদলিকা আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহারও বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি হিক্কা দিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণপরে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিপদের উপর বিপদ। কে কাহাকে রক্ষা করে! এমন সময় শ্রীধর,

নরহরি, বাসুঘোষ প্রভৃতি কীর্ত্তন লইয়া শচীমার বাড়ীতে আসিলেন। অন্য এক দরজা দিয়া সীতাদেবী, মালিনীদেবী ও সর্ব্বজয়া দেবী কি মনে করিয়া শ্রীশচীমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদেরও নয়নে ধারা, বদন মলিন। অতি ভয়ে ভয়ে আসিয়াছেন, কি জানি কি দৃশ্য আজ তাঁহারা দর্শন করেন! সর্ব্বজয়া দেবী শ্রীমতীর প্রকোষ্ঠে গেলেন; অন্য দেবীদ্বয় শচীমার কাছে গেলেন। কীর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহাদেরও নয়নে ধারা। শচীমার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। সর্ব্বজয়া দেবী শ্রীমতী ও সখীগণকে ধরাশায়ী মূচ্ছিত অবস্থায় দর্শন করিয়া, দৌড়াইয়া গিয়া মালিনী দেবীকে বিপদের কথা কহিলেন। মালিনী শচী দেবীকে কহিলেন, 'দিদি, নয়ন মেল। তুমি এইরূপ করিলে তুমিও মরিবে, বউমাকেও মারিবে, আমাদেরও মারিবে। ঐ শোন সর্ব্বজয়া কি বলিতেছে, শচী দেবী আর রহিতে পারিলেন না। সকলে মিলিয়া শ্রীমতীর নিকটে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ শুকাইয়া গেল। শ্রীমতীর দেহে স্পন্দন নাই, অস্থি-সন্ধি ছিন্ন হইয়াছে। কাঞ্চনা, কদলিকা ও আর কয়েকজন সখী মূচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ চীৎকার করিতেছে। কেহ উত্তান-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। কাহারো নয়নে অবিরল ধারা পড়িতেছে। কেহ শ্রীমতীকে 'গৌর' নাম শুনাইতেছে। শচীদেবী অতি সন্তর্পণে শ্রীমতীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি আর এখন রোদন করিতে পারেন না। সকলকে তাঁহার রক্ষা করিতে হইবে। তিনি শ্রীমতীকে শুধু কোলে লইয়া বসিলেন। আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হা নিমাই, এই তোর জীবোদ্ধার!' শচীমার অঙ্গস্পর্শ পাইয়া শ্রীমতীর দেহে প্রাণ আসিল। অস্থিসন্ধি ক্রমে জোড়া লাগিল। ওদিকে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া কাঞ্চনা সখী চেতন পাইলেন, পাইয়া উঠিলেন। উঠিয়া শ্রীমতীকে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় দর্শন করিয়া

আশার সঞ্চার হইল, ক্রমে শ্রীমতীর সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি শচীমাকে প্রণাম করিলেন। করিয়া কহিলেন, 'মা, এই ত প্রভু এসেছিলেন। এসে এখন তিনি কীর্ত্তনে গেলেন। ব'লে গেলেন, এই সব ভক্ত এসেছেন। তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।' শচীমা কাঞ্চনাকে ইঙ্গিত করিলেন। কাঞ্চনা অপরাপর সখীর দিকে চাহিলেন। তাঁহারা রন্ধনের আয়োজন করিতে গেলেন। এইরূপে শ্রীশচীর গৃহে বিরহ-রসে নিত্য নূতন নূতন তরঙ্গ উঠিত। এই বিরহের মধ্যেও তাঁহারা মিলন-সুখ আস্বাদন করিতেন। হে কৃপাময় ভক্তগণ! আপনারা কি এই মিলন-সুখ নিত্য বাঞ্ছা করেন না! শচীমা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, সখীগণ ও ভক্তবৃন্দকে কি আপনারা নিত্য বিরহের মধ্যে রাখিয়া দিবেন? কোন্ প্রাণে আপনারা ইহা সহিবেন! শ্রীমতীর বিরহ-লীলা দর্শন করিয়া আপনারও যখন বিরহ-ব্যথা জাগিয়া উঠিবে, তখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের মত আপনিও কি কহিবেন না

এই বার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি॥

আপনিই যদি ছাড়িয়া দিতে না চাহেন, তবে শ্রীমতীকে আপনি কোন প্রাণে ছাড়িয়া দিতে কহিবেন!

নদীয়ায় নিমাই অদর্শন হইয়াছেন অবধি শ্রীশচী মা প্রায়ই নয়ন মুদিয়া থাকিতেন। 'নিমাই, 'নিমাই', সর্ব্বদাই 'নিমাই' 'নিমাই' করিতেন। কখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, কখন বা আবেগ আর সামলাইতে না পারায় একবারে তাঁহার দম বন্ধ হইয়া যাইত। শ্রীমতী কর্ণের কাছে যাইয়া ধীরে ধীরে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেন।

এক দিন শচীমা এইরূপ স্পন্দনহীন হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীমতী স্বীয় আবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে—অতি ধীরে—অতি অস্ফুট

স্বরে শ্রীমায়ের কাণের কাছে শ্রীমুখখানি রাখিয়া বলিতেছেন, 'মা, মাগো, মা, মা আমার, ও মা আমার, ত্রিজগতে ত এখন আমার আর কেহ নাই! তুমি ছাড়া, মা, আর আমার কে আছে!' 'মা' 'মা' ডাক শুনিয়া শচীমা সামান্য একটু প্রকৃতিস্থ হইতে চাহিলেন, এবং, দুই একবার 'উঁ' 'উঁ' করিয়া অতি অস্ফুট ভাবে উত্তর দিলেন। নাগরীগণ শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচীমা'র আবার শ্বাস-রোধ হইয়া আসিল। শ্রীমতী নাকের কাছে হাত রাখিয়া দেখিলেন, শ্বাস বহিতেছে না। শ্রীমতীর মাথা ঘুরিয়া গেল। অধীর হইয়া তিনি বলিলেন, 'মা, মা! এই জন্যই কি আমাকে প্রভু তোমার কাছে রাখিয়া গেলেন! তুমি ছাড়িয়া গেলে আ—আমি এখন দাঁ—আ—'আর, কথা কহিতে পারিলেন না। শ্রীমতী বলিতে যাইতেছিলেন, 'আমি এখন দাঁড়াই কোথা!' আর তাহা বলা হইলনা। বলিতে না বলিতেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কোন সখী তখন তখনই তাঁহাকে ধরিলেন। অপরাপর সখীরা 'মা' 'মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, 'মা, মাগো, মা, কর কি! তোমার নয়নমণি প্রাণের পুত্তলী দেখ ভূমিতে পড়িয়া। শচীমার শ্বাস আসিল; সখীদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, নিমাই বুঝি আসিয়াছেন; বলিলেন, 'ক—ই—কই—কই! আমার নিমাই কই! নিমাই এসেছে! দে—দে—দে—, আমার কোলে দে!' আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সুধু বলিতে লাগিলেন—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'দে, দে—দে—।' বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ এক কথাই বলিতে লাগিলেন। নাগরীগণ আবার আর এক বিপদে পড়িলেন। স্নেহের অম্বুধি শচীমাকে এখন কি বলিয়া সান্ত্বনা করেন! যদি বলেন, নিমাই এখানে নাই, তবে ত আরো বিপদ! সকল সখীদেরই নয়নে ধারা অবিরল ধারে

বহিতেছে। কেহ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। তখন কাঞ্চনা সাহসে ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে কহিলেন, 'মাগো, মা, তোমার বউমা'র দিকে একবার চেয়ে দেখ। নয়ন মেল, মা। দেখ, শ্রীমতী যে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছে!' শচীমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের কথা তখন তাঁহার ভুলিতে হইল। নয়ন দুইটী ঈষৎ মেলিয়া চাহিলেন। কহিলেন, 'কই! বউমা আমার কই!' চাহিয়া দেখেন, বউমা মুর্চ্ছিত। দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে। তখন শচীমা আর এক তরঙ্গে পড়িলেন। দেখেন, শ্রীমতীর কিঞ্চিন্মাত্র সংজ্ঞা নাই। তখন তিনি আকুল কণ্ঠে বলিলেন, 'মা, মা, বউমা, ও বউমা, মণি আমার, যেওনা, প্রাণের মণিক আমার, যেওনা। এই বুড়ো বয়সে নিমাই আমায় তোমার আছে রেখে গিয়েছে। তা—তুমি ছেড়ে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকি!' এদিকে সখীগণ শ্রীমতীর চক্ষে জলের ছাটি মারিতেছেন, কেহ বা বীজন করিতেছেন, কেহ বা এক কর্ণে 'গৌর' 'গৌর' এই নাম শুনাইতেছেন, কেহ বা অপর কর্ণে 'মা' 'মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতেছেন। শ্রীমতীর নয়নে স্পন্দন দেখা দিল, ওষ্ঠ নড়িতে লাগিল। কোন সখী, অস্ফুট স্বরে শ্রীমতী কিছু বলেন নাকি, ইহা শুনিবার জন্য ওষ্ঠের কাছে কাণ পাতিলেন; শুনিলেন, শ্রীমতী 'মা' 'মা' বলিতেছেন। তখন তিনি শচীমাকে কহিলেন, 'মা, এই যে তোমার বউমা 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে! নেও, তোমার বউমাকে কোলে নেও।' শচীমা শ্রীমতীকে কোলে তুলিয়া নিলেন, বুক-জুড়ান ধন বুকে লইয়া নিজেও শান্ত হইলেন, বউমাকেও শান্ত করিলেন।

নিমাই গিয়াছেন অবধি শচীমা আর বড় একটা গঙ্গায় যান না। যাইবার দৈহিক শক্তিও নাই। কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাও কারণ বটে। গঙ্গায় না যাওয়ার প্রধান কারণ ভয়। তিনি নয়ন

মুদিয়াও থাকেন ভয়ে। ভয় এই, পাছে নয়ন মেলিলে নিমাইকে দেখিতে না পান। গঙ্গায়ও যান না এই ভয়ে। ভাগ্যবান্ ঈশান জল বহিয়া আনেন। আর, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও সখীগণ শচীমাকে স্নান করান। একদিন সকাল বেলা স্নান করিয়া বসিয়া আছেন। নাগরীগণ কিঞ্চিৎ জলখাবার কৃষ্ণের নৈবেদ্য করিয়া শচীমার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। শচীমার কৃষ্ণ-বিষ্ণু সকলই নিমাই। তবে নিমাই কৃষ্ণের নৈবেদ্য ব্যতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করেন না; আবার শচীমাও নিমাইকে কোন দ্রব্য না দিলে তাহা তাঁহার মুখে উঠেনা। নাগরীগণ শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যই জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ইহা দিলে নিমাইকে না দিয়া খাইবেন না, এই জন্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। শ্রীমতী তাঁহার কক্ষে একাকিনী বসিয়া। তাঁহার ঠোঁট দুখানি নড়িতেছে। তিনিও নয়ন মুদিয়া রহিয়াছেন, মুখে নাম জপিতেছেন, আর দুই আঁখি দিয়া ধারা পড়িতেছে। সখীগণ যাইয়া শ্রীমতীকে কহিলেন, 'সখি, তুই আয়, তুই মাকে না খাওয়ালে আমরা ত খাওয়াতে পারিনা।' মা'র কথা শুনিয়া শ্রীমতী আর রহিতে পারিলেন না। চলিতে দেহ থর থর কাঁপে। এইরূপে তিনি শচীমা'র কাছে আসিলেন, আসিয়া পাশে বসিলেন; বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'মা, মাগো, একটু খানিক খাও, সখীরা কত যত্ন করিয়া এই খাবার তৈয়ারী করিয়াছে। তুমি গ্রহণ করিলে ইহারা তৃপ্ত হয়।' শ্রীমা নয়ন মুদিয়াই রহিয়াছেন। অতি ধীরে বলিলেন, 'তুমি খাও, বউমা। এই ত নিমাই এসেছিল। তাকে আমি খাইয়েছি। সে-ও আমাকে খাইয়েছে। এখন তোমরা সকলে প্রসাদ পাও।' এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে কাঁদিলেন। শচীমা অবশ্য ইহা ভাবে দর্শন করিয়াছেন। সখীরা ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই। কাঞ্চনা কহিলেন, 'মা, তোমার নিমাই

চিরকাল তোমার কাছেই ত আছে। নিমায়ের হাতে খেলে, আর তোমার বউমা'র হাতে কিছু নেবেনা! এই দেখ, শ্রীমতী ব'সে আছেন। তুমি না নিলে সে যে কিছুই খাবেনা!' এই কথায় শচীমা বউমাকে কহিলেন, 'দেও, বউমা, দেও।' শ্রীমতী দু-এক গ্রাস দিতেই তিনি বলিলেন, 'আমি অনেক খেয়েছি, মা, আর পারি না। এখন তোমরা খাও।' শ্রীমতী শ্রীশচীমা'র প্রসাদ কণামাত্র মুখে দিয়া উঠিতেছেন, অমনি শচীমা তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন, এবং নিজহস্তে তাঁহাকে কয়েক গ্রাস খাওয়াইয়া দিলেন। শ্রীমতী বলিলেন, 'মা, আমি আর পারিনা।' এইরূপে সামান্য দু-চার গ্রাস তাঁহারা গ্রহণ করিতেন, ইহাতেই তাঁহাদের দেহ কোন রকমে রক্ষা হইত, এবং এইরূপেই তাঁহাদের সুদীর্ঘ দিন কাটিতে থাকিত।

কোন দিন শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'দিন ত ফুরায়না! আর ক'দিন!' শ্রীমতী কাঁদিতেও পারেন না, পাছে শচীমা আরো অধীর হন। কথা কহিতেও পারেন না। ভাব সম্বরণ করিয়া তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, 'মা, জগত ত সব শূন্যায়িত দেখিতেছি। তবু বেঁচে আছি—শুধু এই মনে ক'রে, তাঁহার যাহাতে সুখ হয়, আমাদের তাহাতে সুখ গণিতে হইবে। আমরা যদি অধীর হই, তাঁহার সুখে ও সংকল্পে বাধা পড়িবে। ভাবি, আর ক'দিন খুঁজিয়া বা গণিয়া কি করিব! যে ক'দিন তিনি রাখেন, সেই ক'দিনই রহিব। দিন কাটে না, মা! কি করি! না কাটিলেও কাটা'তে হবে, তাই মনে ক'রে ব'সে আছি, মা! তুমি, মা, একটু ধৈর্য্য ধর।' এইরূপে পুত্রবধূ শাশুড়ীকে বুঝান, শাশুড়ী পুত্রবধূকে বুঝান।

ভক্তগণ কোন সুপক্ক ফল কিম্বা সুরসাল দ্রব্য পাইলে নিমাইকে না দিয়া খাইতেন না। এখন তাঁহারা নিমাইকে পাইবেন কোথা?

শ্রীশচীমা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া দেন। একদিন নরহরি, বাসু ঘোষ প্রভৃতি শচীমাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিতে কিছু ফল ফলাদি নিয়া আসিয়াছেন; আনিয়া শচীমার সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিকটে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীধর স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছেন। নিমাই আসিয়া বলিয়াছেন, 'শ্রীধর, এখন তুমি আমাকে থোর মোচা দেওনা কেন! তোমার থোর মোচায় যে আমার বড় প্রীতি, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গেলে!' ইহাতে শ্রীধর উত্তর করিলেন, 'আর, প্রভু, থোর মোচা কাকে দিব! তুমি আমাদের অকুলে ভাসাইয়া চলিয়া গেলে! আমরা কি আর আছি, প্রভু! আমরা যে ম'রে আছি, তা' কি তুমি দেখ না!' নিমাই বলিলেন, 'না হে, শ্রীধর, আমি ত মায়ের কাছে নিয়তই আছি! শ্রীবাসের অঙ্গনে এখনো ত আমি কীর্ত্তনে নিত্যই নৃত্য করি! তোমার থোর মোচা না হ'লে যে আমার তৃপ্তি হয় না!' পরদিন প্রভাতে এক ঝুরি থোর মোচা মাথায় করিয়া শ্রীধর শ্রীশচীম'ার বাড়ীর দিকে চলিলেন। প্রাণে বড় আনন্দ খেলিতেছে। বহুদিন পরে আজ প্রভু তাঁহার থোর মোচা গ্রহণ করিবেন। পথ বাহিয়া আসিতেছেন। নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে। পথে শ্রীবাস, শিবানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত শ্রীধরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহারাও সেই সঙ্গ লইলেন। সকলে মিলিয়া শচীমার বাড়ী আসিলেন। বাড়ীখানি নীরব, নিস্তব্ধ। শ্রীধর 'মা' বলিয়া ডাকিলেন। শচীমা শুনিয়া বলিলেন, 'শ্রীধরের কণ্ঠ শুনি!' নরহরি বলিলেন, 'হাঁ, মা, শ্রীধরই আসিয়াছে। সঙ্গে শ্রীবাস, শিবানন্দ, মুকুন্দও আসিয়াছেন।' ক্রমে তাঁহারা এক পা দুই পা করিয়া শ্রীমার কাছে আসিলেন। শ্রীধর আসিয়া মোচার ঝুরি শচীমা'র সম্মুখে রাখিলেন। পরে সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শচীমা ঈষৎ নয়ন মেলিলেন। মেলিতেই প্রথমতঃ মুকুন্দের দিকে দৃষ্টি পড়িল। অমনি

শচীমা রোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মুকুন্দ, কাকে গান শুনাতে এসেছ! কে এখন তোমার গান শুন্‌বে!' এই বলিতেই 'হা নিমাই' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'ও নিমাই, নিমাই, তোমার মুকুন্দ এসেছে। তার কণ্ঠ ত তোমার বড় প্রিয়! আমি কিছু বলিব না। তুমি এসে তার কাছে বস। গান শোন।' মুকুন্দের গান শুনিয়া নিমাই অনেক সময় মূৰ্চ্ছিত হইতেন, বা ভাবে গড়াগড়ি দিতেন, ইহাতে শচীমা ব্যথা পাইতেন। শচীমা এখন দৈন্য করিয়া ভাবিতেছেন, 'আমি নিমায়ের স্বাধীনতায় বাধা দিতাম, তাই বুঝি সে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে। তা আমি কি করিব! আমি যে নিমায়ের দুঃখ সহিতে পারিতাম না! এখন যে নিমাই তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ মাথায় লইয়াছে, ইহাও ত আমায় সহিতে হইতেছে! ইহা অপেক্ষা ত আমার সেই-ই ভাল ছিল! এই ভাবিয়া তিনি নিমাইকে ডাকিলেন, বলিলেন, 'নিমাই, তোমার মুকুন্দ এসেছে।' শচীমা'র সেই করুণ ডাকে, মৰ্ম্মভেদী কণ্ঠস্বরে ভক্তগণ অধীর হইলেন। তাঁহারা 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিবানন্দ বলিলেন, 'মা, তুমি স্থির হও। মাগো, মা, একদিকে যেমন তুমি স্নেহের অম্বুধি, তেমনই আবার ধৈর্য্যে তুমি সৰ্ব্বংসহা বসুন্ধরা। তুমি সহিতে পারিবে বলিয়াই ত তোমার নিমাই এইরূপ করিতে সাহস করিয়াছেন!' এই কথা শুনিয়া শচীমা কহিলেন, 'আমি স্থির আছি রে বাপু! আমি স্থির—স্থির—স্থিরই আছি। আমার নিমায়ের কোন দোষ নাই। সে যে সরল শিশু! মা ছাড়া ত সে কিছু বুঝেনা! শান্তিপুর ব'সেও ত সে আমার উপর সব ভার দিল! আমি বলিলেই ত সে ন'দে ফিরে আস্‌ত! তা না, আমিই তাকে বিদায় দিলাম! আমিই ত আমার যাদুকে হাতে ধ'রে বিদায় দিলাম! আতি ত মায়ের কাজ করি নাই! আমারে তোরা আর মা ডাকিস্‌না—মা ডাকিস্‌না—

মা ডাকিস্‌না! আমার জন্যেই ত তোরা নিমাইকে হারালি! এখন তোরা কি কর্‌বি কর্‌! আমায় কি কর্‌বি কর্‌! আমার জন্যে তোরা নিমাইকে হারালি!' এই বলিতে বলিতে শচীমা আরো অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীধর বলিলেন, 'মা, তোমার নিমাই ত যায় নাই! কাল প্রভু আমার সঙ্গে আগের মতই কোন্দল করিয়া আমার কাছে থোর মোচা চাহিলেন, আর বলিলেন, 'আমি ত মায়ের কাছে নিত্যই আছি!' তাই দেখ, মা, আমি থোর মোচা নিয়া আসিয়াছি। তোমার নিমাইকে খাওয়াও।' শ্রীবাস কহিলেন, 'মা, আমিও ত কাল দেখিলাম, তোমার নিমাই আমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছে। তোমার নিমাই ত যায় নাই!' শচীমা আবার আবেগভরে কহিলেন, 'নিশি জাগিয়া কীর্ত্তন করিতে আমি নিমাইকে কত বারণ করিয়াছি। আর করিবনা। আর করিবনা। তোমরা তাকে খাবার সময় আমার কাছে একটু দিও! আর তাকে একটু বিশ্রম করিতে দিও।' হে কৃপাময় পাঠকপাঠিকাগণ! শ্রীধরের এই দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত। নানাবিধ খাবার সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত। নিমাই বড় মোচা ভালবাসেন। আপনারা কি এখন নিমাইকে শচীমা'র কাছে রাখিয়া নিমাইকে এই সকল দ্রব্য ভুঞ্জাইয়া শচীমাকে সুখ দিবেন না! কোন্ কঠিন প্রাণে আপনারা নিমাইকে নদীয়ার বাহিরে নিয়া কঠোরতা করাইবেন! ভক্তগণ তাহা পারেন নাই। আপনারাও তাহা পারিবেন না। শচীমা নিমাইকে নিত্যই নানাবিধ উপচারে খাওয়াইতেছেন, ইহা দর্শন করুন; আপনার প্রাণ জুড়াইবে।

কোন দিন শ্রীমতী একাকিনী বসিয়া আছেন। তিনি একাকিনী থাকিতে ভালবাসেন। সখীগণ কাছে থাকিলে তাঁহার অন্যমনস্ক হইতে হয়। একদিন তিনি কোন ছল করিয়া সখীগণকে অন্যত্র পাঠাইলেন।

আর, তিনি একাকিনী স্তিমিতলোচনে বসিয়া আছেন। সখীগণ শ্রীমতীর ভাব বুঝিয়া একটু দূরে গিয়াছেন বটে, কিন্তু, শ্রীমতী কখন্ কি ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে, এই জন্য কোন সখী একটু অন্তরালে থাকিয়া শ্রীমতীর ভাব লক্ষ্য করিতেছেন। শ্রীমতী নয়ন মুদিয়া আছেন; আর, বলিতেছেন, 'প্রভু, একটী বার দর্শন দাও। এখন এখানে কেহ নাই, একটী বার এস।' কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া ক্ষণপরে আবার বলিতেছেন, 'আমার বড় গরব হয়েছিল! তা প্রভু তোমায় নিয়ে গরব্ ক'র্‌বনা কাকে নিয়ে ক'র্‌ব! তা যদি দোষ হ'য়ে থাকে, আর কর্‌বনা। দুঃখ কারে বলে, তা, প্রভু, জানি নাই। তাই, আনন্দে দিবানিশি হাসি আমার মুখে লাগিয়া থাকিত। কিন্তু, তাই বলিয়া আমি ত কাকেও উপেক্ষা করি নাই! তুমি ত অন্তর জান, প্রভু! তবে, যে পরিমাণ হাসি, সেই পরিমাণ কাঁদান যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, আমি বল্‌ছি আর হাস্‌বনা। তবু তুমি এস। আমাকে কাঁদাবার জন্য তুমি দুঃখভার গ্রহণ করিলে, ইহা যে আমি সহিতে পারিনা! তুমি সুখে থাক, নাথ! আমি না হয় আর না হাস্‌ব! তোমার সুখ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হই।' এইরূপে শ্রীমতী প্রভুর কাছে চুপে চুপে কত কথা কহিতেছেন, আর, নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন। বিরহের আগুণে হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু নীরবে সব সহিতেছেন, আর একটী একটী করিয়া মনের বেদনা নীরবে গোপনে প্রভুর নিকট নিবেদন করিতেছেন। উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলে শচীমা আরো আকুল হইয়া পড়িবেন। প্রভু শচীমা'র দুঃখ দেখিতে পারেন না। তাঁহার ক্রন্দনে যদি শচীমা আকুল হইয়া পড়েন, তবে প্রভু বড় ব্যথিত হইবেন, এই ভয়েও বুকের দুঃখ বুকে চাপিয়া রহিয়াছেন। বুক ফাটিয়া যাইতে চায়। তবু সহিয়া রহিয়াছেন। মুখ ফুটিয়া বড় একটা কথা কহেন না। আজ

নির্জ্জনে বসিয়া প্রভুকে দুই একটী করিয়া বেদনা জানাইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, প্রভু সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বদন বিষণ্ণ। শ্রীমতীর নিকট যেন তিনি কত অপরাধী। প্রভুর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া শ্রীমতী ব্যথিত হইলেন। বলিলেন, 'প্রাণনাথ, আমি কাঁদি বলিয়া তুমি দুঃখ পাও! আর কান্দিব না। আমাকে দেখা দিতে হয় বলিয়া তোমর কষ্ট হয়! আর দেখিতে চাহিবনা। আমি ডাকি বলিয়া, তুমি যে কার্য্যভার নিয়াছ, তাহাতে বাধা পড়ে এবং তাহাতে তোমার বদন মলিন হয়! আর ডাকিবনা। তবু তুমি, প্রভু, সুখে থাক! আমি সকল সহিতে পারি, তোমার মলিনমুখ দেখিলে সহিতে পারিনা। প্রভু, তুমি হাসিমুখে থাক। তবে, প্রভু, একটী কথা তোমায় বলি। আমি অবোধ বালিকা। তোমার বৃদ্ধা মাতাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব জানিনা। তাঁহার গভীর হৃদয় যখন উদ্বেলিত হয়, কার সাধ্য সেই তরঙ্গ প্রশান্ত করে! আমরাও সেই তরঙ্গে পড়িয়া অধীর হই।' প্রভু সব কথা শুনিতেছেন, কোন কথা কহিতেছেন না। শ্রীমতী দেখিলেন, 'শ্রীমায়ের কথায় তাঁহার নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে।' তখন শ্রীমতী বলিলেন, 'প্রভু, তোমায় আরো দুঃখ দিতে আমি ডাকিয়াছি! না, প্রভু, কাজ নাই আর আমার কাছে বিলম্ব করিয়া! যাও তুমি, শীঘ্র শ্রীমার কাছে যাও। তাঁকে শান্তকর। আর, আমার এই নিবেদন রাখিও, প্রভু, শ্রীমা যেন অধীর হইয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া না যান। তাহা হইলে, প্রভু, আমি দাঁড়াই কোথা! তুমি শান্ত না করিলে মাকে কে শান্ত করিতে পারে!' হে কৃপাময় ভক্তগণ! আপনারা এখন কি বলিবেন? প্রভুকে কি নিয়ত শ্রীশচীমার কাছে রাখিয়া দিবেন না!

একদিন শচীমা সারানিশি জাগিয়া রহিয়াছেন, ভাবিতেছেন, 'এই বুঝি নিমাই আসে, এই বুঝি কীর্ত্তন সমাপ্ত হয়।' রজনী দ্বিপ্রহরের

পর আর কীর্ত্তন শুনা যায় না। শচীমা ভাবিলেন, 'কীর্ত্তন যখন শেষ হইয়াছে, তখন নিমাই আর দেরী করিবে না।' প্রতিক্ষণ যুগসম বোধ হইতে লাগিল, নিমাই আর আসেন না। তখন শ্রীশচীদেবী ভাবিলেন, 'বুঝি বা শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবীর যত্নে সেখানেই আহার করিতেছেন, তা ভালই ত, তারা ত নিমাইকে প্রাণের অধিক ভালবাসে। আহারান্তেই আসিবে, আর বিলম্ব করিবে না।' এই ভাবিতে ভাবিতে মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করিয়া গণিতেছেন, আর ক্রমেই শচীদেবীর উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। অতি কষ্টে রজনী পোহাইল। নিমাই বাড়ী আসিলেন না। তখন শচীমা ভাবিলেন, বুঝি বা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাড়ী আসিবে। অথবা শেষ রজনীতে সেখানে হয় ত একটু নিদ্রা গিয়াছে, উঠিতে একটু বেলা হইতে পারে, তাই আসিতে বিলম্ব হইতেছে। তা হউক, তবু নিমাই সুখে থাকুক। আবার ভাবিতেছেন, 'নিমাই ত আমাকে না দেখিয়া বেশী ক্ষণ থাকিতে পারে না! তবে কি সে প্রাতঃকালে আবার শ্রীবাসাদির সঙ্গে কৃষ্ণকথায় আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিল!' এইরূপ কতশত ভাবিয়া শ্রীশচীমা আর গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, এক পা দুই পা করিয়া গৃহের বাহির হইলেন, শ্রীমতীকে ডাকিয়া কহিবার আর অবসর হইল না। তিনি কখন বাহির হইলেন, কেহ লক্ষ্যও করিল না। ক্রমে তিনি শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। বাড়ীর দরজায় যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "নিমাই" "নিমাই"। স্বর শুনিয়া মালিনী দেবী বুঝিলেন, শচী দেবী আসিয়াছেন। আজ কি জানি এক বিপদ ঘটে, এই ভাবিয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া শচীমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। শচী দেবী আর আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন 'কই, আমার নিমাই কই! আমার নিমাই কই! কাল সারারাত আমার কাছে

একটু যায় নাই, সারারাত বসিয়া বসিয়া; আজও কত বেলা অপেক্ষা করিলাম! কই, নিমাই ত আমার কাছে গেল না! কই! আমার নিমাইকে একটু দেখা! নিমাই, ও নিমাই, একটিবার বাড়ী চল। নিমাই রে! আর আমি তোকে কীর্ত্তন ক'র্‌তে বারণ ক'র্‌ব না। এখন একবার বাড়ী চল্‌ রে বাপ্‌।' এই বলিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। শ্রীবাস, শ্রীপতি প্রভৃতি ভক্তগণ দাঁড়াইয়া আছেন। অতি কষ্টে শচী দেবীকে চেতন করাইয়া বসাইলেন। শচীমা নয়ন মুদিয়াই রহিয়াছেন। শ্রীবাস কহিলেন, 'মা, তুমি বাড়ী চল, আমরা তোমার নিমাইকে লইয়া আসিতেছি।' শচীমা কহিলেন, 'কই, নিমাই কই, চল না বাপ্‌। আমার সঙ্গে চল!' শ্রীবাস কহিলেন, 'মা, তুমি আগে আগে চল। আমরা নিমাইকে লইয়া তোমার পিছে পিছে আসিতেছি।' মালিনী দেবী নিজেই বিরহে ব্যাকুল, তারপর আবার এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে চায়। কেবলমাত্র শচীমাকে সুস্থ রাখিবার জন্য অতি কষ্টে নিজের ভাব সম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'চল, দিদি! নিমাই যে তোমারই! এই যে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে; চল, বাড়ী চল।' শচীমা নয়ম মুদিত অবস্থায়ই রহিলেন। মালিনী দেবী তাঁহাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন। পথে পথে শচীমা কেবল অস্ফুট ভাবে অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'চল, চল নিমাই, চল, বাপ্‌ আমার, চল। চল, আমার সঙ্গে চল। আর এমন দেরী ক'রে তোর অভাগিনী মাকে কাঁদাস্‌নে। যাদু আমার, ধন আমার, বাড়ী চল। হে ভক্তগণ! শচীমা সত্য সত্যই দেখিলেন, নিমাই তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন। তিনি তাঁহাকে বাড়ী লইয়া চলিতেছেন। আপনারাও এখন নিমাইকে শচীমার কাছে রাখুন, রাখিয়া তাঁকেও সুখ দিউন, আপনারাও সুখ পাউন।

একদিন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সখীদের স্কন্ধে ভর করিয়া বাহিরে আসিতেছেন; বাহিরে এক পা দিতে না দিতেই আর পা বাড়াইতে পারিলেন না, ঐখানেই বসিয়া পড়িলেন। নয়ন একবার একটু উন্মীলন করিয়াই আবার মুদিলেন। আর নয়ন মেলিতে পারিলেন না। শ্রীমতী অতি ধীরে অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে সখীর কাছে বলিতেছেন, 'সখিরে, এই ত ফুল ফুটিয়াছে! আমি যে আর উহার দিকে চাহিতে পারি না! একবার আমি পিত্রালয়ে ছিলাম, শ্রীমা আমাকে আনিবার জন্য ঈশানকে পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে প্রাণ-বল্লভ আমায় একটু চিঠি দিয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিলেন, 'এই ফুলের মাধুরী আমি কাকে নিয়া আস্বাদন করি! আমি, সখি, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, প্রভুর সুখের নিমিত্ত চলিয়া আসিলাম। সেই ফুল সখি, সেই মাধুরী, কে ইহা আস্বাদন করে! আমি যে ফুলের দিকে চাইতে পারি না!' এই বলিয়া শ্রীমতী অঝোর নয়নে আবার কাঁদিতে লাগিলেন। শব্দ করিয়া কাঁদিতে পারেন না, পাছে শচীমা আরো আকুল হইয়া পড়েন। তিনি যে চাপিয়া চাপিয়া ধীরে ক্রন্দন করিতেছেন, শচীমার কর্ণে তাহা গিয়াছে। তিনি উঠিয়া আসিলেন। আসিয়া বৌমাকে বুকে করিলেন। ইহাতে কি ভাবিয়া যেন শ্রীমতীর শোকাবেগ আরো উচ্ছ্বলিত হইল। শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন, 'নারীর পরাণ কি কঠিন! সহজে বাহির হইতে চায় না, মা!' এই বলিতেই তিনি আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। হাত পা ছাড়িয়া দিলেন। অঙ্গ একবারে এলাইয়া পড়িল। শচীমা দেবীর মস্তকটি স্বীয় বাম বাহুতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীমতীর বুক বুলাইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, 'বৌমা, শান্ত হও! শান্ত হও!' তিনি বৌমাকে শান্ত হইতে বলিতেছেন বটে, কিন্তু ভিতরে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে; দীর্ঘ নিঃশ্বাস আসিতেছে; শচীমা উহা চাপিয়া রাখিলেন।

কিন্তু উহা এত সতেজ হইয়া বুকের মধ্যে ক্রিয়া করিতে লাগিল, যে, শ্রীমতী ইহা টের পাইলেন। তখন তিনি একটু স্থির হইয়া কেবল বলিতে লাগিলেন, 'মা, মা, মা।' আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শচীমা বলিলেন, 'মা, এই যে আমি! আমি ত আছি! আমায় রেখে গেছে। শান্ত হও, বৌমা, শান্ত হও।' এই কথা বলিতেছেন, আর নয়নে ধারা পড়িতেছে। তখন শ্রীমতী দেখিলেন, প্রভু আসিয়াছেন, আসিয়া বলিতেছেন, 'কর কি! তুমি কর কি! তুমি অধীর হইলে মাকে আমার কে রক্ষা করিবে!' শ্রীমতী এই কথা শুনিয়া চকিতের মত চাহিয়া বলিলেন, 'আঁ! আঁ! হাঁ! হাঁ!' আর কিছু বলিলেন না। শচীমার কোল হইতে ধীরে নামিয়া অতি ধীরে শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া অবনতমাথে বসিয়া রহিলেন। শচীমা কাঞ্চনাকে জল আনিতে বলিলেন, কাঞ্চনা জল আনিলে শচীমা বধূমাতার মুখখানি পাখালিয়া দিলেন।

কখন বা কোন পণ্ডিতা রমণী শচীমা'র কাছে আসিতেন। শচীমা'র দুঃখ দেখিয়া তাঁহার কষ্ট হইত। তাঁহার দুঃখের লাঘব করার জন্য তিনি ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু, কি বলিয়া তাঁকে প্রবোধ দিবেন, ভাবিয়া পাইতেন না। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের ভাবে ভাবিত নহেন। তাই শচীমার ভাব বুঝিয়া সেই ভাবোপযোগী কথা তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। অথচ শচীমাকে প্রবোধ দিতে তাঁহার একান্ত বাসনা। তাই তিনি বলিতেন, 'দিদি, কাঁদ কেন? কে কার? সবই অনিত্য। তুমি যে নিমাইয়ের জন্য কাঁদিতেছ, এ যে মায়া!' ইহা শুনিয়া শচীমা আরো অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। তিনি বলিতেন, 'কি ব'ল্লে দিদি! আমি যে শতবার এ মায়া বরণ করিয়া লইতেছি! জন্মে, জন্মে, যুগে যুগে আমি যেন এ মায়ার ভিতরে থাকি। দিদি গো! তোরা যদি আমার

বান্ধব হইস্, তবে আমার নিমাইকে তোরা আমার কাছে এনে দে! নিমাইরে বুকে ক'রে আমি একবার বুক জুড়াই। মায়া বল, আর যা-ই বল, তোমরা সবে এই কর, নিমাই যেন আমার কাছ-ছাড়া না হয়।' এই কথায় সেই রমণী অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইতেন। আর তাঁহার দ্বিরুক্তি করার বা ঐরূপ কোন প্রবোধ বাক্য দেওয়ার প্রবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার ইচ্ছা হইত, তিনি যদি প্রাণ দিয়াও তাঁহার নিমাইকে শচীমার কাছে আনিয়া দিতে পারেন, তাহা করিতেও প্রস্তুত। শচীমার কাছে ভাব পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন।

শচীমা ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বদনখানি সদাই মলিন। তাহা দর্শন করিলে মনে হয়, যেন তাঁহারা দুই জন জগতের মধ্যে বড় কাঙ্গালিনী, শুধু তাহা নহে, তাঁহারা যেন জগতের সকলের কাছেই বড় অপরাধী। যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন, তখন অতি ধীরে পাদবিক্ষেপ করেন। যেন তাঁহাদের পদভরে বসুমতী ব্যথা না পান। তাঁহারা ত কোথাও বড় একটা যান না। এঘর হইতে ওঘরে, কিম্বা, ঘর হইতে বাহিরে সময় সময় যান। সে-ও অতি ধীরে—অতি মৃদুপদ-বিক্ষেপে। পৃথিবীর গায়ে যেন কিছুমাত্র ব্যথা না লাগে। কথা ত বড় একটা বলেন না। যখন বলেন, সে অতি অস্ফুট, অতি মৃদু স্বরে, যেন বায়ুতে ব্যথা না লাগে। যখন উপবেশন করেন, সে-ও অতি ধীরে। তাঁহাদের যেন মনের ধারণা, যে জগতের কোন জীব, কোন বস্তু, তাঁহাদের লাগিয়া ব্যথা না পায়। ব্যথা যে কি বিষম জিনিষ, তাহা তাঁহারা প্রাণে সবিশেষ বুঝিয়াছেন, ও বুঝিতেছেন; এক একবার ভাবেন, 'কি জানি কখন কাকে ব্যথা দিয়াছি, তাই আমাদের দুজনার এই বিষম ব্যথা সহিতে হইতেছে!' কখন শচীমা শ্রীমতীকে বলেন, 'কেমন, বউমা, আমরা দুজন জগতের কাছে অপরাধী, তাই আমাদের বুকের ধন,

প্রাণের প্রাণ, যথাসর্ব্বস্ব জগতকে বিলাইয়া দিতে হইয়াছে! না, বউমা! তা না হ'লে কে আর এমন করে! কত লোকেরই ত ঘরে ছেলে আছে! কে আর এমন আমাদের মত এই সোণার চাঁদকে জগতের কাছে বিলাইয়া দেয়!' আবার বলিতেছেন, 'বউমা, তা হ'লে আমাদের দুজনার আর কাহারো সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয়। কাকেও মুখ দেখান ঠিক নয়। কেমন! না, বউমা!' শচীমার করুণ কথায়, কাঙ্গাল ভাবে, শ্রীমতীর হৃদয় আরো ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যিনি রাজরাজেশ্বর নিমাই পণ্ডিতের মা, তাঁহার এইরূপ কাঙ্গাল ভাব দেখিয়া, তিনি নিজকে জীবের নিকট যেন কত অপরাধী বলিয়া ভাবিতেছেন, এই মর্ম্মস্পর্শী করুণ কথা শুনিয়া কে স্থির থাকিতে পারে! শ্রীমতী ত দূরের কথা! তিনি বলিলেন, 'মা, আপনি ত মা! আপনি অপরাধী নহেন, আমিই জীবের নিকট অপরাধী।' এই বলিয়াই তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। হে পাঠক-পাঠিকাগণ! আমার বড় দুঃখ রহিল, শ্রীমতীর ও শচীমার সেই কাঙ্গাল-ভাব-ভরা মলিন বদনখানি আঁকিয়া আপনাদের দেখাইতে পারিলাম না। আমাকে যাহা দেখাইলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তখন শ্রীমতীর পায়ে ধরিয়া বলি, 'ঠাকুরাণী, আর তুমি এই মলিন বদন দেখাইও না। আমি যে আর তোমার এই মুদিত নয়নে বারিধারা, তোমার এই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সহিতে পারিতেছি না! ঠাকুরাণী, একটু সম্বরণ কর, একটু অপেক্ষা কর। যাই, আমি এখনই যাই। তোমার প্রাণ-বল্লভ গৌরাঙ্গসুন্দরকে যেখানে পাই, খুঁজিয়া আনিয়া তোমার কাছে রাখিব। ঠাকুরাণী, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার প্রাণ পণ করিতেছি। তোমার জীব মলিন দেখিয়া প্রভু তাদের উদ্ধারের জন্য বাহির হইয়াছেন। জীব হরিনাম পাইয়াছে, উদ্ধার হইয়াছে। এখন তাঁহাকে অনায়াসে আমি নিয়া আসিতে পারিব।' হে কৃপাময় পাঠকগণ!

আপনাদের যদি এই বিষাদভরা শ্রীমতীর মুখখানি দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে, আপনারাও প্রাণ দিয়া আমার সঙ্গে যোগ দিতেন, ও এই কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

একদিন শ্রীশচী মা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া এক স্থানে আপন মনে নয়ন মুদিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। উভয়েই নীরব। কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। কত ক্ষণ এই ভাবে রহিয়াছেন। পরে শ্রীশচী মা শ্রীমতীকে ধীরে কহিলেন, 'বউ মা! কাল ত নিমাইকে দেখিলাম। কত দিন পরে এই কাল একটী বার দেখেছি। এখন ত আর দেখিনা। এই ভাবে আর কত দিন যাবে!' এই বলিতে বলিতেই তাঁহার প্রবল আর্ত্তি হইল; আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল কহিতে লাগিলেন 'কত দিন' 'কত দিন', আর কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীমতীও ধৈর্য্য-হারা হইলেন। শ্রীমতী যখন ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন, তখন শচাদেবী ভাব সংবরণ করিতেন। কারণ, তিনি ছাড়া কে তাঁহার সাধের বউ মাকে রক্ষা করে! এখনও কাজেই শচীদেবী ভাব সংবরণ করিলেন। করিয়া কহিলেন, 'বউ মা, ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও। তোমার জন্যই ত নিমাই আমাকে রাখিয়া গিয়াছে!' এই কথায় শ্রীমতী আরো অধীর হইলেন। শচী মা এই কথা কহিলেন শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য। কিন্তু, ভাবের অম্বুধি শ্রীমতীর ভাব ইহাতে আরো উদ্বেলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, 'আমার জন্যইত শ্রীমায়ের এত দুঃখ সহিতে হইতেছে! এই বৃদ্ধ বয়সে শুধু আমার জন্তই ত তিনি রহিলেন! আমি না থাকিলে এতদিনে তিনি চলিয়া যাইতেন। আমিই ত শ্রীমায়ের এই অশেষ দুঃখের মূল!' এই কথা তিনি যতই ভাবিতেছেন, ততই তাঁহার দৈন্য, আর্ত্তি, উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাবের পর ভাব আসিতেছে, আর, আর্ত্তিও তাঁহার ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবল আর্ত্তিতে তিনি হাত পা আছাড়িতে

লাগিলেন, মাটিতে মাথা কুটিতে লাগিলেন। কাঞ্চনা সখী নিকটে ছিলেন। তিনি আসিয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, 'সখি, নবনীত অপেক্ষাও তোর এই কোমল দেহে বেদনা লাগিতেছে, আমরা ইহা কেমনে সহি! আমাদের প্রতি তুই নিঠুরালী করিস্ না। আমরাই ইহা সহিতে পারিনা, প্রভু ইহা সহিবেন কিরূপে!' কাঞ্চনার এই কথায় শ্রীমতী শান্ত হইলেন না, বরং তিনি আরো অধীর হইলেন। ভাবিলেন, সখীর এই সব শুধু স্তোক বাক্য। কহিলেন, 'আর কেন বৃথা কথা কহিয়া আমাকে ভুলাইয়া রাখিস্। আমার এ অবস্থা যদি প্রভু দেখিবেনই, তবে আমি তাঁহাকে দেখি কই! আমি তাঁহাকে না দেখিলাম, ক্ষতি নাই। শ্রীমাকে তিনি দর্শন দিউন্। আমি বড় অভাগিনী, আমার জন্য শ্রীমা ব্যথা পাইতেছেন। সখি রে! তোরা যদি আমার হিতকারী বান্ধব হইস্, তবে আমাকে ধরা হইতে সরাইয়া দে। আমি শ্রীমায়ের, নদীয়ার ভক্তগণের সুখের অন্তরায়। আমারে সরায়ে দে! শ্রীমা আমার সুখে থাকুন। মা সুখে থাকুন্।' এই বলিয়া শ্রীমতী রোদন করিতে লাগিলেন। কাঞ্চনা আর কি করিবেন! অপ্রস্তুত হইয়া রহিলেন। অপ্রস্তুত হইয়া প্রভুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'প্রভু হে, যে তুমি, বিবাহ-বাসরে শ্রীমতীর পদাঙ্গুষ্ঠে একটু হুছোট লাগিয়াছিল, তাহা সহিতে পারিয়াছিলে না, সেই তুমি আজ কিরূপে এই দৃশ্য সহিতেছ!' এই কথায় শ্রীমতীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এবং, প্রভু যে কত আদরে, কত ভালবাসিয়া সেই দিন তাঁহার শ্রীপদ দিয়া তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই সব মনে পড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর প্রেমের কাহিনী আরো কত জাগিয়া উঠিল। প্রভুর প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া তিনি ভাবিলেন, তিনি ত প্রেমময়, তিনি ত প্রাণ দিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বদা ভালবাসিয়াছেন, তবে, তিনি বিন্দুমাত্র প্রভুকে ভালবাসিতে পারেন নাই,

তিনি প্রেমহীন, তাই প্রভু প্রাণে ব্যথা পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই প্রেমহীন দেহ তাঁহার না রাখাই শ্রেয়ঃ। শ্রীমতীর দৈন্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সখীর কণ্ঠে ধরিয়া বলিলেন, 'সখি, প্রভু না একদিন 'প্রেম পাই নাই' বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন! প্রভু ত পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রেমহীন হইলে তাহার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা ত আমার প্রভু দেখাইয়া দিয়াছেন। যিনি প্রেমের অম্বুধি, অনন্ত প্রেমনিলয়, তিনি কি আর নিজে প্রেমহীন হইয়াছেন বলিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন! আমার মত হতভাগ্য প্রেমহীনের কি করিতে হইবে, তাহাই ত তিনি প্রকারান্তরে বলিয়া গেলেন! সখি রে! আমি অবলা, একাকিনী গঙ্গায় কিরূপে যাই! আমায় নিয়ে চল্। আমায় যদি তোরা একটুও ভালবাসিস্, তবে বান্ধবের কার্য্য কর্। আমায় গঙ্গায় নিয়ে চল্। গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া শচীমা ও সকলের দুঃখ নিবৃত্তি করি।' শচীমা যে এখানে আছেন, শ্রীমতীর ভাবাবেশে তাহা স্মরণ নাই। তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখে তিনি এই নিদারুণ কথা কহিতে সাহস করিতেন না। ভাব সংবরণ করিয়া যাইতেন। কিন্তু, শ্রীমতী এই নিদারুণ কথা কহিয়া ফেলিলেন। কহিবামাত্র শচীমার শোকাবেগ একবারে উথলিয়া উঠিল। একে ত বউমার এই অবস্থা। কি জানি তিনি আজ এক অত্যাহিত কাণ্ড ঘটাইয়া বসেন! তাহাতে আবার তাঁহার নিমায়ের পূর্ব্ব ঘটনা মনে পড়িল। এখন আবার নিমাইয়ের কথাও ভাবিতেছেন, 'তাঁহার নিমাই যেরূপ পাগল! তখন নবদ্বীপ থাকার সময় ভক্তগণ নিকটে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এখন সেই সুদূর দেশে নীলাচলে কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে! এখন যদি নিমাই এইরূপ একটী কাণ্ড করিয়া বসেন, তবে কি উপায় হইবে! আর, সেখানে তাঁহার সেই স্থানীয় সঙ্গী থাকিলেই বা

কি হইবে! এখানে বরং গঙ্গা ছিল, অনায়াসে তাঁহাকে ধরিয়া উঠান যাইতে পারা গিয়াছে। আর, সে যে অগাধ সমদ্র! সেখানে সেই অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে কি আর তাঁর রক্ষা আছে! এখন উপায়! উপায়! উপায়!' শচীমা আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র কহিলেন, 'সমুদ্রে পড়িলে বাছার আমার উপায়! উপায়।' শচীমার মাথা ঘুরিয়া গেল, নয়নের তারকা উর্দ্ধে স্থির হইয়া রহিল।' মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'তবে—! তবে—তবে উপায়! শ্রীমতীর কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিল শচীমার কথা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন। এক দিকে যেমন তিনি ভাবিলেন, তাঁহারই জন্য শচামার উচ্ছ্বাস আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে তিনি লজ্জায় কাতর ও ম্রিয়মাণ হইলেন; অন্যদিকে আবার তন্মুহূর্ত্তেই শচামা যে নিমাইয়ের জন্য আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহারও সেই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রীমতীর যখনই যে ভাব আসে, তখনই তাহা মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। নিমাইচাঁদের সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার আশঙ্কা যখন আসিয়া সমুদিত হইল, তখন সেই বিশাল অনন্ত সমুদ্রে পড়িলে তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কি ভীষণ অবস্থা হইতে পারে, সেই দৃশ্য আসিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি আর সহিতে পারিলেন না। প্রাণ শুকাইয়া গেল। নয়ন শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি 'মা' 'মা'—বলিয়া চীৎকার দিয়া ধরাতলে পড়িয়া গেলেন। পাঠকগণ! এদৃশ্য আর আমি বর্ণনা করিতে পারিব না! আমার হাত কাঁপে। শ্রীমতীর এই অবস্থা যে আর সহিতে পারি না। শ্রীমতীকে আমার বাঁচাইয়া দিউন! শচীমাকে রক্ষা করুন! চলুন্, শীঘ্র সোণারচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে নিয়ে আসুন! আনিয়া এই দুইটী বস্তুর সম্মুখে রাখিয়া দিউন। ইঁহাদিগকে প্রাণে বাঁচাইয়া দিউন। আর যে দেরী

সহিতেছে না! এই দুইটী বস্তুর কোন বিপদ ঘটিলে নদীয়ায় আর যে কেহ বাঁচিবে না! জীবোদ্ধার যথেষ্ট হইয়াছে। জীব যথেষ্ট প্রেম পাইয়াছে। আর প্রভুর নীলাচলে থাকার তিলমাত্র প্রয়োজন নাই। নদীয়ার চাঁদ নদীয়ায় আবার ফিরিয়া আসুন। শচীমা এই স্নেহের পুত্তলী দুইটী লইয়া অনন্ত কাল ঘর সংসার করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-বিলাস।

বৈষ্ণব মহাজনগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-বিলাস লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধার ভাব কি? না, প্রেম। কান্তি কি? না, কমনীয়তা, কোমলতা, অর্থাৎ, পূর্ণ মাধুর্য্য। আর, বিলাস কি? না, খেলা, ক্রীড়া। শ্রীগৌরাঙ্গ এই তিনটী লইয়া আসিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, তিনি এবার আর রুদ্রমূর্ত্তিতে অরাতি-হন্তা স্বরূপে জীবের নিকট প্রকাশিত হইলেন না। তিনি পূর্ণ-কোমলতা, পূর্ণ মাধুর্য্য লইয়া ক্রীড়া করিলেন। তিনি যে রসস্বরূপ, সে-ই রসস্বরূপেই জীবের নিকট ধরা দিলেন। যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, যিনি বিশ্ব-পরিবারের কর্ত্তা, যিনি সকল জীবের বান্ধব, তাঁহার আবার অরাতি কে? সকলেই যে তাঁহার সুশীতল চরণ ছায়ায় আশ্রয় লইয়া প্রাণ জুড়াইবে! তাঁহাকে ভুলিয়া মায়ার বশে যদি কোন জীব দুষ্কৃতি করে, তবে তিনি তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া তাহাকে নিধন করিবেন কেন? তিনি ভালবাসিয়া, প্রেম দিয়া জীবের সেই দুষ্কৃতিপঙ্ক ধৌত করিয়া দিবেন। এই সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের একটী ঘটনা বলিতেছি। পাঠকগণ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের বাড়াতে প্রতিবৎসরই শ্রীভগবতী পূজা হয়। আমার বাবার সময় হইতেই পাঠা-বলি হয় না, কিন্তু শশা কুমড়া আঁক ও নবমী পূজার দিন শত্রুবলি হয়। শত্রু-বলির নিয়ম এই—চাউল বাঁটিয়া তাহা দ্বারা একটী মূর্ত্তি করা হয়, উহা কালিমাখান

একখানা ন্যাকড়ায় ঢাকিয়া মানকচু পাতার মধ্যে রাখিয়া ভগবতীর সম্মুখে বেদীর উপর রাখা হয়, এবং চারি পাঁচ জন একত্র হইয়া এক খানি খড়্গ দ্বারা বাম হাতে ঐ মূর্ত্তিটী খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়। কয়েক বৎসর হইল, আমাদের বাড়ীতে এই শশা কুমড়া বলি উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব হয়। আমার তৃতীয় ভাই এই প্রস্তাব করেন। ভাইরা সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেন। তখন আমি প্রশ্ন করিলাম, "শশা কুমড়া আঁক বলি ত উঠাইয়া দিবেন, কিন্তু, বলি যদি একবারে না থাকে, তবে নবমী পূজার দিন যে শত্রু-বলির প্রথা আছে, তাহার কি করিবেন?" ইহাতে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তর করিলেন, "আমাদের ত শত্রু নাই, সুতরাং আমরা আর বলি দিব কাকে!" এই সময় হইতেই আমাদের বাড়ীতে বলি বন্ধ হয়। আমার দাদা যে এই কথা বলিলেন, তিনি ত মানুষ। আর, স্বয়ং ভগবান্, যিনি সাধুর সাধু, বন্ধুর বন্ধু, যাঁহার অনন্ত সাধুভাবের কণা পাইয়া মানুষ জগতে কত পূজনীয় হয়, যাঁহার অনন্ত বন্ধুভাবের কণা পাইয়া মানুষ জগতে সকলের প্রিয় হয়, সেই বিশ্ববন্ধু স্বয়ং ভগবানের আবার শত্রু কে, আর কাহাকেই বা তিনি নিধন করিবেন! তর্কচ্ছলে যদি কেহ বলেন যে, ঐ যে ভগবতী পূজার সময় শত্রু-বলি দেওয়া হয়, উহা মানব-মনের ষড়রিপুরই প্রতিকৃতি মাত্র, এবং ঐ শত্রু-বলি দ্বারা নিজের রিপুনিচয় মা জগদম্বার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, এ কথাও শুদ্ধ ভক্তির কথা নহে। যিনি শ্রীভগবান্‌কে চিনিয়াছেন, তিনি কাহাকেও রিপু দেখেন না। শ্রীদাদা কাহতেন—

মিত্র হইতে প্রাপ্ত বস্তু শত্রু কভু নয়।

শ্রীভগবান্ আমাদের পরম মিত্র। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন বস্তুই, কোন ভাবই আমাদের শত্রু হইতে পারে না। মায়াও আমাদের শত্রু নয়। ভগবদ্-ভজন-রস আস্বাদন কবিতে মায়া আমাদের

বান্ধবের কার্য্যই করে। শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ প্রেমময়। শ্রীরাধা এই পরিপূর্ণ ভাবেই কৃষ্ণকে ভজন করিতেন। মানুষ যখন প্রেম পায়, তখন সে বড় কমনীয় হয়—বড় কোমল হয়; এবং এই ভাবে তাহার বিলাস বা খেলা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হয়। শ্রীরাধা এই ভাবের পরিপূর্ণ আদর্শ। সুতরাং, তাঁহার বিলাস বা লীলা সকলেরই চিত্ত সরস করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীরও কান্ত, শ্রীরাধারও কান্ত। কিন্তু রুক্মিণীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ কান্ত বা কমনীয় নহেন, কারণ, শিশুপাল রুক্মিণীর শত্রু ছিলেন, এবং, কৃষ্ণকে শিশুপালের নিকট শত্রুভাবেই প্রকাশিত হইতে হইয়াছিল। শ্রীরাধার শত্রু নাই। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের কান্ত ভাব, অর্থাৎ, কমনীয়.মধুর ভাব শ্রীরাধার নিকট পরিপূর্ণরূপে বিকাশ পাইয়াছে। জটীলা কুটীলা, অর্থাৎ, জটীল কুটীল ভাব এবং আয়ান, অর্থাৎ, বর্ব্বরতা সাময়িক শ্রীরাধার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারাও প্রেম পাইয়াছে। ব্রজলীলায় জটীলা কুটীলার প্রেমপ্রাপ্তি খুব পরিস্ফুট না হইলেও নবদ্বীপ-লীলায় ইহা পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট পরিপূর্ণ কান্ত। এখন, কান্তভাবের ভজন কি, তাহা বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। কান্তভাবের ভজনকে মধুর ভজন বলা হয়। ইহার অর্থ এই, যিনি শ্রীভগবান্‌কে কান্তভাবে ভজন করেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবান্ বড় মধুর, বড় রসিক; রুদ্রভাবের লেশমাত্র তিনি শ্রীভগবানের মধ্যে দর্শন করেন না। উল্কাপাত বা অশনিনিনাদ, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ হাসি বা সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ, সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার রসিক শেখরের রসের খেলা দর্শন করেন।

প্রাকৃত প্রলয় ভক্তে দেখে দাঁড়াইয়া।

যিনি পরম কান্ত—পরম কমনীয়—পরম মধুর, তাঁহার সকল কার্য্যই সুন্দর, সকলই মধুর, সকলই আনন্দদায়ক, প্রাণারাম। ভগবান্‌কে এইরূপ পরিপূর্ণ মধুর ভাবে ভজন করাই কান্তভাবের ভজন, এবং শ্রীরাধা এই ভাবের পরিপূর্ণ আদর্শ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ভাব লইয়া জীবের গোচর, হইলেন এবং এইভাবে বিলাস করিলেন, জীবও ভগবান্‌কে এই ভাবে পাইয়া ধন্য হইল।

উপরে আমরা এইমাত্র বলিলাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নিকট পরিপূর্ণ কান্ত, অন্যত্র নহে; অন্যত্র তিনি কান্ত ও রুদ্র উভয়ই। ইহার হেতু কি? হেতু এই, শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরিপূর্ণ কান্তা—পরিপূর্ণ প্রেমময়ী। তাঁহার পরিপূর্ণ কান্তি বা কমনীয়তা, অর্থাৎ, প্রেমমাধুর্য্যের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ কান্ত, এখানে আর রুদ্রভাবের লেশমাত্র বিকাশ নাই। এই যে শ্রীরাধার কান্তি ও ভাব, ইহাই অঙ্গের ভূষণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনবদ্বীপে উদিত হইলেন; হইয়া, প্রেমের বাদর করিয়া, যে তিন বাঞ্ছা অভিলাষ করিয়া তিনি আসিলেন, তাহা সাধন করিলেন। এই যে তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া আসিয়া বিলাস করিলেন এবং প্রেমের বাদর করিয়া সেই বন্যায় জীবগণকে ভাসাইলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্তই আপনারা গৌরলীলায় দেখিতে পাইবেন। এখানে একটী মাত্র বন্যার কথা বলিব, সে বন্যা কাশীধামে বহিয়াছিল। কিরূপে, বলিতেছি। কাশীতে সরস্বতী প্রবোধানন্দ প্রবল প্রতাপান্বিত সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের মধ্যে তখন তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানীগুরু বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সন্ন্যাসীর রাজা। প্রবোধানন্দ সন্ন্যাসী, অর্থাৎ, ত্যাগী বটেন, কিন্তু তিনি মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অপরে তাঁহা অপেক্ষা বড় হইবে, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না; সুতরাং, তিনি সর্ব্বপ্রধান

সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও বেদবেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, প্রভৃতি শাস্ত্রের বক্তৃতায় কাশীবাসী লক্ষ লক্ষ লোক স্তম্ভিত হইত; সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল এবং যাহারা তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য হইল না, তাহারাও তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিল; কিন্তু, মাৎসর্য্যের অনুশীলন করিতে করিতে সরস্বতী প্রবোধানন্দ এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইলেন, যে, যখন তিনি শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে একটী প্রবল শক্তিশালী সন্ন্যাসীর উদয় হইয়াছে, তাঁহার অমিত তেজে দাক্ষিণাত্যবাসী লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অনুগত হইয়াছে, এবং শ্রীনীলাচলে রথযাত্রার সময় যে লক্ষ লক্ষ লোক জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, এবং, এমন কি, প্রবোধানন্দেরই প্রায় সমকক্ষ, উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের দ্বার-পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সরস্বতী মহোদয় আর ইহা সহিতে পারিলেন না; আর কেহ তাঁহা অপেক্ষা বড় হইবে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। তিনি যথাসাধ্য প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন? তাঁহার মধ্যে বিরোধের ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও ছিলনা। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যখন সভার আয়োজন করিলেন, * এবং সরস্বতী প্রবোধানন্দ তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ও তিনি ভাবিতেছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ একবার সভায় আসিলেই হয়, তাহা হইলে তিনি কেন, তাঁহার একজন শিষ্যই তাঁহাকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিবে, তাহা হইলেই

* পাঠকগণ কৃপা করিয়া শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ কৃত "প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট" নামক গ্রন্থ হইতে ঘটনাটী বিস্তৃতরূপে পড়িয়া লইবেন। এই গ্রন্থে উহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহার ভারতবর্ষময় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিবে, প্রবোধানন্দ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া সভায় উদিত হইলেন। কি ভাবে উদিত হইলেন? তিনি যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া আসিয়াছেন! সকলের নিকটই যে তাঁহার কান্তমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে হইবে! এবং সত্য সত্যই তিনি যখন সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন সরস্বতী প্রবোধানন্দ ও শিষ্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সকল বিরোধ ভুলিয়া গেলেন। সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অনুগত হইলেন। রসবিগ্রহ শ্রীগৌরচন্দ্রকে তাঁহারা সকলেই কান্তরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গকে মধুরভাবে ভজন করিতেন,তাহা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, এবং এই খণ্ডেরও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। প্রবোধানন্দের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে কাশীতে প্রেমের বাদর বহিল, কাশীবাসী সকলে প্রেম পাইলেন। যে কাশীধাম অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল, সেই কাশী এখন দ্বিতীয় নদীয়া-ধামে পরিণত হইল। এইরূপে নদীয়ার বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রেমের বন্যা বহিল, সর্ব্বত্রই প্রভু কান্তরূপে প্রকাশিত হইলেন।

কৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাই, ব্রজের বাহিরে তিনি সকলের নিকট কান্তমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন না। যাঁহারা কৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি ভীষণ শত্রুরূপেই উপস্থিত হইয়াছেন, যেমন, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি। এখানে তিনি শ্রীরাধার কান্তি বা কোমল ভাব লইয়া যান নাই। আর গৌরলীলায় দেখিতে পাই, তিনি নদীয়ায় যেমন কান্তমূর্ত্তি, নদীয়ার বাহিরেও তিনি সেইরূপ কান্তমূর্ত্তি—কাহারো শত্রু নহেন, পরন্তু পরম বান্ধব। এমন কি, যাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও তিনি পরম সৌম্যমূর্ত্তি; সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আপন জন বলিয়া চিনিল! শ্রীভগবান যে বড় মধুময়,

তাহা বুঝিল এবং সকলেই তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবার সৌভাগ্য পাইল। ভগবানের সহিত সর্ব্বসাধারণ জীবের এই প্রেমের সম্বন্ধ আর কোন যুগে হয় নাই ; কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় ইহা এই নূতন। তাই সরস্বতী প্রবোধানন্দ বলিতেছেন—

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসে নাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎ সর্ব্বং নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়তো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ॥

অর্থাৎ, শ্রীল প্রবোধানন্দ বলিতেছেন—এই ভূমণ্ডলে ভগবৎপাদপদ্মরসে যে কোন সম্বন্ধ কাহারো হয় নাই, হইবে না, বা হইতেছে না, সেই সকল ভগবৎ-সম্বন্ধ, অর্থাৎ, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সম্বন্ধ, নিজভক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের সহিত ক্রীড়নশীল শ্রীগৌরহরির কৃপায় লোক-সমূহ অনায়াসে নির্ম্মৎসর হইয়া অবগত হইয়াছে, ও এই চতুর্ব্বিধ রস আস্বাদন করিতেছে।

এখানে 'নির্ম্মৎসর' শব্দ দ্বারা শ্রীল প্রবোধানন্দ বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণলীলায়, ভগবৎসম্বন্ধজনিত রস আস্বাদন কিরূপে করিতে হয়, তাহা তিনি ব্রজধামে দেখাইলেন বটে, কিন্তু ব্রজের বাহিরে জীবগণ নির্ম্মৎসর না হওয়ায় এই সম্বন্ধজনিত রস আস্বাদনে বঞ্চিত রহিল। যে পর্য্যন্ত মাৎসর্য্য থাকে, সে পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে আপন জন বলিয়া ধরা যায় না। তাহার হেতু এই, যাহার মাৎসর্য্য বৃত্তি আছে, সে অপরের ভাল সহিতে পারে না। এই মাৎসর্য্য বৃত্তিবশতঃই জীবে জীবে কলহ বিরোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া থাকে। এই যুদ্ধ থামাইতে ভগবানের যোদ্ধৃবেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, যেমন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে কৃষ্ণের সারথিবেশে আসিতে হইয়াছিল। আবার, এই মাৎসর্য্যের ক্রম-অনুশীলনে ভগবানের উপর পর্য্যন্ত ঈর্ষ্যা ও হিংসা উপস্থিত হয়, যেমন,

শিশুপালের হইয়াছিল। ভগবানেরও তখন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রবলতর শত্রু-মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়, যেমন, কৃষ্ণের শিশুপালের নিকট হইতে হইয়াছিল। ভগবান্ দেখিলেন, জীব যে এই মাৎসর্য্য-বশতঃ ভগবৎসম্বন্ধজনিত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইতেছে, জীবের ইহাতে কোন অপরাধ নাই। জীবকে মায়ার বন্ধনে তিনিই বাঁধিয়াছেন, তিনি কৃপা করিয়া না ছাড়াইলে, জীব এ বন্ধন হইতে ছুটিতে পারিবে না। এই কৃপা তিনি দ্বাপর যুগে করিলেও পারিতেন। কিন্তু, তিনি তাহা করিলেন না। তিনি কেবল ব্রজধামে ও ব্রজধামের বাহিরে, দুই স্থানে দুই লীলা করিলেন। এক স্থানে তিনি পূর্ণ কান্ত মূর্ত্তিতে বিশুদ্ধ প্রেমের লীলা করিলেন, সেথানে, মাৎসর্য্য যে কি, ব্রজবাসিগণ তাহা জানিতেনই না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীদাম সুদামের সখা, তেমনই শ্রীমতীর প্রাণবল্লভ, আবার মা যশোমতীর স্নেহের দুলাল। সকলেরই প্রিয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং, তিনি মা যশোমতীর ক্রোড়েই বিরাজ করুন, বা ব্রজবালকদের সঙ্গেই ক্রীড়া করুন, অথবা, শ্রীরাধার সহিতই নিকুঞ্জবিলাস করুন, সর্ব্বাবস্থায়ই সকলের প্রীতি হইত, কারণ, সকলেই কৃষ্ণের সন্তোষ চাহিতেন। আর, ব্রজের বাহিরে সকলে কৃষ্ণকে চাহিলেন না, ধন জন ঐহিক দ্রব্যাদি আকাঙ্ক্ষা করিলেন। সুতরাং ইহার প্রাপ্তির তারতম্যে পরস্পরের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসার সৃজন হইল, ও তাহাতে কলহ বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ আনয়ন করিল। কৃষ্ণ তখন কাহারো নিকট উপদেষ্টা গুরু হইলেন, কাহাকেও সৈন্য সামন্ত দিয়া সাহায্য করিলেন, কাহারও সারথ্য নিজে গ্রহণ করিলেন, আর কাহারো সহিত বা স্বয়ং যুদ্ধই করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ইহা না করিয়া সকলের নিকটই কান্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া সকলকেই প্রেম দিতে পারিতেন। কিন্তু, তিনি তাহা করিলেন না। দুই স্থানে দুইরূপ লীলা করিলেন, এবং,

যাহার যে ভাব, তাহার নিকট সেই ভাবমূর্ত্তিতে ধরা দিলেন। কিন্তু, অবশেষে তিনি দেখিলেন, জীব ইহাতে প্রকৃত সুখ পাইতেছে না। তিনি ভাবিলেন, তিনি যদি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি, অর্থাৎ, প্রেম ও মাধুর্য্য লইয়া জীবের নিকট প্রকাশিত হন, তাহা হইলেই জীব প্রেম পাইবে। ইহাই হইল গৌর-অবতারের হেতু ও সূচনা। তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রতিদ্বন্দ্বিভাব পোষণ করিলেও প্রভু তাঁহার নিকট অতি কমনীয় মূর্ত্তিতে আসিয়া ধরা দিলেন। অন্যান্য যুগ হইলে প্রভুর তাঁহার নিকট তাঁহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আসিতে হইত। কিন্তু প্রভু তাহা করিলেন না। তিনি আসিলেন অতি সৌম্যমূর্ত্তিতে—পরম কান্ত ভাবে। আর প্রবোধানন্দও ইহাতে প্রেম পাইয়া ধন্য হইলেন। শুধু প্রবোধানন্দ কেন, কাশীবাসী সমস্ত লোক ইহাতে প্রেম পাইলেন—ভগবান্ যে পূর্ণ প্রেমময়, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন। তাই, প্রবোধানন্দ 'নির্ম্মৎসর' শব্দে ঐ শ্লোকে তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। এই কথার সহিত প্রবোধানন্দের ঐ উপরিস্থ শ্লোকের 'নিজভক্তিরূপ-পরমৈশ্বর্য্য' শব্দের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তাঁহার ঐ শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য্য এই, কোন কোন ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার নিকট জীবের মস্তক অবনত হয়। কিন্তু, যে ঐশ্বর্য্য দ্বারা জীবের হৃদয় সরস হয় ও যাহার নিকট সারা প্রাণখানি বিকাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য। সেই পরমৈশ্বর্য্য কি? না, শুদ্ধভক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই শুদ্ধভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্য লইয়া ক্রীড়া বা বিলাস করিলেন।

প্রভু নবদ্বীপে থাকার সময় কেশব কাশ্মীরীও প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু, প্রভু তাঁহার নিকট পরম সৌম্যমূর্ত্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে কেশব কাশ্মীরী প্রেম পাইলেন। এইরূপে

প্রভুর লীলায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, তিনি সকলের নিকটই পরম সৌম্য-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে প্রাণের পরম বান্ধব বলিয়া ভালবাসিতে সুযোগ পাইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

নবদ্বীপে অবতার, রাধাভাব অঙ্গীকার,
ভাব-কান্তি অঙ্গের ভূষণ।

ইহারই অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া উপরে ঐরূপ বলা হইল। 'রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত' শব্দের অর্থও এইরূপ। দ্যুতি অর্থ যদি জ্যোতিঃ হয়, তাহা হইলেও এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীরাধার ভাব কি? না, প্রেম। এবং প্রেমের জ্যোতিঃই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, কারণ, ইহা সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক। এই জ্যোতিঃ, অর্থাৎ, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, সর্ব্বশক্তিশালী প্রেম লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জগতে আসিলেন।

এখানে শ্রীল স্বরূপ দামোদরের "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর স্তব-মালার আনুগত্যে সংক্ষেপে কহিতেছি, তাহা হইলে উপরি উক্ত "ভাব-কান্তির" অর্থ পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীভগবান্ ভাবিলেন, "আমার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে জগত আকৃষ্ট, সেই আমি শ্রীরাধার রূপ-রসা দিতে আকৃষ্ট; যে আমি ত্রিজগতের সুখের একমাত্র হেতু, সেই আমাকে শ্রীরাধিকার রূপগুণাদি সুখ দিতেছে। আমা অপেক্ষা ত্রিজগতে কেহ বড় আছে, ইহা অসম্ভব, কিন্তু শ্রীরাধাতে তাহা সম্ভব দেখিতেছি, এবং তাঁহাতেই আমি ইহা অনুভব করিতেছি। আবার, শ্রীরাধার সহিত মিলনে আমার অপার সুখ হয় বটে, কিন্তু, শ্রীরাধা আমার সহিত মিলনে তদপেক্ষা কোটীগুণে অধিক সুখ পায়। এই সব বিচার করিয়া আমার মনে হয়, যে শ্রীরাধার রূপগুণে আমি মুগ্ধ, সেই

শ্রীরাধাই আবার আমার রূপগুণে মুগ্ধ ; সুতরাং আমি অশেষ মাধুর্য্যময় বটে, কিন্তু, আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছিনা, একমাত্র শ্রীরাধাই তাহা আস্বাদন করিতেছেন, ইহার একমাত্র হেতু তাঁহার গভীর প্রেম। রস আস্বাদনের নিমিত্ত আমি ব্রজধামে অবতীর্ণ হইলাম বটে, এবং বিবিধ প্রকার রসও (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর),আস্বাদন করা হইল, এবং, ভক্ত যে প্রকারে রাগমার্গে ভক্তি করে, তাহাও লীলা আচরণ দ্বারা শিখান হইল, তথাপি তাহা পূর্ণ মাত্রায় হইল না ; কারণ, বিজাতীয় ভাবে, অর্থাৎ, শ্রীরাধার যেরূপ গভীর প্রেম, আমিও যদি সেই গভীর প্রেম লইয়া অবতীর্ণ না হই, তাহা হইলে এই মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন হইবার নহে।” যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কহিতেছেন—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম-রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগ-মার্গে ভক্তে ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে তাহা নহে আস্বাদন॥

এই যে শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিলেন, ইহা হইল ব্রজধামের কথা। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিলেন কেন? বলার হেতু এই, তিনি দেখিলেন, প্রেম নিকেতন এই ব্রজধামেই তাঁহার পুতনাদি অসুর বধ করিতে হইয়াছে, ব্রজের বাহিরে আরো করিতে হইবে ; এই সব কর্ম্ম প্রেম-চর্চ্চা ও মাধুর্য্য আস্বাদনের বিরোধী। এই ব্রজধামে ইহা পূর্ণ হইলনা, আর শ্রীনবদ্বীপ-ধামে ইহা পূর্ণ হইল।

ঐ যে শ্রীল স্বরূপ দামোদর তাঁহার শ্লোকে তিনটী বাঞ্ছার কথা কহিলেন, যথা—(১) শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ! (২) শ্রীকৃষ্ণের

মাধুর্য্যই বা কিরূপ যে মাধুর্য্য শ্রীরাধা ঐ প্রণয়মহিমার বলে আস্বাদন করেন! (৩) এই মাধুর্য্য আস্বাদন-জনিত সুখই বা কিরূপ! এই তিনটী কথা এক কথায় সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়, যথা,—শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা কত! কারণ, এই গভীর প্রেম হইতেই ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন ও তজ্জনিত সুখ হয়। তারপরই শ্রীল স্বরূপ দামোদর বলিতেছেন— 'তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ অর্থাৎ, সেই ভাবসম্পত্তি লইয়া, সেই গভীর প্রেম লইয়া শ্রীভগবান্ শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীও তাঁহার স্তবমালায় শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ কহিলেন, যে, তিনি 'বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং' অর্থাৎ, তিনি নিখিল ব্রজগোপিকাগণের প্রেমের সার। সহজ কথায় বলিতে গেলে, তিনি প্রেমস্বরূপ। এবার তিনি প্রেম-বিনির্য্যাস-স্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন বলিয়াই প্রেম-রস-নির্য্যাস পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করিলেন ও জীবকে করাইলেন। এই জন্যই শ্রীল স্বরূপ দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে "রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত" বলিয়া বর্ণনা করিলেন, এবং শ্রীরূপ গোস্বামীও কহিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধার দ্যুতি বা কান্তি প্রকাশ করিতেছেন— শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ দিয়া শুদ্ধ প্রেমের জ্যোতিঃই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে—এবার তিনি পরিপূর্ণ মাধর্য্যময়, জীবের পরম বান্ধব, পরম কান্ত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই "দ্যুতি" শব্দ ব্যাখ্যা করিতে "বর্ণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতেও উপরি উক্ত অর্থের অসঙ্গতি হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

> রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
> তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

"বর্ণ" বলিতে এখানে আকৃতি বা স্বরূপ বুঝায়, অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, তিনি শ্রীরাধার স্বরূপ বা প্রেম-স্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইবেন।

ঐ যে উপরে বলা হইল যে, প্রভু যেমন নদীয়ায়, তেমনই নদীয়ার বাহিরেও কান্তমূর্ত্তিতে জীবের নিকট উদিত হইয়াছেন, রুদ্রমূর্ত্তির লেশাভাসও ছিল না, তাহার প্রধান হেতু কি? হেতু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীয় প্রাণবল্লভকে জীববল্লভ করিয়া দিলেন; তাই জীব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে কান্তভাবে প্রাপ্ত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট যে-ই নবীন নাগর, নদীয়াবিনোদ ছিলেন, তাহাই রহিলেন। সেই নটবর বেশই তাঁহার চির ভজনীয়, এবং, আশ্চর্য্যের বিষয় দেখুন, নদীয়ার বাহিরে সার্ব্বভৌম, প্রবোধানন্দ, রাজা প্রতাপরুদ্র,রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বহিরঙ্গভাবে প্রভুকে দেখিলেন সন্ন্যাসী, কিন্তু, শ্রীমতীর পরিপূর্ণতম কান্ত নাগর-ভাব তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁহারাও ভজন করিলেন নাগর গৌরাঙ্গের, সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নহে।

শ্রীরাধা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-লীলা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে জীবের নিকট সঁপিয়া দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণই কার্য্যের প্রয়োজনীয়তাবশতঃ ব্রজধাম হইতে অন্যত্র গেলেন। শ্রীমতীর বিরহ-ব্যথা ভক্তগণ সহিতে না পারিয়া যুগল-মিলন করাইলেন। আর, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে জীবের নিকট সঁপিয়া দিলেন, ইহা দ্বারা তিনি জীবকে জানাইলেন, 'হে জীব, তোমরা ভব-সমুদ্রে পড়িয়া আই ঢাই করিতেছ, কুল কিনারা পাইতেছ না। তোমাদের দুঃখ আমি সহিতে পারিতেছি না। তোমাদের হাতে আমার প্রাণবল্লভকে সঁপিয়া দিলাম। শুধু ভব-সমুদ্র পার হওয়া কেন? পরম পুরুষার্থ যে প্রেম, তাহাও তোমরা পাইবে। আমার বিরহ-ব্যথা অসহনীয় হইলেও তোমাদের সুখের দিকে চাহিয়া আমি তাহা সহিয়া রহিব।' শ্রীমতী ত প্রভুকে এই ভাবিয়া বিদায় দিলেন, প্রভুও শ্রীমতীর নিকট অনুমতি লইয়া প্রেম নাম

প্রচারের নিমিত্ত নদীয়ার বাহিরে গেলেন। কিন্তু, ভক্তগণ একদিকে যেমন শ্রীমতীর বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, অন্য দিকে আবার তেমনই শ্রীমতীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ নদীয়া-যুগল মিলন করাইলেন। শ্রীমতী চাহিলেন জীবের সুখ, জীবও চাহিল শ্রীমতীর সুখ। এই ভাবে বিরহ-লীলা হইতেই আত্ম-সুখ-বাঞ্ছা-বিবর্জ্জিত প্রেমের ভজন আরম্ভ হইল। গৌর-লীলার আর একটী বিশেষত্ব দেখুন। শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে নির্ব্বাসন করিলেন। সীতার কোন অপরাধ নাই। আবার সীতা দেবীকে বনে পাঠাইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাজাই রহিলেন। ইহাতে জীব সীতা দেবীর দিকে যত আকৃষ্ট হইল, শ্রীরামচন্দ্রের দিকে তত নহে। কৃষ্ণ লীলায়ও এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা, দাস-দাসীকর্ত্তৃক কত যত্নে সেবিত; কখন বা তিনি যুদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত, কখন বা দ্বারকাপুরে মহিষীগণ-পরিবৃত। শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনে একাকিনী, ত্রিসংসারে কৃষ্ণ ছাড়া আর তাঁহার কেহ নাই। সুতরাং, জীব শ্রীরাধার প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইল। কিন্তু, শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের লাগিয়া সন্ন্যাস করিলেন, কত কঠোরতা করিলেন, ইহা দেখিয়া জীব যখন প্রেম পাইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গকে সকলে নদীয়ায় ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীমতীর নিকট নিত্য রাখিয়া দিতে চাহিলেন। আবার এদিকে, শ্রীমতীর অসহনীয় বিরহ-বেদনা দেখিয়া জীবগণ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল ও নিত্য-মিলন বাঞ্ছা করিল। গৌর-লীলায় এই বিরহে কি হইল? না, ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ের দিকেই তুল্যভাবে আকৃষ্ট হইলেন, এবং অচিরে তাঁহাদের যুগল-মিলন অধিকতর বাঞ্ছা করিলেন। দেখুন, একটী ভক্ত নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পুনরাগমন কিরূপ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন—

আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া চমকিত হৈয়া
করব মঙ্গল কাজ॥
জল ঘট ভরি আম শাখা ধরি
রাখি সারি সারি করি।
কদলি আনিয়া রোপণ করিয়া
ফুল মালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া নাগরী নদীয়া
আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি জয় জয় বাণী
উঠিবে সকল ঘরে॥
শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি
করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে ধুই কলেবরে
তুরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত দেখি হরষিত
হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা পড়ি লোটাইয়া
লইবে চরণারবিন্দ॥

তাই বলিতেছি, হে কৃপাময় ভক্তগণ! আপনারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-লীলা পাঠ করুন, দেখুন, যিনি শচীর তুলাল, তিনি নদীয়ার বাহিরে-যাইয়া কিরূপ দীন হীন বেশে দিন যামিনী কাটাইতেছেন, আর দেখুন, বালা বিষ্ণুপ্রিয়া ও দেবী শচী মাতা গৌর-বিরহে কি অথির হৃদয়ে নিশিদিন ছট্ ফট্

করিতেছেন। ইহা দেখিলে যত্নাথের মত আপনিও আপনার বাড়ী ঘর পত্রপুষ্পে, আম্র-পল্লবে ও মঙ্গল ঘটে সাজাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন. এবং দেখিবেন, শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া আপনার গৃহে আসিয়া উদিত হইয়াছেন ; তখন দেখিবেন, আপনার বাড়ীখানি নদীয়া হইয়া গিয়াছে, আপনার গৃহখানি শচীমার গৃহ হইয়া গিয়াছে, এবং সেখানে নিত্য নদীয়া-যুগল বিরাজ করিতেছেন ! আপনার মানবজন্ম সফল হইয়া যাইবে। তখন আপনিও শ্রীল বাসুদেব ঘোষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবেন—

এত দিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আনি মিলায়ল গোরা গুণনিধি ॥
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় গোরাপরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা উপরে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার সম্বন্ধে বলেন—

প্রেম নাম প্রচারিতে হেন অবতার।

প্রথমতঃ প্রভু প্রেম দিয়া জীবকে আত্মসাৎ করিলেন, পরে হরিনাম দিলেন। নামের মহিমা চিরকালই আছে। এক বার নাম নিলে যত পাপ হরে, জীব তত পাপ করিতেও পারে না। অনাদি কাল হইতেই

ইহা সত্য, এবং শাস্ত্রকারগণ ইহা পুনঃ পুনঃ বহু স্থানে কহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কহিলে কি হইবে! জীবের ত তাহাতে রুচি নাই। নাম নিলে ত ফল হইবে! কিন্তু জীব বাহির লইয়া এত ব্যস্ত যে, সে নাম নিতেই পারেনা। প্রভু এজন্য কি করিলেন? না, প্রথমতঃ জীবকে ভালবাসিয়া আপন করিয়া লইলেন, পরে যখন প্রভু তাহাদিগকে নাম করিতে বলিলেন, তখন স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাহারা নাম লইল। ইহা তিনি কি ভাবে করিলেন দেখুন। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া যখন বাহির হইলেন, তখন তিনি আত্মসুখ একবারে ছাড়িলেন। কেবল জীবের সুখের দিকে চাহিলেন। ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম, কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই; লক্ষ্য কেবল এক দিকে—কিসে জীব হরিনাম পাইবে, পাইয়া চিরসুখের অধিকারী হইবে। পায়ে হাটিয়া তিনি সারাটী দেশ বেড়াইলেন। কে কি বলিতেছে, তাহা শুনিবার অবকাশ নাই। মায়ের কথা, শ্রীমতীর কথা, ভাবিবার অবসর নাই। তীরের মত এখান হইতে ওখানে ছুটিতেছেন। হাটিয়া হাটিয়া পথশ্রমে দেহ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত নাই, কেবল ঐ এক চিন্তা—কিসে জীব হরিনাম পাইবে। কেহ পাপে লিপ্ত হইয়া, কেহ পুণ্যকর্ম্মে আসক্ত হইয়া, কেহ রোগশোকে সন্তপ্ত হইয়া, কেহ বা জ্ঞানের অভিমান করিয়া, কেহ বিষয়ে রত থাকিয়া, কেহ বা শাস্ত্রের কূট তর্ক লইয়া পাণ্ডিত্যের গরব করিয়া নিত্যসুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। প্রভু সকলের কথাই ভাবিলেন। জীবমাত্রেরই দুঃখের কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে দুঃখ দিল; তিনি সকলের ব্যথায় ব্যথিত হইলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, কঙ্করময় পথই হউক, আর হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশই হউক, প্রভু সব সময় সর্ব্বত্র হরিনাম বিলাইতে চলিয়াছেন। পথে ব্যাঘ্র ভল্লুক, মদমত্তহস্তী প্রভৃতি বন্যজন্তু পড়িয়াছে;

তিনি বলিলেন, 'হরিবোল।' আর তাহারা হরি বলিয়া নাচিল। কেনই বা নাচিবেনা, আর কেনই বা হরিনাম নিবে না! সকলেই যে প্রভুকে প্রাণের বান্ধব বলিয়া চিনিল। সকল জীবই বুঝিতে পারিল, ইনি তাহাদের প্রাণের প্রাণ। এমন বস্তুকে পাইয়া আনন্দে আপনা হইতে তাহাদের নৃত্য আসিল, এবং, এ হেন প্রাণের বান্ধব যাহা বলিতেছেন, তাহা বলিয়া তাহারা ধন্য হইল। আপামর সকল জীবের জন্যই যে প্রভু আমার বেদনা অনুভব করিলেন! পথ হাটিতে হাটিতে ক্লান্ত হইয়া কখন বা কোন প্রান্তরে বসিয়া, কখন বা বৃক্ষতলে বসিয়া জীবের দুঃখে তিনি করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেন। সেই করুণ ক্রন্দন, প্রবলআর্ত্তি-সহকারে সেই মর্ম্মস্পর্শী রোদন শুনিয়া লোকজন আসিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইত; তাহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'তুমি কে গো! এই তোমার নবীন বয়স। এ হেন অঙ্গকান্তি সাধারণ জীবে সম্ভবেনা। এই বয়সে কেনই বা তুমি এই কঠোর সন্ন্যাস করিলে! তোমার দুঃখ কিসের? তুমি কান্দ কেন?' প্রভু এ কথায় আর কি উত্তর দিবেন! তিনি ভাবিলেন, 'ইহারা আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমার দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছে।' এই আনন্দে প্রভু আর কথা কহিবেন কি! তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, 'তোমরা হরিনাম লও।' এই বলিয়া 'হরিবোল' বলিয়া প্রভু বাহু তুলিয়া নাচিয়া উঠিলেন। আর সমবেত লোকসঙ্ঘও সেই সঙ্গে 'হরিবোল' বলিয়া নাচিয়া উঠিল। সকলে যখন আনন্দে আত্মহারা হইলেন, তখন প্রভু সেখান হইতে অন্যত্র চলিলেন। এইরূপে হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে প্রভু সারাটী দেশ ঘুরিলেন। প্রভু আর কি করিলেন? না, জনে জনে ধরিয়া কোল দিতে লাগিলেন। দীন হীন দুরাচার, কুষ্ঠরোগী পর্য্যন্ত, কিছুই তিনি বাছিলেন না। কে কি, সে পরিচয় লওয়ার তাঁহার অবসর নাই, প্রয়োজনও নাই।

এই অপ্রাকৃত অপার্থিব বস্তু প্রেম তিনি দান করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য দান করা। তিনি দিতে পারিলেই সুখী। সুতরাং, অন্য কোন কথাই তাঁহার মনে আসিতনা। কে কি, সে বিচারেও তাঁহার দরকার নাই। যে যা-ই থাকুক, সকলেই যে তাঁহার আপন, সকলকেই যে তিনি প্রাণের মত ভালবাসেন—সকলেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীব! এই জীবগণের সুখের লাগিয়াই ত শ্রীমতী তাঁহাকে এই কঠোর কার্য্যে বিদেশে আসিতে অনুমোদন করিয়াছেন! তাই তিনি সকলকেই তাঁহার স্নেহময় বুকে ধারণ করিলেন। তিনি আর কি করিলেন, দেখুন। কোথাও তিনি ভিক্ষা মাগিলেন। যিনি নদীয়ার সম্পত্তি, শচীমায়ের আদর সোহাগের ধন, বিষ্ণুপ্রিয়া ও নাগরীগণের প্রাণবল্লভ, ভক্তগণের প্রাণ, তিনি কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া কত যেন অভাবগ্রস্ত হইয়া ভিক্ষুকবেশে জীবের দুয়ারে উপস্থিত—করযোড়ে তিনি জীবের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন! সে কি ভিক্ষা? না, বলিলেন, 'ভাই সব, তোমরা হরিনাম লও। তোমাদের দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। তোমরা হরিনাম লইয়া আমার এই দুঃখ দূর কর। আমায় সকলে কৃপা করিয়া এই ভিক্ষা দাও।' প্রভুর এই মর্ম্মভেদী দুঃখ দেখিয়া জীব আর স্থির থাকিতে পারিলনা; আকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল, আর বলিল, 'প্রভু, তোমার দুঃখ আর সহিতে পারিতেছি না। তোমার এ দৈন্য, এ দীনহীন কাঙ্গাল বেশ সম্বরণ কব। তুমি যে-ই হও, আমাদের সে পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। তুমি যে আমাদের চিরকালের বান্ধব, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ প্রতীতি হইতেছে। আমাদের দুঃখ দেখিয়া কান্দে, এমন বান্ধব ত্রিজগতে আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। তুমি আমাদের পরম প্রিয় বস্তু। আমরা আর তোমার দুঃখ সহিতে পারিতেছি না। রোদন সম্বরণ কর। আমাদের দুঃখ দূর হয় হউক, না হয় না হউক,

তাহার জন্ত আমাদের ভাবনা নাই। তোমার যাহাতে সুখ হয়, তাহা করিতে আমরা শতবার প্রস্তুত। প্রভু, তুমি দৈন্ত সম্বরণ কর, আমরা হরিনাম লইতেছি। শুধু আমরা কেন, তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমরা হরিনাম বিলাইব, এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিব, যেন, সকলে শুনিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। কিন্তু, প্রভু, আমরা যেমন তোমার কথা রাখিলাম, তোমারও অবশ্য আমাদের এক নিবেদন রাখিতে হইবে। সে-টী এই, তুমি আর এই কাঙ্গাল বেশে থাকিতে পারিবেনা, তুমি রাজরাজেশ্বর হইয়া বস, আর আমরা তোমার একটু সেবা করিয়া ধন্য হই। তুমি আমাদের এত ভালবাস! আমরা দুঃখ পাই, সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলাম, তাহাতে তোমার কি! তুমি আমাদের এ দুঃখ সহিতে পারিলেনা! তাই তোমার এই মলিন বেশ, আর বিষণ্ণ বদন! আমাদের জন্য কাঁদে, এমন জন ত আমরা এতদিনে আর দেখি নাই! এতদিনে বুঝিলাম, আমাদের একজন পরম বান্ধব আছেন। অসাধনে সেই বান্ধব তুমি আসিয়া উদয় হইলে! যেমন বান্ধবের কার্য্য করিলে, সখা, তেমন এই অধম কাঙ্গালদেরও একটি নিবেদন তোমায় রাখিতে হইবে! তোমার মা আছেন, তোমার প্রাণবল্লভা প্রিতয়মা পত্নী আছেন। আমাদের জন্তই তাঁদের দুঃখ দিয়া তুমি আসিয়াছ, এখন তুমি তাঁদের কাছে বিরাজ কর। আমাদের দুঃখ দেখিয়া যেমন তোমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, প্রভু, তোমার দুঃখ দেখিয়াও তেমন আমাদের প্রাণ বাহিরিয়া যাইতে চায়।' এইরূপে প্রভু প্রথমতঃ ভালবাসিয়া জীবকে আত্মসাৎ করিলেন, ও পরে তাহাকে হরিনাম দিলেন। এইভাবে তিনি হরিনাম প্রচার করিলেন। এই ভাবে প্রভু জীবকে ভালবাসা দিলেন ও জীবের ভালবাসা পাইলেন। এই যে প্রভু শুদ্ধ প্রেম লইয়া জীবের পরম বান্ধব হইয়া লীলাবিলাস

করিলেন, ইহাই হইল শ্রীরাধার ভাবকান্তি, এবং ইহাই হইল প্রভুর অঙ্গের ভূষণ।

হে গৌরভক্তগণ! আপনারা যদি গৌরধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, তবে সকল জীবকে নির্বিবচারে ভালবাসুন। কে কি, কে কোন্ পন্থাবলম্বী, বা কে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, কে বিধিনির্দ্দিষ্ট আচরণ করে কি না, এই সব বিচার ছাড়িয়া আপনারা সর্ব্বসাধারণ জীবকে প্রাণের সহিত ভালবাসুন, সকলেই আপনাদের হউক এবং আপনারাও সকলের হউন। আপনারা যদি শ্রীগৌরাঙ্গের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে চান, তবে তাঁহার প্রেমের নিশান উড়াইয়া দিউন। সকলকে আপনারা এমনভাবে প্রীতি দিউন, যেন, আপনাদের মধ্যে গৌরধর্ম্ম সকলে উজ্জ্বল মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়। দশ বিশটী মঠ স্থাপন করিলেই বা দশ বিশ জনকে দীক্ষা দিয়া এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ে আনয়ন করিলে, কিম্বা এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে প্রবেশ করাইলেই গৌরধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইবে না। প্রত্যেকের গৃহখানি এক একটী মঠ হউক—এক এক খানি গৌরাঙ্গেব মন্দির হউক, গৃহখানি কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই গৌরাঙ্গের মন্দির হউক, এবং, তাঁহার মধ্য দিয়া গৌরধর্ম্মের জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত করুক। মঠ স্থাপন কবিয়া ধর্ম্ম প্রচার করা যদি প্রভুর উদ্দেশ্য হইত, তবে তিনি তাঁহার পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, যাঁহার বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা, শ্রীল রূপ সনাতন, যাঁহারা বাংলার নবাব হোসেন সাহের প্রবল প্রতাপশালী মন্ত্রী, রাজা প্রতাপ রুদ্র, যিনি উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি, রায় রামানন্দ, যিনি রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, এই সকল সমৃদ্ধিশালী পার্ষদগণকে দিয়া তিনি বাহুস্থানে বহু মঠ স্থাপন করিতে পারিতেন। মঠস্থাপন ত দূরের কথা, মুসলমানের অত্যাচারে বৃন্দাবনের লীলাস্থলীসমূহ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করিবার জন্যও

প্রভু কাহারো নিকট এক কপর্দ্দকও ভিক্ষা মাগিলেন না। তবে তিনি কি করিলেন? না, রূপ সনাতনকে ও রঘুনাথ দাসকে কাঙ্গাল সাজাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন। রায় রামানন্দকে রাজমহেন্দ্রীর শাসন কর্ত্তার পদ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া নিজের নিকটে রাখিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র রাজা রহিলেন বটে, কিন্তু, তাঁহাকেও নিষ্কিঞ্চন নিস্পৃহ করিয়া দিলেন। এই ভাবে এক একটী ভক্ত এক একটী মঠ বা শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির হইলেন, এবং, ইঁহাদের দ্বারাই প্রভু তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম জগন্ময় প্রচার করিলেন।

কেহ কেহ সমাজসংস্কার একটী বড় কার্য্য বলিয়া মনে করেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে সমাজ সংস্কারকের আসন দান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ সংস্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু, তাহা আনুষঙ্গিক ভাবে আপনা হইতে সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার সময় জাতি-ভেদের কঠোর নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল। এজন্য তিনি বক্তৃতা করিলেন না, বা শাস্ত্র হইতে শ্লোক প্রমাণ লইয়া, বা যুক্তিতর্ক দিয়া কাহাকেও বুঝাইলেন না; অথবা, তিনি ইহা কহিলেন না যে, তথাকথিত নিম্নস্তরের হিন্দু দিগকে সমাজে রক্ষা করিতে হইলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা না হইলে হিন্দুসমাজ, হিন্দু জাতি ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তবে তিনি কি করিলেন? না, সকলকে প্রেম দিয়া আপন করিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, প্রেমধর্ম্ম সমাজ-নীতি, রাজ-নীতির অতি উর্দ্ধে। পূর্ণের মধ্যে অংশ আছে। পূর্ণবস্তু পাইলে অংশের কার্য্য আপনা হইতে সাধিত হইবে, তজ্জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তাঁহার এই ভালবাসা পাইয়া জীবের কি হইল, দেখুন। শ্রীগৌরাঙ্গ সকলের প্রীতির আস্পদ হইলেন— সকলেরই একমাত্র প্রেমের পাত্র হইলেন। সুতরাং, শ্রীগৌরাঙ্গই সকলের ধর্ম্ম, গৌরাঙ্গই সকলের জাতি হইলেন। মুরারি গুপ্ত ছিলেন বৈদ্য, প্রভু তাঁহার অন্ন খাইলেন। আবার, হরিদাস ঠাকুর

ছিলেন যবন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার পাদোদক খাইলেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ছিলেন কায়স্থ, কিন্তু গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের অন্ন খাইলেন, এমন কি, তাঁহার প্রসাদ পাইলেন। ঝড়ু ঠাকুর ছিলেন ভুঁইমালী, আর, কালিদাস ছিলেন কায়স্থ, কালিদাস ঝড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট খাইলেন। এইরূপে জাতিভেদ উঠিয়া গেল। কেবলমাত্র পুরীতেই মহাপ্রসাদে জাতি বিচার রহিত হইয়া গেল, তাহা নহে; সর্ব্বত্রই এইরূপ হইল। বর্ত্তমানে দেখা যায়, পুরীতে এখনো মহাপ্রসাদে জাতিবিচার নাই, কিন্তু অন্যত্র বহুস্থানে আছে। সম্প্রতি শ্রীশ্রীমাদাদার গণ এবং শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজীরগণ মহাপ্রসাদে জাতি-বিচার করেন না। তাঁহাদের আচরণ দ্বারা তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন,এবং, শুনিতে পাই,শ্রীশ্রীমাদাদার গণ মুসলমানকে লইয়া এক সঙ্গে প্রসাদ পাইতে কুণ্ঠাবোধ করেন না; বহু মুসলমান এই প্রেমধর্ম্ম পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছেন। আমি একদিন এক খ্যাতনামা বৈষ্ণব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীগৌরাঙ্গকে যে মহাজনগণ সচল জগন্নাথ বলিয়া থাকেন, ইহা কি সত্য?' তিনি উত্তর করিলেন—কি বলেন? এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি যে স্বয়ং ভগবান্!

আমি—জগন্নাথকে যে ভোগরাগ দেওয়া হয়, তাহা মহাপ্রসাদ; যাঁহারা গৌর ভজন করেন, তাঁহারা ত শ্রীগৌরঙ্গকে ভোগরাগ দেন, তাহাকে কি বলিবেন?

গোস্বামী—কেন! তাহাও মহাপ্রসাদ।

আমি—পুরীতে যেরূপ মহাপ্রসাদে জাতি বিচার নাই, অন্যত্রও ত সেইরূপ জাতি-বিচার করা কর্ত্তব্য নয়!

গোস্বামী—নিশ্চয়। ভগবানে নিবেদিত দ্রব্য সর্ব্বত্রই মহাপ্রসাদ! উহাতে জাতি-বিচার করা যে ঘোর অপরাধ!

এই বৈষ্ণব গোস্বামী একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁহার এই উদারতা ও প্রেম-ধর্ম্মের প্রকৃত আচরণ দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম। এই ভাব হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইলে বড় সুন্দর হয়।

সে যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা বক্তৃতা দিয়া বুঝাইলেন না। তিনি প্রেম দিয়া সকলকে আত্মসাৎ করিলেন। বর্ত্তমানে জাতি লইয়া যে একটী ভেদ আছে, তখন গৌরভক্তগণ ইহা ভুলিয়াই গেলেন; এমন কি, মহাজনগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।

আবার, আর এক দিক্ দিয়া আপনা হইতে কি সমাজসংস্কার সাধিত হইল, দেখুন। পতি তাহার পত্নীর নিকট ভগবানের আসন গ্রহণ করিয়া বসিল। সে সরলা অবলা জাতিকে বুঝাইল, স্ত্রীলোকের পতি-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই স্বর্গ, ইহাই মোক্ষ, ইহাই সব। পতি যদি অন্যায়ও করে, তথাপি পত্নী কিছু কহিতে পারিবে না, সকল অত্যাচার তাহার নীরবে সহিয়া থাকিতে হইবে। শাস্ত্রে যেমন পতি-সেবার প্রকৃষ্টতার কথা লেখা আছে, তেমনই আবার ইহাও শাস্ত্রের কথা যে, পতি যদি অপতিত হয়, তাহা হইলেই পত্নী পতির অনুগত হইয়া চলিবে, আর যদি পতি পতিত হয়, ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে পরিহার করিবে। কিন্তু শাস্ত্রের শেষোক্ত উপদেশের কথা কেহ বড় একটা কহিল না। পত্নীকে ব্যাধি বা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই, পতিবিয়োগে পত্নী যখন বিধবা হয়, তখন পতি পরলোক হইতে আসিয়া পত্নীর ভরণপোষণ করে না, ইহা ভগবৎকৃপায় আপনা হইতেই হয়। তথাপি, পতি পত্নীর নিকট ভগবানের আসন গ্রহণ করিয়া

তাহার নিকট হইতে সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা দাবী করিতে লাগিল। সীতার মত অনেকে পত্নী চাহেন, কিন্তু, রামের মত পতি হইতে প্রস্তুত নহেন। নারী জাতিকে এইরূপে হীন বল করিয়া রাখা হইয়াছিল; পতি-সেবা ছাড়া আর তাহাদের কোন সেবা পূজার অধিকারই ছিলনা। এমন কি, ব্রাহ্মণগণ ভগবৎভজন করিতে অধিকারী, কিন্তু, তাঁহাদের পত্নীগণ ইহা হইতে বঞ্চিত। তাহারা যদি শালগ্রাম স্পর্শ করিল, তবে তাহার জাতি গেল, তাহার আবার পঞ্চগব্য করিয়া শোধন না করিলে শালগ্রামের পূজা অর্চ্চনা হইতে পারিবেনা। নারীগণ যেন কত অপরাধী, কত নিকৃষ্ট জীব। তাঁহারা রন্ধন করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু, ভোগ লাগাইতে পারিবেন না। মোট কথা, তাঁহারা বেদে ভগবানে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া যখন প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, সকলেই যখন শ্রীগৌরাঙ্গকে ভালবাসিবার সুযোগ পাইল, তখন এই কঠোর নিগড় আপনা হইতে খসিয়া পড়িল। জীবগণ দেখিল, বুঝিল, শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র পতি—তিনি পুরুষেরও পতি, নারীগণেরও পতি তিনিই সকলের একমাত্র প্রেমাস্পদ। এই সত্য যখন পতিগণের হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন আর তাহারা পত্নীদিগের প্রতি অন্যায় আব্দার, অনুচিত দাবী করিল না। নারীগণও স্বাধীন-ভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে ভজন করিবার অধিকার পাইল। এমন কি, নারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আচার্য্যের স্থান অধিকার করিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে তখন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর কৃপা পাইয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার জামাতা অমোঘ ভ্রষ্টাচার, তখন তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিয়া ফেলিলেন, যে, তাঁহার কন্যা বাটী স্বামীকে পরিহার করুক। এইরূপে প্রভু নারীগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব সঞ্চারিত করিলেন। ইহা প্রেমধর্ম্ম প্রচারেরই আনুষঙ্গিক ফল, এই জন্য প্রভু কোন পৃথক্ চেষ্টা করেন নাই।

এইরূপে আমরা যে দিক্ দিয়া চাই, সেই দিকেই দেখিতে পাই, গৌরপ্রেম পাইয়া সমাজসংস্কার আপনা হইতেই সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইয়াছে। গৌরভক্তগণ বিধির বন্ধন, শাস্ত্রের শাসন হইতে আপনা হইতে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিধিরও বিধি। প্রেমের নিকট কোন বিধি নিয়ম নাই। বিধি কাহার জন্য ? না, যাহার পদে পদে ভুল করার সম্ভব। প্রেমের জ্যোতিতে যখন মানুষ উদ্ভাসিত হয়, তখন তাহা দ্বারা কোন ভুল ভ্রান্তি সম্ভবপর হয় না। গৌরভক্তগণ দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া সব কার্য্যে পরিচালনা করিতেছেন। প্রতি কার্য্যে তাঁহারা তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শম, যম, দম, নিয়ম, তিতিক্ষা প্রভৃতির সাধন করিয়া, কত ব্রত, পূজা, যাগ যজ্ঞ, উপবাস করিয়া তাঁহারা যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই, প্রতি কার্য্যে ভগবানের সত্ত্বা ও কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, গৌরাঙ্গের প্রেম পাইয়া তাঁহারা অনায়াসে সেই অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। সুতরাং, বিধি নিয়ম, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যাগযজ্ঞ, সকলই গৌর-প্রেম-জলে ভাসিয়া গেল। একমাত্র ভগবান্ই তাঁহাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন, আর কিছু স্থান পাইল না। শাস্ত্রে শাসন করে। যাহারা দুর্ব্বিনীত, পথভ্রষ্ট, তাহাদিগকেই শাসন করা প্রয়োজন, এবং, তাহাদের জন্যই শাস্ত্রের উদ্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে ভালবাসিয়া এমনই আপন করিয়া লইলেন যে, তাঁহারা আর এক জগতে যাইয়া পৌছিলেন, ভক্তগণ যাঁর যাঁর স্ব-ভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে, ন্যায় অন্যায় কি, তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারিলেন না, সকলেই সরল শিশুর মত হইয়া গেলেন, সুতরাং, শাস্ত্রে আর তাঁহাদের প্রয়োজন কি! গৌরাঙ্গই হইল তাঁহাদের শাস্ত্র, গৌরাঙ্গই তাঁহাদের বিধি, গৌরাঙ্গই তাঁহাদের গতি, গৌরাঙ্গই তাঁহাদের সব। অন্য পূজা অর্চ্চনা আর তাঁহাদের রহিল না।

ভাই ভাই মিলিয়া সকলে নাচিয়া গাহিয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আর একটী কথা কহিয়া এ বিষয়টী সমাপ্ত করিব। বলিতে গেলে তাঁহার অনন্তমুখী সংস্কার—ব্যক্তিগত ভাবে, সমাজগত ভাবে, জাতিগত ও দেশগত ভাবে, ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সংস্কারের কথা আর ফুরাইবে না। যখন প্লাবন হয়, তখন খাল বিল, নদী নালা, কূপ পুকুর, ছোট বড় গর্ত্ত, যেখানে যা থাকে, সব ভরিয়া একাকার হইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের প্লাবনেও সেইরূপ কাহারো কোন অভাব রহিলনা, যেখানে যাহা প্রয়োজন, আপনা হইতে তাহা সাধিত হইল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটী প্রবল বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব ছিল। হিন্দু মুসলমানকে বিধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছ বলিত, এবং মুসলমান হিন্দুকে কাফের বলিত। বাস্তবিক বিধর্ম্মী বলিতে ধর্ম্মবিহীন, ও, ম্লেচ্ছ বলিতে অপবিত্র বুঝায়। এই অর্থ ধরিতে গেলে বহুলোকই ত বিধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছ। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, বাহিরে বিজ্ঞাপনের বস্তু নহে। প্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। ইহা যাঁহার নাই, তিনিই ত বিধর্ম্মী, এবং, মন যাঁহার পবিত্র নয়, অর্থাৎ,যিনি মাৎসর্য্যপূর্ণ তিনিই ত অপবিত্র বা ম্লেচ্ছ, এখন তিনি বাহিরে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিউন, অথবা মুসলমান বলিয়াই খ্যাত হউন. তাহাতে কিছু যায় আসেনা। আবার, কাফের অর্থ অবিশ্বাসী বা অকৃতজ্ঞ। এ অর্থ ধরিলে বহু লোকই ত কাফের! সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বত্র ভগবানের সত্বা প্রকৃত বিশ্বাস করি আমরা ক'জনে? এবং, সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ, সকলই শ্রীভগবানের দান ও তাঁহার কৃপা বলিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করে ক'জনে! ধর্ম্ম বাহিরের আচবণে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিত। ইহার ফলে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ আচরণের নিয়ম প্রণালী এত শক্ত করিয়া বাঁধিলেন যে,বহু

হিন্দুই তদনুসারে চলিতে না পারায় ব্রাহ্মণগণই তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া দিলেন, এবং তাহারা মুসলমান-শ্রেণীভূক্ত হইয়া সুস্থ বোধ করিল। এই কয়েক মাস পূর্ব্বেই এইরূপ একটী ঘটনা হয়, এক ব্রাহ্মণের গৃহে একটী গরু মারা যায়। সমাজের ব্রাহ্মণগণ তাহাকে একবারে বর্জ্জন করিলেন। যেহেতু তাঁহাদের মতে ইহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। তখন ঐ ব্রাহ্মণটী নিরুপায় হইয়া মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। আর একটী ঘটনা বলিতেছি, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একটী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হয়। কোথায় তাহাকে সকলে সাহায্য করিবে, আর তাহার পরিবর্ত্তে সে বয়স্থা কন্যা উপযুক্ত সময়ে পাত্রস্থা করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে সমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, এবং, এমন কি, বর্জ্জন করিতে চাহিল। নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণ স্ব সমাজ ছাড়িয়া মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বর্ত্তমান সময়ই যদি এইরূপ সম্ভবপর হয়, তবে সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দু সমাজের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ফল কথা, বহু হিন্দু তখন মুসলমান হইলেন; হিন্দুরা মুসলমান হইলেন বটে, কিন্তু, হিন্দুরা মুসলমানদিগকে স্বীয় সমাজে লইলেন না। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন। তিনি আসিয়া সমাজ-সংস্কারের কোন উপদেশ বা বক্তৃতা দিলেন না। তিনি উচ্চ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু, তাই বলিয়া তিনি কোন সমাজ-বিশেষের কথা কহিলেন না। তিনি যে স্বয়ং ভগবান্! তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই প্রভু। তিনি কি করিলেন? না, তিনি নির্ব্বিচারে সকলকে ভালবাসিলেন। প্রকৃত ধর্ম্ম যে প্রেম, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেনও শিখাইলেন; হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার ভালবাসা পাইয়া ও তাঁহাকে ভালবাসিয়া তুল্য কৃতার্থ হইল। বাংলার নবাব হুশেন সাহ বলিলেন,

'আমরা যাঁহাকে আল্লা বলি,হিন্দুরা যাঁহাকে নারায়ণ বলে,এই শ্রীগৌরাঙ্গই সেই স্বয়ং বস্তু।' প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে যাত্রা করিলেন, পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন; তখন পিছলদা নদীর এক পার পর্য্যন্ত উড়িষ্যার সীমা, অপর পার পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সীমা। উড়িষ্যা হিন্দুরাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে, এবং, বাংলা দেশ মুসলমান নবাব হুসেন সাহের অধীন। সুতরাং, এক পার হিন্দু অধিকারী দ্বারা ও অপর পার মুসলমান অধিকারী দ্বারা রক্ষিত। তখন এই দুই হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত, সুতরাং, এই দুই পারের দুই হিন্দু ও মুসলমান অধিকারীর মধ্যে ঘোর বিরোধ ছিল। কিন্তু,প্রভুর প্রেম পাইয়া হিন্দু অধিকারী বিরোধ ভুলিয়া গিয়াছেন। এদিকে মুসলমান অধিকারীর এক চর লক্ষ লক্ষ লোক-সংঘট্টের হেতু জানিবার জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নদীর অপর পারে উড়িষ্যার সীমান্তে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিল। দর্শনমাত্র সে প্রেম পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই মুসলমান অধিকারীর নিকট জানাইল, 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর একটী অপার্থিব বস্তু'; ইহা বলিতে বলিতে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া সেই চর বিহ্বল হইলেন। ইহা শুনিয়া, ও, ঐ চরের অকস্মাৎ এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া মুসলমান অধিকারীর মন ফিরিয়া গেল। তিনি তখন প্রভুকে দর্শন করিবার মানসে ঐ হিন্দু অধিকারীর অনুমতি লওয়ার জন্য একজন বিশ্বাসী ভৃত্য পাঠাইলেন। সেই বিশ্বাসী রাজপাত্রও প্রভুকে দর্শন করিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। হিন্দু অধিকারী তখন প্রেম পাইয়াছেন, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলেন যে, সেই মুসলমান অধিকারী আসিয়া প্রভুকে সচ্ছন্দে দর্শন করিয়া যাউন। মুসলমান অধিকারী এই সংবাদ পাইয়া বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি হিন্দু-বেশে প্রভুর নিকট আসিলেন; আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার নয়ন বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। হিন্দু অধিকারী তাঁহাকে

সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, ও তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সেই মুসলমান অধিকারী তখন প্রভুর নিকট কৃষ্ণনাম পাইয়া ধন্য হইলেন, এবং, করযোড়ে দাঁড়াইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আপন দৈন্য জানাইতে লাগিলেন, যথা—

গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥

প্রভু তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন, এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন।

এই ত হইল মহাপ্রভুর প্রেমের বিকাশে এতাদৃশ পরিবর্ত্তন। এখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য গদাধর দাসের কার্য্য দেখুন। তাঁহার বাড়ী খড়দহের সন্নিকটে এড়িয়াদহ গ্রামে। এই গ্রামে বহু কাজীর বাস। গদাধর দাস প্রেমে এতই পাগল, যে, তিনি সমস্ত কাজীগণকে হরিভক্ত করিয়া তুলিলেন।

এইরূপে হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষ ত আর রহিলই না, পরন্তু, সকলের মধ্যে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইল; কারণ, সকলেরই প্রাণের দেবতা হইলেন সেই একমাত্র প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

এই যে বঙ্গদেশে, উড়িষ্যায়, দাক্ষিণাত্যে, পশ্চিমাঞ্চলে—ভারতবর্ষের বহু স্থানে বহু মুসলমান হিন্দু হইলেন, এই জন্য প্রভু কোন বক্তৃতা বা উপদেশ দেন নাই। তিনি নির্বিচ্চারে সকলকেই ভালবাসিলেন। শ্রীভগবান্ কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহেন, তিনি সকলেরই, তিনি প্রেমময়, পরম কান্ত, পরম মধুর, প্রাণের পরম বান্ধব। এই সত্য সকলে শ্রীগৌরাঙ্গে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান্ দেখিল। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহাদের প্রাণের পরমারাধ্য, পরমোপাস্য হইলেন।

অতএব, হে কৃপাময় গৌরভক্তগণ! আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বের কল্যাণ কামনা করেন; সুতরাং, খুঁটিনাটী পরিহার করিয়া, দোষ গুণ বিচার না করিয়া, সকলকে নির্বিচারে ভালবাসুন। ইহাই গৌরধর্ম্ম। এই গৌরধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম আপনাদের মধ্যে দেদীপ্যমান দেখিলে সকলে ইহাতে প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার সুযোগ পাইবে। যিনি যে সমাজে থাকুন, বা সম্প্রদায়ভুক্ত হউন, প্রেমই সকলের অভীষ্ট বস্তু হইবে, এবং, প্রেমধর্ম্মই সর্ব্বোপরি বিরাজ করিবে, তখন জগতখানি সুখময় নিকেতনে পরিণত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া জীবকে জানাইলেন, প্রেমই জীবের আরাধ্য, এইজন্যই প্রভু জীবের জন্য 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া কাঁদিলেন, এবং, এই জন্যই তিনি পরিপূর্ণ কান্ত বা পরিপূর্ণ মধুময় হইয়া জীবের নিকট ধরা দিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম বলেন,—ভগবান্ই জীবের একমাত্র প্রভু, জীবগণ তাঁহার দাস। হিন্দুরাও বলেন—জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণের দাস। ধর্ম্মের মূল সূত্র সকলেরই এক, এক সূতায়ই তিনি সকলকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু, মুসলমানগণ বলিলেন, তাঁহাদের আচরণ গ্রহণ না করিলে জীবের আর গতি হইবে না; হিন্দুরা বলিলেন, তাঁহাদের আচরণ গ্রহণ না করিলে জীবের আর কোন কল্যাণ হইবে না। ইহা হইতেই দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতির সৃজন হইল। তখন প্রেমময় শ্রীভগবান্ বিশুদ্ধ প্রেম লইয়াই জীবের গোচর হইলেন, এবং, হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে পরিপূর্ণ প্রেমময় প্রভু—পরিপূর্ণ কান্ত-ভাবে প্রাপ্ত হইলেন—দ্বেষ হিংসা চলিয়া গেল—সুখের সংসার পুনরায় সুখময় ধামে পারণত হইল। আবার দেখুন, সাধু-পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ পাপীদিগকে ঘৃণা করিতেন। প্রত্যক্ষভাবে ঘৃণা না করিলেও দূরে দূরে থাকিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আসিয়া উভয়কেই তুল্যভাবে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দিলেন। পুণ্যাত্মাগণ

ঐরূপ ঘৃণা করেন বলিয়া তাঁহাদিগকেও ধমক দিলেন না, আর, পাপীকেও পরিহার করিলেন না কিম্বা, তাঁহাদিগকে বলিলেন না, 'তোমরা পাপ-পঙ্ক ক্ষালন করিয়া আইস, তবে তোমাদিগকে গ্রহণ করিব।' অথবা, তিনি একথাও বলিলেন না 'যে-ই আমার নিকট আসুক, আমি তাহাকে গ্রহণ করিব।' এই আশ্বাসবাণী বলায়ও পতিত জীবের কোন উপকার হইত না, কারণ পাপের মলিনতায় জীব যখন আচ্ছন্ন হয়, তখন শত ডাকিলেও বিশুদ্ধ বস্তুর নিকট যাওয়ার জন্য তাহার ইচ্ছার উন্মেষ হইবে কেন! সে ত পাপকেই ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা যে প্রিয় কিছু আছে, তাহা ত তাহার বোধ নাই। সে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে গেলে তবে ত তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন! কিন্তু, সে যে যাইতেই পারে না! এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিজেই পতিত জীবের দুয়ারে দুয়ারে গেলেন, এবং যাইয়া জনে জনে আলিঙ্গন দিলেন। তিনি পাপীরও বন্ধু হইলেন, সাধুরও বন্ধু হইলেন—সকলের নিকটই তিনি পরম কান্ত—পরম মোহন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইলেন। আর জীবের পাপ রহিল না; পাপপুণ্য, শুভ অশুভ জীব সমাজ হইতে চলিয়া গেল, রহিল কেবল আনন্দ, আর এই আনন্দে সাধু অসাধু, বড় ছোট, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু মুসলমান, সকলে বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল, এবং, পরস্পর পরস্পরের গলা ধরিয়া ভাই ভাই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন দিতে লাগিল। এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-বিলাস করিলেন।

এইরূপে জীব যেমন শ্রীভগবানের খেলার সাথী হইল, জীবগণও সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কে খেলার সাথী পাইয়া ধন্য হইল।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য কুলের বাহির হইলেন, এবং, প্রেমের প্রবল স্রোতে তাঁহার কুলশীল সব ভাসিয়া গেল। শ্রীরাধা জীবের প্রতিনিধি। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে এইরূপ করিলেন। আর, শ্রীগৌরাঙ্গ

রাধাপ্রেমে কি করিলেন? তিনিও কুলের বাহির হইলেন। জীবের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এতই প্রবল, যে, সেই স্রোতে সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—বিধির বন্ধন ছুটিয়া গেল, শাস্ত্রের শাসন উঠিয়া গেল, কর্ম্ম-ব্রতাদির নিয়ম নিষ্ঠা টুটিয়া গেল, রহিল শুধু আনন্দ, আর জীব 'গৌর' বলিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। জ্ঞানের কঠোরতা, কর্ম্মের নীরসতা, পাপপুণ্যের জটীল শৃঙ্খল, সব চলিয়া গেল, আর জীব বিশুদ্ধ ভাগবদ্ধর্ম্ম, অর্থাৎ, প্রেমধর্ম্ম পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ভালবাসিলেন, ইহার কিছু প্রতিদান চাহিলেন না—যেহেতু, তাঁহার প্রেম বিশুদ্ধ ও অহেতুক। আর, শ্রীগৌরাঙ্গও জীবকে ভালবাসিলেন, ইহার কোন প্রতিদান চাহিলেন না, জীবের নিকট হইতে কোন প্রকারের সাধনা, নিয়ম-নিষ্ঠা, শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলা, ইত্যাদি কিছুই চাহিলেন না। প্রেমিক ব্যক্তি রূপ গুণ বাছেন না—সকলকেই নির্বিচারে ভালবাসেন, কারণ, ভালবাসাই তাঁহার স্বভাব। যিনি অতিশয় রূপবান্, অর্থাৎ, সাধু সজ্জন, তাঁহাকেও তিনি ভালবাসিলেন, আর যিনি অতিশয় কুৎসিৎ, কদর্য্য, অর্থাৎ, একান্ত দুর্গত ও অত্যন্ত পাপনিষ্ঠ, তাহাকেও তিনি ভালবাসিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এইরূপে জীবের আনন্দশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। জীব বুঝিল, গৌর তাহাদের পরম বান্ধব—প্রিয় হইতেও প্রিয়তর—পরম প্রিয়তম বস্তু—গৌর তাহাদের হৃদয়ের রাজা, ইহপরকালে এমন বান্ধব আর ত্রিজগতে হয় না। সকলেই প্রেম পাইল, এবং, এই গৌর-প্রেম-জলে তাহাদেরও সকল বিধি বিচার খসিয়া গেল। প্রেমে যখন হৃদয় ভরপুর হইয়া যায়, আর একটুও যদি ফাঁক না থাকে, তাহা হইলে আর বাহিরের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ থাকে না। জীবগণের তখন তাহাই হইল। এইরূপে ভালবাসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবগণকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। শ্রীভগবান্ যে অদোষদর্শী, পরিপূর্ণ প্রেমময়, জীবগণ তাহা শ্রীগৌরাঙ্গে মূর্ত্তিমান্

দেখিল। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণকে প্রেম দিলেন ও তাহাদের প্রেম গ্রহণ করিলেন। তাই বৈষ্ণব মহাজনগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমগ্রহীতা, আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই। অতএব, হে কলিহত জীবগণ! আপনারা শ্রীগৌরাঙ্গের এই বিশ্বপ্লাবী প্রেমের লীলা পাঠ করুন, আপনাদেরও হৃদয় জুড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বসিবনে, তখন জীবন সুখময় হইয়া যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবর্ত্তযুগে বিবর্ত্তলীলা। লোকে ভগবান্‌কে ভয় করিত, এবার তিনি আসিয়া উদিত হইলেন পরম কান্ত মূর্ত্তিতে। জীব করিত ভগবানের ভজন – ভগবানের দিকে ছুটিবার জন্য লোকের হইত শতমুখী চেষ্টা; আর, এবার ভগবান্ করিলেন জীবের ভজন—তিনি ছুটিলেন জীবের দিকে —জীবকে তাঁহার সুশীতল চরণ ছায়ায় আশ্রয় দেওয়ার জন্য ভগবানেরই হইল অনন্ত মুখী চেষ্টা। ইহা উপলব্ধি করিয়াই শ্রীদাদা বলিয়াছিলেন—

জগত যাঁহারে ভজে সে ভজে আমারে।

ভগবানের সেবা পূজা করার জন্য হয়ত ফুল তুলিতে বাগানে যাই। যাইয়া দেখি, কত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত কত সুষমায় শোভিত নানা জাতি ফুলে বাগানখানি ভগবান্ সাজাইয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, এবং, আমার নয়ন রঞ্জন ও ঘ্রাণের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। তাঁহাকে ভজন করিবার পূর্ব্বেই যে তিনি আমাকে ভজন করিতেছেন! কোথায় ফুলটী তুলিয়া আনিয়া তাঁহার পাদপদ্মে দিয়া অবশেষে সেই প্রসাদী বা আশীর্ব্বাদী ফুল আমরা গ্রহণ করিব, আর কোথায় তাঁহাকে দেওয়ার পূর্ব্বেই দর্শন ও

ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা উহা উপভোগ করিয়া লইলাম! ভগবান্ ঠকিবেন কেন! তিনি যে বড়, সেই বড়ই রহিলেন। তিনি ইত্যবসরে আমাদিগকে ভজন করিয়া লইলেন। এইরূপে যে কোনরূপেই হউক, তাঁহাকে ভজন করিতে যাইয়া দেখি, তিনিই আমাদিগকে ভজন করিতেছেন। আমাদের জীবনের প্রতি ব্যাপার, প্রতি কার্য্য সূক্ষ্ম বিচার করিলে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দান অবনত মস্তকে গ্রহণ করা ও তাঁহাকে লইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করা এবং তাঁহার লীলা আস্বাদন করাই সর্ব্বোচ্চ ভজন। কিন্তু, জীব তাহা ধরিতে পারিয়াছিল না। তাই, তিনি স্থূলভাবে আসিয়া স্থূলদৃষ্টির গোচর করিয়া এই সহজ তত্ত্বটী জীবের সম্মুখে ধরিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ত কুলের বাহির হইলেন! কেন বাহির হইলেন, তাহা অবশ্য আপনারা জানেন। পূর্ব্ব অধ্যায়েই তাহা বলা হইয়াছে। তিনি যদি কৃষ্ণের জন্য বাহির হইতেন, তাহা হইলে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিতেন। তাহা তিনি করিলেন না। প্রথমতঃ নীলাচলে যাইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলবাসীকে উদ্ধার করার জন্য সার্ব্বভৌমের হস্তে ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি সেখান হইতে দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিতে চলিলেন। এদিকে এখন শ্রীমতীর কথা ভাবুন। সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইয়াছেন, এ সংবাদ অবশ্য শ্রীমতীর নিকট আসিয়াছে। তিনি ইহাতে নিশ্চিন্ত হইলেন; সার্ব্বভৌম তাঁহাদেরই নদীয়ার লোক, তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের যখন দ্বার-পণ্ডিত ও পুরীধামের একরকম সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখন প্রভুর আদর, যত্ন, সেবায় কোন ত্রুটী হইবে না। কিন্তু, প্রভু সে নীলাচলেও রহিলেন না। বৈশাখের প্রথম ভাগে তিনি দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। এ সংবাদও অবশ্য শ্রীমতীর নিকট আসিয়াছে। প্রভু দক্ষিণদেশে কেন গেলেন, শ্রীমতীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। বুঝিলেন বলিয়াই নদীয়ার অন্তঃপুরে বসিয়া দুঃখ করিয়য়া বলিলেন—

যো বুক পরিসর হেরি কামিনী
রস লাগি মোহই,
সো কিয়ে পামর পতিত কোলে করি
ধরণী মূরছিত রোয়ই !

শ্রীমতী সখীদিগকে বলিতেছেন, 'সখিরে, যে পরিসর বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া কামিনী-কুল রসে লুব্ধ হইয়াছেন, এখন সেই বুকে পতিত পামর টানিয়া লইয়া প্রভু আমার ধরণীতে মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আর জীবের দুঃখে রোদন করিতেছেন! সখি! এই বৈশাখে সূর্য্যের কি প্রচণ্ড কিরণ!—দারুণ আগুণের মত লাগিতেছে! কি তীব্র উত্তাপময় বায়ু বহিতেছে! এই প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া উত্তপ্ত বালুকাময় রাস্তা দিয়া প্রভু আমার নগ্নপদে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন! এ দুঃখ আমি কেমনে সহিয়া রহিব!' ইহা বলিতে বলিতে শ্রীমতী উহু উহু করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আর, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন।

আবার যখন বৈশাখে বিষম ঝড় বহিত, এবং, অশনিনিনাদে মেদিনী কম্পিত হইত, তখন শ্রীমতী ভাবিতেন, 'এই ঝড় বন্যায় প্রাণের বল্লভ আমার কোথায় নিরাশ্রয় ভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন! কে তাঁহার খোঁজ নেয়, কে তাঁহার মরম বুঝে! আমি অভাগিনী কোন্ সুখে গৃহের মধ্যে বসিয়া রহিব, ইহাই ভাবিয়া শ্রীমতী গৃহের বাহির হইতেন, হইয়া একাকিনী বসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেন, আর, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীনয়ন দিয়াও ধারা বহিতে থাকিত। সখীরা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহারা এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য সহিতে না পারিয়া কেহ কেহ বা অতি দুঃখে ধরণীর কাছে বিদায় মাগিতেন; কেহ কেহ বা বলিতেন, 'বসুন্ধরে, তুমি বিদীর্ণ হও, আমরা তোমার কোলে আশ্রয় লইয়া এ দুঃখের শান্তি করি।' কিন্তু, কোন কোন সখী শ্রীমতীরে এরূপ দুঃখের সায়রে ফেলিয়া

মরিতেও চাহিতেন না, তাঁহারা শ্রীমতীর অনুগমন করিতেন। শ্রীমতী ভাবিতেন, তিনি ত প্রভুরই অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রভুতে ও তাঁহাতে কোন ভেদ নাই; সুতরাং, তিনি যদি এইরূপ সময়োচিত দুঃখের বোঝা নিজে লয়েন, তবে প্রভুর দুঃখের ভার লাঘব হইবে। এই ভাবে সত্য সত্যই তিনি প্রভুর সহায়তা করিতেন। শুধু এই ভাবে নহে; তিনিও বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া, রোদ্রে পুড়িয়া, রজনী জাগিয়া, অনশনে কভু বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপ করিতেন, এবং, প্রভুর 'হরি নাম' প্রচারে সহায়তা করিতেন।

শ্রীমতী ভাবের অম্বুধি। তিনি এক এক সময় এক এক ভাবের তরঙ্গে পড়িতেন। বৈশাখ মাস ফুলের মাস। এই সময় মালতী, মল্লিকা, জুঁই প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধ ফুল ফোটে; সারাদিনের প্রখর রৌদ্রের পর সন্ধ্যাকালে যখন মৃদু মন্দ দক্ষিণা মলয় পবন বহিত, এবং, সেই সঙ্গে সদ্য প্রস্ফুটিত এক একটী ফুলের দিকে চাহিয়া রহিতেন, এবং, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, আর, অঝোর নয়নে দুই নয়ন দিয়া ধারা বহিতে থাকিত, তখন তিনি মনে মনে বলিতেন, 'হে গন্ধরাজ, হে যুথি, তোমরা কেন তোমাদের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছ! আমার প্রাণবল্লভ কাছে নাই। কে তোমাদের মাধুর্য্য আস্বাদন করে!' কখন বা মলয় পবনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমতী কহিতেন, 'হে মলয়ানিল, তুমি ত দক্ষিণ দেশ হইতে আসিতেছ! আমার প্রভুর সংবাদ কি! তিনি কুশলে আছেন ত! তাঁহার 'হরি নাম' প্রচার কর্য্য সমাধা হইতে আর দেরী কি! কবে তিনি আবার নদীয়ায় আসিয়া উদিত হইবেন! যাও, বায়ু, আমার ক্লান্ত শ্রান্ত প্রভুকে যাইয়া একটু সেবা কর।' এইরূপে শ্রীমতী কত কথা কহিতেন, কত ভাবে বিভোর থাকিতেন! কে তাহার ইয়ত্তা

করিবে! আবার অনেক সময় শচীমার জন্য ভাব সম্বরণ করিতেন, পাছে তাঁহার দুঃখ আরো দ্বিগুণিত হয়।

এক দিকে যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে জগতের দৃষ্টি পড়িল, অপর দিকে আবার তেমনই নদীয়ার অভ্যন্তরে এই দুইটী বস্তুর দিকে সকলে আকৃষ্ট হইল। জীবগণ ভাবিল, যে দেবীদ্বয় জীবের জন্য এই অপার্থিব বস্তুটী কাছ ছাড়া করিলেন, তাঁহারাও এজগতের বস্তু নহেন, কোন লোকাতীত জগত হইতে ইঁহারা ভূতলে নামিয়া আসিয়া জীবের দুঃখভার আপনারা গ্রহণ করিতেছেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের লোক সমূহ যেমন দলে দলে শ্রীগৌরাঙ্গে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল, তেমনই আবার পূর্ব্ব ভারতবর্ষের নরনারীগণ শ্রীনবদ্বীপের এই দুইটী বস্তুর সংবাদ লইতে লাগিল। সে সংবাদ কিরূপ! না—তাহারা ইঁহাদের পাদপদ্মে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র দেশময় হরিনামের তরঙ্গ সমুত্থিত হইল। সকলেই প্রাণের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিল, শ্রীমতী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সহিত মিলিত হউন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবময়, জগতও ভাবময়। ভাবানুরূপ সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে নদীয়া নগরে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নদীয়ার চাঁদের আজ আর আনন্দ ধরে না, বহুদিন পরে তিনি প্রিয়ার সহিত, শচীমার সহিত, প্রিয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া বিরহজনিত সন্তাপ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ আবার নদীয়া-কিশোরকে লইয়া আনন্দের রোল উঠাইলেন; যথা—

নবদ্বীপ চাঁদের আজ আনন্দ দেখিয়া,
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া।
শচীসুত উনমত প্রেমসুখে কয়
" মোর আজি যত সুখ, কহনে না যায়।

চিরকাল বিরহজনিত যত তাপ,
সো মুখ দরশনে ঘুচব আপ।"
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধা মোহন তছু যাউক নিছনি॥

কেহ বা এই মিলনলীলা স্বপ্নে দর্শন করিতেন। শ্রীল নরহরি নবদ্বীপের সব সংবাদ রাখিতেন, কারণ, তিনি নদীয়ার মধুর ভজন করিতেন। তাই তিনি উহা পদে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; যথা—

লোচনে ঝর ঝর আনন্দ লোর।
স্বপনহি পেখলুঁ গৌরকিশোর॥
চিরদিনে আওল নবদ্বীপ মাঝ।
বিহরয়ে আনন্দে ভকত সমাজ॥
কি কহব, রে সখি, রজনীক সুখ।
চিরদিনে হেরলুঁ গোরাচাঁদের মুখ॥
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক।
গোরামুখ হেরি দূরে গেল সব শোক॥

বিরহের পর মিলন, আবার মিলনের পর বিরহ, ইহাই প্রেমের রীতি; ইহাতে প্রেম পরিবর্দ্ধন করে. তাই, এই মিলনের পর আবার বিরহ হইল; যথা—

পুনঃ না দেখিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়।
নরহরিদাস কাঁদি ধূলায় লোটায়॥

গৌর-বিরহে নরনারীগণের এইরূপ শ্রীমতীর সঙ্গে সঙ্গে বিরহ ও মিলন-রস আস্বাদন হইতে লাগিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরবিরহই ইহার প্রধান কেন্দ্র ও হেতু। অদ্যাপি ভক্তগণ এই রস আস্বাদন করিতেছেন। যাঁহারা নদীয়া-যুগল ভজন করেন, এরূপ বহু ভক্তের কথা

আমরা জানি, তাঁহারা কখন বা দর্শন পান—স্বপ্নেও হয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতিও হয়, সাক্ষাতেও হয়, আবার, কখন বা দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হন, এবং, বিরহ-রস আস্বাদন করেন। অপ্রকট কালে জীবের ভজনীয় হইয়া তিনি ভক্তের সহিত যেরূপ লীলা করিবেন, প্রকট লীলাকালেই বিরহ দ্বারা তাহার সূচনা করিলেন। মোট কথা, ভবিষ্যতে যে তিনি নদীয়াযুগল-ভজনকারী ভক্তমাত্রেরই হৃদয়খানি নদীয়া করিবেন, এবং, তাঁহার হৃদয়-নদীয়ায় এইরূপ লুকোচুরি করিবেন, প্রভু-প্রিয়াজীর বিরহলীলায় এই নিত্যলীলারই সূচনা হইল; এবং, সত্য সত্যই বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, বহু ভক্তের হৃদয়নদীয়ায় তিনি উদিত হইতেছেন, আবার কোথায়—কোন দূরদেশে যাইয়া লুকাইয়া রহিতেছেন, আবার শ্রীমতীকে বামে লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উদিত হইতেছেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মহাগম্ভীরা লীলা দ্বারা কি হইল? না,—শত শত পণ্ডিতগণ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা প্রমাণ করিতে যাহা পারিলেন না, অথবা, প্রমাণ করিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে জীবের হৃদয়ে বসাইতে পারিলেন না, এমন কি, এই লীলার পূর্ব্বে কত মনীষী ব্যক্তি গভীর গবেষণা করিয়া কত গভীর তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া, শ্রীভগবান্ যে অতি নিজজন, আত্মীয় হইতেও পরম আত্মীয়, নিকট হইতে অতি নিকট, ইহা জীবকে উপলব্ধি করাইতে পারিলেন না, এই এক মহাগম্ভীরা লীলা দ্বারা সেই মহাদুরূহ কার্য্য সাধিত হইল, নদীয়ার মহাগম্ভীরা লীলা দ্বারা জীব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিল——

১। জীবের একজন পরম বান্ধব আছেন—ইনি স্বয়ং ভগবান্।

২। ইনি পরিপূর্ণ প্রেমময়—পরম কান্ত। ইনি সতত জীবের সুখেরই বিধান করিতেছেন।

৩। জগত সুখময়।

সকলে সর্ব্বত্র সুখের সন্ধান পাইল বলিয়াই এই সুখের সাগরে সন্তরণ করিতে করিতে জীবগণ নাচিয়া উঠিল, সমগ্র ভারতময় নৃত্যকীর্ত্তনের তুমুল তরঙ্গ সমুত্থিত হইল। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ, দুঃখনিবৃত্তিকামী নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী বৌদ্ধাচার্য্যগণ, কর্ম্মবাদী ক্রিয়াসক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, সকলেই এই নৃত্যকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। সেই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ সরস্বতী প্রবোধানন্দ দেখিলেন

বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে।

শত সহস্র কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সরস্বতী প্রবোধানন্দ যে সত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই, একমাত্র শ্রীমতীর বিরহ-বেদনার ফলে তিনি সেই মহাসত্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন।

অতএব, হে আমার বিশ্ববাসী ভাইভগ্নীগণ! আপনারা যদি সুখের সন্ধান চাহেন, শ্রীমতীর বিরহলীলা পাঠ করুন; দেখিবেন

আপনাদের পরম বান্ধব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আপনাদিগকে কত ভালবাসেন!

তখন যেদিকে চাহিবেন, দেখিবেন

জগতখানি কত সুখময়!

অষ্টম অধ্যায়।

প্রভু ও প্রিয়াজীর চিঠি।

প্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে নদীয়াবাসী ভক্তগণ যখন প্রভুকে দর্শন করিতে এখানে আসিতেন, তখন প্রভু দক্ষিণ দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে কহিতেন। প্রভু অবশ্য ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা যাইয়া এই সব কাহিনী শ্রীশচী মা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিবরণ করিয়া বলেন। ভক্তগণকে নীলাচল হইতে বিদায় দেওয়ার সময় প্রভু যে কত কথা কহিলেন এবং একখানি সাড়ী প্রেরণ করিলেন, তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই। সেই সব ভাব অবলম্বনে শ্রীমতীর নিকট প্রভুর একখানি চিঠি লেখা হইয়াছে। ঐ চিঠিখানি পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। প্রভুর চিঠি, যথা—

প্রিয়তমে,

উপার্জ্জন করিবারে পাঠিয়েছে মায়,
তুমিও তাহাতে প্রিয়ে, দিয়েছিলে সায়।
তাই আমি সিন্ধু-তটে করিতেছি বাস—
উপার্জ্জন লাগি মোর এহেন প্রবাস!
শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে যাহা কিছু পাই,
তখনি মায়ের কাছে সকলি পাঠাই।*

* শ্রীশচী মা শুদ্ধ সত্ব যোগমায়া। তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ প্রেম পাওয়া যায় না। মাতৃভাবই প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি। তাই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রথমতঃ জীবকে শচীমা'র দিকে আকর্ষণ করিয়া রমণীমাত্রকেই মাতৃবোধে পূজা করায় অধিকার দেন, তদনন্তর জীব বিশুদ্ধ প্রেম পায়।

প্রথমেই নীলাচলে প্রবেশি যখন,
জগন্নাথ-দরশনে করিনু গমন।
আমার হেথায় কোন ভাই বন্ধু নাই,
ইহা দেখি সার্ব্বভৌম নিল তাঁর ঠাঁই;
পরম গম্ভীর তিঁহো প্রবীণ পণ্ডিত,
তাঁরে দেখি সঙ্কুচিত হ'ল মোর চিত।
নবীন বয়সে কেন আসিনু প্রবাসে,
সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিল মোরে স্নেহ-বশে।
বলিলাম তাঁরে—আমি কাঙ্গাল দুঃখিয়া[১]
হয়েছি কাঙ্গাল আরো বিবাহ[২] করিয়া।
সার্ব্বভৌম বলে—এত অলপ বয়সে
কেমনে রহিবে তুমি এই দূর দেশে?
আমি তবে উপদেশ চাহিলাম পরে
উপদেশ[৩] দিল মোরে সাত দিন ধ'রে।
বড় বড় তত্ত্ব কথা কিছু না বুঝিনু;
আমার ঘরের[৪] কথা তাহারে কহিনু
আমার অবস্থা[৫] শুনি বুঝিল সকল,

(১) জীবের দুঃখে তিনি কাতর। তাই কাঙ্গাল বেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, জীব একবার হরিনাম লউক।

(২) শুধু জীব উদ্ধার করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। জীবকে প্রেম দিতে হইবে। নদীয়া-যুগল-ভজন পাইলে জীবের মায়ার সংসার গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার হইয়া যাইবে—জগতখানি আনন্দময় নিকেতনে পরিণত হইয়া যাইবে; জীব: তখন আনন্দে নাচিয়া উঠিবে।

(৩) বেদান্তের মায়া-বাদ-ভাষ্য।

(৪) অন্তরঙ্গ ভজনের বিষয়। (৫) ভগবৎস্বরূপ, অর্থাৎ, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, প্রেমদ্বারা তাঁহাকে ভজন করিতে হয়।

মায়ের বাৎসল্য-রসে[১] হইল বিহ্বল ;
পরেতে তোমার কথা[২] স্মরণ করিয়া
কি লাগি পড়িল যেন মূর্চ্ছিত হইয়া।
আমাদের দুঃখে বুঝি হইল বিকল,
তাই, তাঁর চিত্ত বিত্ত অর্পিল সকল।
প্রধান সম্পত্তি তাঁর পড়ুয়ার গণ
তারাও আপন বিত্ত[৩] করিল অর্পণ।
অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল আমায়—
হাস খেল নাচ[৪] গাও প্রাণে যাহা চায় ;
তোমার সংসার হইল আমার সংসার।
হেথা ব'সে অর্জ্জনের মোর সব ভার।
শচীমা'র আশীর্ব্বাদ ধরিয়া মস্তকে
কহিব তোমার কথা উড়্রবাসী[৫] লোকে।
নদীয়া-নাগর তুমি থাক নদীয়ায়,
যত কিছু উপার্জ্জন, মোর সব দায়।
তোমা হেন গুণনিধি বসায়ে রাখিব,
তোমার যতেক কাজ আমিই করিব।'
বাঁধিলেক সার্ব্বভৌম মোরে ঋণদায়,

(১) সার্ব্বভৌম স্তোত্রের মধ্যে বলিলেন 'তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং।'

(২) সার্ব্বভৌম স্তব করিলেন—নটনর্ত্তন-নাগরী-রাজকুলং।

(৩) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শিষ্যসমভিব্যাহারে প্রভুকেই প্রাণেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

(৪) সার্ব্বভৌম প্রভুকে 'দেখিলেন—কলেবরকৈশোরনর্ত্তকবেশং। এই নৃত্য পরায়ণ নবীন নাগরকেই তিনি হৃদয়ের রাজা করিয়া রাখিলেন।

(৫) সেই প্রভাবে উড়িষ্যাবাসী বহু ভক্ত অদ্যাপি নদীয়া নাগরের ভজন করেন, যথা, সম্বলপুরে স্বামী বৈষ্ণবানন্দ সরস্বতী, বি, এম, গুরু প্রভৃতি।

প্রসাদঅমৃত দিয়া শোধিলাম[২] তায়।
রাখিয়া তাঁহার হাতে উৎকলনগরী
দাক্ষিণাত্যে চলিলাম অতি তারাতারি।
শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ, কি বলিব, প্রিয়ে,
ক্রমেই সম্পত্তি মোর চলিল বাড়িয়ে।
পথের কাঙ্গাল মুই, তথাপি সকলে
ধন জন দেহ গেহ দিল অবহেলে।
প্রবল বাসনা মোর, বাছাবাছি[৩] নাই,
যে যা' দেয়, তার কাছে তাই ল'য়ে যাই।
সকলেই সব দিল, বাদ নাই কেহ,
কুষ্ঠ এক রোগী ছিল, রহিল না সেহ।
সে অপূর্ব্ব কথা বলি, শোন, প্রাণেশ্বরি,
উতরিনু গিয়া আমি শ্রীকূর্ম্মনগরী।
বাসুদেব কুষ্ঠরোগী, তার এত ধন![১]
কেহ না জানিত তার লুকান[২] রতন।
সর্ব্বস্ব দিলেক মোরে, কি বলিব, প্রিয়ে!
ভাবিতে লাগিনু—তারে তুষিব কি দিয়ে!
কি আছে আমার আর! দিনু আলিঙ্গন,
অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ করিল ধারণ

---

(২) জগন্নাথের প্রসাদ দিয়া শুদ্ধ করিলেন এবং নিজের প্রসাদ দিয়া ঋণ শোধ করিলেন। হেতুবিরহিত ভালবাসায় শ্রীভগবান্ ঋণী হন, এবং তিনি সেই ভক্তের সহিত ইষ্ট গোষ্ঠী করেন ও তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহাই মহাপ্রসাদ হয়।
(৩) পাত্রাপাত্র নির্ব্বিচারে কৃপা করিলেন।

(১) ভক্তিধন। (২) বাহিরে কুষ্ঠরোগী বলিয়া সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তিনি যে ভক্ত হইতে পারেন, ইহা কেহ ধারণা করিতেই পারিত না।

সর্ব্বস্ব দানের ফলে রোগ সেরে গেল,
অপ্রাকৃত কি কৌশলে দিব্য দেহ পেলও!
মদ্রে বিদ্যানগরেতে রাজা রাম রায়
যে কৃপা করিল মোরে, কহিলে না হয়।
সমস্ত জীবনে তিঁহো যে ধন১ করিল,
আমাদের দুজনারে সব বেঁটে দিল।
তাঁর কাছে চাহি নাই, নিজেই যাচিয়া
আপন সম্পত্তি সব দিলেক আনিয়া।
যতেক অমূল্য নিধি তাঁহাব ভাণ্ডারে,
একে একে দেখাইল সকলি আমারে;
ঐশ্বর্য্য ছড়ান তাঁর বাহির বাড়ীতে,
তাহা দেখি সুখ নাহি হ'ল মোব চিতে২।
ভাবিলাম—বাহিরেই ঐশ্বর্য্য যাঁহার,
ভিতরে অমূল্য নিধি লুকান তাঁহার।

(৩) প্রভুর আলিঙ্গনে বাসুদেবের গলিতকুষ্ঠ মুহূর্ত্তমধ্যে সারিয়া গেল; যে বাসুদেব হামাগুড়ি দিয়া চলিতেন, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কৃমিকীটপূর্ণ ক্ষত, তিনি আলিঙ্গন পাইবামাত্র অতি সুন্দর দেহ পাইলেন। প্রভু দৈন্য করিয়া বলিতেছেন বটে যে, তিনি তাঁহার কোন অপ্রাকৃত শক্তিতে বাসুদেবকে এরূপ করেন নাই, সে তাঁহার নিজের গুণে, দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করার ফলেই এইরূপ দিব্য দেহ পাইল। কথাটা সত্যই। শ্রীদাদা কহিয়াছেন, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে জীব পুনর্জ্জন্ম লাভ করে, সুতরাং পূর্ব্ব-দেহের দুরারোগ্য ব্যাধি আর থাকে না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, শ্রীদাদার নিকট বহু দুরারোগ্য ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়াছেন, ফৌজদারী খুনী আসামী বা অন্য আসামী যাঁহাদের জেল বা ফাঁসি অনিবার্য্য তাঁহারা কৃপা পাওয়ার পর আর তাঁহাদের উপর আইনের ক্রিয়া করিল না, কারণ তাহারা ত নূতন জন্ম লাভ করিল!

(১) রাম রায়ের সারা জীবনের সাধন ভজন। (২) যে সব সাধ্য নির্ণয়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন, 'এহো বাহ্য'। কিম্বা 'এহো হয়, আগে কহ আর'।

দেখিতে চাহিনু তাঁর গুপত ভাণ্ডার,
অসঙ্কোচে দেখাইল—দেখে চমৎকার!
মনে হ'ল, হেন রত্ন যাঁর কাছে আছে,
রাখি যদি নিত্য তাঁরে আমাদের কাছে,
অভাব নহিবে মোর, দুঃখ চ'লে যাবে,
তাঁরে দিয়া আরো সব লোক সুখ পাবে ;
সেই লোভে অকপটে দেখানু তাঁহায়—
আমরা কি ভাবে থাকি৩, সবি অমায়ায়।
ইহাতে হইল আর্ত্তি মোদের লাগিয়া,
তখনি পড়িল ভুমে মুর্চ্ছিত হইয়া।
আমাদের লাগি তাঁর কাঁদিলেক প্রাণ,
চিত্ত বিত্ত সবি শেষে করিলেক দান।
বেড়ে গেল ধনাকাঙ্ক্ষা ইথে, প্রিয়তমে,
আরো দক্ষিণেতে তাই চলিলাম ক্রমে।
গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে চলিবার পথে
লক্ষ লক্ষ কোটী লোক চলিলেক সাথে।
শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ কি বলিব হায়!
যাহার যা কিছু আছে, ভেটিবারে চায়।
অযাচিত১ ধন রত্ন, ফেলিতে না হয়—
তাই আমি অঙ্গীকার কৈনু সমুদয়।

(৩) গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব, অর্থাৎ, 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ নিত্য,— নদীয়া-যুগল।

(১) প্রভুই সকলকে যাচিয়া যাচিয়া প্রেম নাম বিলাইয়াছেন, তবে তিনি দৈন্য করিয়া বলিতেছেন, জীবগণই তাঁহাকে অহেতুক ভালবাসা দিয়াছে। প্রেমিকের স্বভাবই এই, তিনি দেখেন, সকলে তাঁহাকে ভালবাসে, তিনি কাহাকেও তদনুরূপ ভালবাসা দিতে পারেন না।

উপার্জ্জন করিবারে বাহির হয়েছি,
ভাল মন্দ২ এ বিচার ছাড়িয়া দিয়েছি॥
নারোজী ডাকাত এক তার দল বল
ভেটিল যা কিছু ছিল আমারে সকল।
নির্বিচারে লইলাম, কিছু ছাড়ি নাই,
তোমাদের লাগি লই যাহা কিছু পাই।
ভাল করি মন্দ করি, মা-ই১ সব জানে,
বিচার করিতে মোর মনে নাহি মানে॥
শ্রীমায়ের স্নেহে মোরে সবে প্রীতি করে,
তাই সব দিয়ে দেয়, যাহা থাকে ঘরে২।
সকল ধনের বুঝি প্রয়োজন আছে,
উপযুক্ত ব্যবহারও হবে মা'র কাছে।
বারমুখী বারনারী জনৈক রমণী,
যাহা কিছু ছিল তার, সব দিল আনি।
সকলে তাহার ধনে উপেক্ষা করিল,
আমি তারে উপেক্ষিতে কিছুতে নারিল৪।

(২) প্রেম ভাল মন্দ শুভাশুভের অতীত। তিনি বিচার করিলে আর জীব প্রেম পাইত না।

(১) শ্রীশচী মা শুদ্ধ সত্ত্ব যোগমায়া—অনন্ত চিচ্ছক্তিবৃত্তি। ইহা লইয়াই প্রভু অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীশচী মাও জীবোদ্ধার বাঞ্ছা করেন। তাঁহার কৃপায় চিৎশক্তি জাগ্রত হইলে জীবের আর ভালমন্দ শুভাশুভ থাকে না।

(২) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, সব শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে সকলে সমর্পণ করিল।

৩) শ্রীশচীমা'র কৃপায় ভাব জাগ্রত হইলে অধিকারানুরূপ ভজন জীব প্রাপ্ত হয়।

(৪) শ্রীভগবানের নিকট কেহই উপেক্ষিত নহে। তিনি মায়াকে দয়া করিলেন, কাম কৃষ্ণসেবার্পণে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, বারমুখী আর এক মানুষ হইয়া গেলেন—তিনি দেবী হইলেন।

আমারে সর্ব্বস্ব দিয়া হ'ল কাঙ্গালিনী,
কিবা দিব প্রতিদান! রহিলাম ঋণী।
ভট্টমারী৫ ভেটিলেক সব অনুচর,
ইথে লোকে আরো মোরে করিল আদর।
পণ্ডিত যতেক বৌদ্ধ, তাদের (ও) ছাড়িনি,
তাঁদের সম্বল৬ যাহা, কিছুই রাখিনি।
প্রতিদান কিবা দিব! কি আছে আমার!
তাঁদের পালন ভার এখন তোমার।
গিরিবাসী সন্ন্যাসীরা ফলমূল খায়,
তাঁদের(ও) অর্জ্জিত ধন, মোরে দিতে চায়.
অযাচিত ভাবে দেয়, ছাড়া বড় দোষ,
গ্রহণে তাদের বড় হইল সন্তোষ।
মহারাষ্ট্র দেশবাসী. নাম তুকারাম,
সবি মোরে সমর্পিল দেহ মন প্রাণ;
তাহে তৃপ্ত নাহি হ'য়ে নগরে নগরে ২
ফিরিতে লাগিল, ধন বাড়াবার তরে।
দাক্ষিণেতে মহীশূরে কাবেরীর তীরে
শ্রীরঙ্গপত্তনে গেনু বেঙ্কটের ঘরে।
সেথাকার সব ধন কবিয়া অর্জ্জন
পাঠানু গোপাল ভট্টে শ্রীবৃন্দাবন।

---

(৫) বামাচারী সম্প্রদায় বিশেষ। ইঁহারা মদ্যমাংস ও নারী লইয়া সাধন করিতেন। তাহা ছাড়িয়া তাঁহারা প্রভুর অনুগত হইলেন।

(৬) শুষ্ক বৈরাগ্য তাঁহাদের সম্বল। তাহা ছাড়িয়া যুক্তবৈরাগ্য লইলেন।

(১। সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছসাধন গৌরপাদপদ্মে অর্পিত হইল, এবং, তাহারা প্রেম পাইল।

(২) তুকারাম প্রভুর নিকট প্রেম নাম পাইয়া ঐ দেশে প্রচার করিতে লাগিলেন।

পশ্চিম ভারতবর্ষে যাব আমি পরে,
সে দেশের সব ধন পাঠাইব ঘরে।
সেথাকার, লোক, প্রিয়ে বড়ই কৃপণ৩;
যত কিছু ধন আছে, করয়ে গোপন৩;
আগে হ'তে তাই সেথা পাঠানু গোপালে,
শেষে যেন যেয়ে সব পাই অবহেলে।
প্রথমতঃ দিতে নাহি চাহিবেক ধন,
তখন মোদের কথা করিব জ্ঞাপন;
ইহা শুনি আমাদের দিয়া দিবে সব,
বাড়িবে মোদের ইথে অপার বৈভব।
মহীশূর হ'তে আমি দ্বারাবতী যাই,
এইরূপে অর্জনের সীমা সংখ্যা নাই।
দু'বছর দাক্ষিণাত্যে অর্জন করিয়া
নীলাচল ধামে পুনঃ এসেছি ফিরিয়া।
এখানে প্রবল রাজা গজপতি রায়,
তাহার সমগ্র রাজ্য ১ মোরে দিতে চায়।
প্রথমে কহিনু তাঁরে—ইথে নাহি কাজ,
ছাড়াতে নারিনু কিন্তু কোন মতে আজ ২;

---

(৩) ব্রজপ্রেম গোপনের বস্তু ছিল—ব্রজগোপীগণ লুকাইয়া কৃষ্ণসঙ্গতা হইতেন; তাই, অপরে এ প্রেম বড় একটা পাইল না। আর, নদীয়ায় প্রকাশ্যে প্রেমের বন্যা বহিল—ইহা খোল করতালে কীর্ত্তনে নর্ত্তনে প্রকাশিত হইল, সকলে ইহা পাইয়া ধন্য হইল।

(১) অদ্যাপি উড়িষ্যায় মহাপ্রভুর প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়।

(২) রথ-যাত্রার দিন।

ছাড়াতে চাহিনু, কিন্তু, ছাড়িল না তবু,
করিতে চাহিল মোরে সবাকার প্রভু—
শুধু প্রভু করা নয়—মহাপ্রভু ব'লে
রাখিতে চাহিল মোরে উড়িষ্যা অঞ্চলে ;
তা'কি হয়! প্রিয়তমে! নদীয়া ছাড়িয়া
বিদেশে রহিব আমি কেমন করিয়া ৩!
দিবা নিশি ভাবি আমি, কখন যাইয়া
বসিয়া মায়ের কোলে জুড়াইব হিয়া ;
দেখিয়া তোমার অই শ্রীচাঁদ বদন
শীতল করিব মোর তনু মনঃ প্রাণ।
আর ত প্রবাস, প্রিয়ে, ভাল নাহি লাগে,
তোমাদের প্রেমগাথা সদা হৃদে জাগে।
কীর্ত্তন-খেলার সাথী এসেছে হেথায়,
তবু মোর মন ধায় অই নদীয়ায় ;
খেলিনু তাদের সনে এখানেও, প্রিয়ে,
দেখিতে নারিলে তুমি সখীগণ নিয়ে।
শ্রান্ত হ'লে আমাদের কে দিবে খাবার!
শ্রীমায়ের স্নেহ, প্রিয়ে, কোথা আছে আর!
দিবা নিশি কাঁদি আমি মায়ের লাগিয়া,
কে বুঝিবে কেন মোর জ্বলিতেছে হিয়া,
হস্তী-অশ্ব ঐশ্বর্য্যাদি কত আছে হেথা,
তথাপি আমার মন যেতে চায় সেথা।
তুমি, প্রিয়ে, মোর হ'য়ে বুঝাইও মায়,

(৩) নীলাচলের মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত। শ্রীনবদ্বীপে শুদ্ধ মাধুর্য্য।

নিশি দিন নাহি যেন কাঁদে সর্ব্বদায়।
তাঁহার চোখের জল সহিতে না পারি।
তাঁর তরে শতবার প্রাণ দিতে পারি।
তবে যে প্রবাসে আছি, তাঁহারি আজ্ঞায়।
এবে মোরে, প্রিয়তমে, ধরেছে রাজায়।
নৃপতি প্রতাপরুদ্র রাজ্য তেয়াগিয়া
ভিখারীর বেশে এল কাঙ্গাল হইয়া,
সুবিশাল রাজ্য তাঁর, দেহ, মনঃ, প্রাণ,
নীলাচলচন্দ্র সহ মোরে কৈল দান।
অনেক সুকৃতিবলে যা কিছু করিল,
অকপটে মো দু'জনে সবি সমর্পিল;
আমারে করিল রাজা, তোমা রাজরাণী,—
কহিতে তাঁহার কথা নাহি সরে বাণী—
তার এই নিদর্শন দিব্য সাড়ীখানি
যতন করিয়া মাথে বেঁধে দিল আনি।
দক্ষিণ দেশেতে মোর যত উপার্জ্জন,
প্রতাপরুদ্রেরে দিয়া হ'ল সমাপন।
বহু ক্লেশে অর্জিয়াছি এ অপূর্ব্ব সাড়ী,
ন'দে বাসী সনে তাই পাঠাইলাম বাড়ী।
সাড়ী প'রে, প্রিয়তমে, সাজ রাজরাণী,
যে ধন পেয়েছি, তাতে রাজা হব আমি।
করিওনা দুঃখ, প্রিয়ে, শীঘ্রই আসিব,
বারেক পশ্চিম দেশে অর্জ্জনে যাইব।
মাঝে মাঝে যাব আমি চুপ্‌টী করিয়া;

আসিব সবার সনে সাক্ষাত করিয়া।
কাঞ্চনা অমিতা আদি সখীগণ নিয়া
সুখ-আলাপনে কাট দিবস রাতিয়া
অনুপ এ চিঠি দিয়া প্রিয়াজীর হাতে
শ্রীমা আর রাণীজার ধূলি নিল মাথে।

শ্রীমতীর পত্র।

প্রাণেশ্বর,

চিঠিখানি পেয়ে নাথ প্রাণ জুড়াল মোর,
আনন্দেতে সখীগণের পড়্‌ল আঁখির লোর।
বছর দুই চ'লে গেল, খোঁজ খবর নাই,
লোকের কথায় আরো, নাথ, বড় দুঃখ পাই।
মায়ের কান্না মনে হ'লে বুক্‌টা ফেটে যায়,
চিঠির কথা ব'লে আজ সুস্থ কৈলাম তাঁয়।
লোকে বল্‌ত, তুমি নাকি সন্ন্যাস ক'রে গেছ,
সাধের ন'দে বাড়ী ঘর সকল ছেড়ে দেছ;
আবার কেহ বল্‌ এসে—অরুণ বসন প'রে
যোগী হ'য়ে দেশে দেশে ঘুর্‌ছ ভিক্ষা ক'রে।
ভাবতাম আমি – লোকে কেন কইবে এমন ধারা!
মিথ্যা ব'লে মাকে আমার ক'র্‌বে পাগলপারা!
মা ত আমার বুড়ো মানুষ স্নেহ-রসে ভরা,
মায়ের আমার আঁখির জলে ভেসে যেত ধরা;

নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ক'র্‌ত হায় হায়,
কত ক'রে ব'লে ক'য়ে প্র[illegible]তাম তায়
ব'ল্‌তাম তাঁকে—সন্ন্যাস ক র[illegible]
অজ্ঞ লোকে কয় ব, কত এ[illegible]
তাদের [illegible] কাণ দিলে, মা[illegible]
যার যার [illegible] কথা[illegible]
কিসের দরকার সন্ন্যাসে [illegible]র
মিথ্যা কথা ও সকল, মা, বলছে বলুক পরে।
দু'দিন তরে বিদেশ গেছে, আসবে শীগ্‌গির ক'রে,
তোমার, মাগো, দুঃখ কিসের। আমি আছি ঘরে।
এমন ক'রে, প্রাণেশ্বর, বল্‌তাম মায়ে কত,
বুঝ্‌ত শুন্‌ত, তবু, নাথ, কাঁদ্‌ত অবিরত;
আজ্‌কে তোমার চিঠি পেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল,
এখন, তুমি আস্‌বে কবে, বল, নাথ, বল।
নদের নারী—তাদের কথা বল্‌ব তোমায় কত!
আঁখির লোরে দিবা নিশি ভাস্‌ত অবিরত।
এই চিঠিতে হাসির ছটা দেখ্‌লাম সবার মুখে,
শীগ্‌গির ক'রে আস্‌বে ব'লে ভাস্‌ল সবাই সুখে।
আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে ভাস্‌ত আঁখির জলে,
মরা দেহে প্রাণ এল তোমায় পাবে ব'লে।
তাদের তরে দুঃখ আমার, আমার তরে নয়,
তারা তোমায় পেলে তাতে আমার সুখ হয়।
এখন এসে হেসে হেসে কইছে কথা কত,

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বলেন, যেখানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, সেখানে নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য বিরাজ করেন।

বসন ভূষণ দিযে মোবে সাজায মনেব মত।
তোমার দেওযা কাপড় খানি প'ব্‌ব তুমি এলে ; *
ী এখন উহা বাখ্‌ল বাক্সে তু'লে।
প্রভুব কাছে পৌঁছ্‌ল নীলোচলে,
' সোণাব গোবা গদাধবে বলে—
ন, গদাই আমাব, প্রাণেব কথা কই,
ঽ কেমন ক'বে দূব দেশে বই !
ক'বে ন'দে ধামে চ'লে যাব ভাই,
নীলাচলের সকল ভাব বইল তোমাব ঠাঁই।
ব্রজধামের উজ্জ্বল বস * দিও জনে জনে,
আবো উজ্জ্বল বসেব তবে পাঠিও ন'দে ধামে, । *
দাদাব কৃপায় অনুপদাস শুনল এসব কথা,
নেচে উঠল, ঘুচ্‌ল মনেব ব্যথা।

---

* দশ বার বছর পুর্ব্বের কথা বলিতেছি, শ্রীমতী কৃপা করিয়া শ্রীনীলাচল হইতে প্রেরিত এই অপূর্ব্ব সাড়ীখানি এ অধমকে দেখাইযাছিলেন. এবং ইহা দ্বারা জানাইলেন, শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার লীলা নিত্য।

* এইজন্ত শ্রীগদাধরকে দিযা নীলাচলে গোপীনাথ-সেবা প্রকাশ করিলেন। গদাধরের গোপীনাথ অত্যাপি নীলাচলে বিখ্যাত। আশ্চর্য্য দেখুন, যাঁহারা নীলাচলে গিযা.ছন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, এই গোপীনাথ দাড়ান মূর্ত্তি ছিলেন, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বৃদ্ধ হইলে তাঁহার দাঁড়াইয়া গোপীনাথ সেবা করিতে কষ্ট হয দেখিযা গোপীনাথ হাটু ভাঙ্গিযা বসিলেন। কি ভক্ত-বাসল্য ! আবার দেখুন, এই শ্রীমূর্ত্তি বহির্দৃষ্টিতে প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু, সত্য সত্যই যে তিনি চিন্ময,—বিগ্রহ ও স্বরূপ যে একই, জীবগণকে ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।